UNRECORDED INTERVIEW

আবদুল খবির গাজী, ইনকাম ট্যাক্স আইনজীবী
১১ ই নভেম্বর ২০০৪ সকাল ১১টা

আমাদের এখানে বড়ো ওস্তাগর তিন-চারশ। এদের সম্পত্তির পরিমাণ খুব বেশি হলে তিন-চার কোটি টাকা, বাড়ি জমি ব্যবসা সব মিলিয়ে। এই তিন-চার কোটি অনেক সময় পরিবারগত, কয়েক ভাই মিলে। তবে কারও কারও একারও রয়েছে। আমাদের এই পাড়ায় বড়ো ওস্তাগার নেই বললেই চলে।

এর পরের স্তরটা, অত বড়ো নয়.....

ইনকাম ট্যাক্স লোকে দেয় নানা কারণে। সবাই যে বড়ো ওস্তাগর তা নয়। যেমন, ব্যাঙ্ক লোন পেতে গেলে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল থাকতে হবে। ব্যবসায় ওঠানামা হচ্ছে। অনেকে ফাইল নিয়ে চলে যাচ্ছে। বড়ে ওস্তাগর, কোনও কোনও সময় একদম খারাপ ব্যবসা। খুব বড়ো ওস্তাগর, হঠাৎ একদিন কারবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, নানান কারণে।

আমাদের পাড়ায় hand to mouth লোকই বেশি। এখানে শি(ার খুবই অভাব। এপর্যন্ত উকিল হয়েছে ১২/১৪ জন, ডাক্ত(ার ৮/১০ জন। ১৯৭৫ সালে যখন আমি কাজ শু(করলাম, তখন আমিই প্রথম ট্যাক্স অ্যাডভোকেট। তার আগে হয়তো ২০-২৫ টা ফাইল ছিল। ওয়াছেন মোল্লাদের বিল্ডিং-এ এস. এস. ঘোষের কাছে তখন ফাইল ছিল—আলাউদ্দিন, ওমর ওস্তাগার, বাকুলি ড্রেসেস, লতিফ হাজি, বাহাদুদ্দিন, আমন ড্রেসেস-এর। এছাড়া আর একজন অ্যাডভোকেট ছিল পার্ক সাকার্সের।

আমার পরে কাজ করতে এসেছে আমিন। ও আই কম পাশ করল। তখন বড়তলা স্কুল হল। স্কুলের মাস্টারের জন্য ছয়জনের লিস্ট হল। অ(ন সেন তখন এম. এল. এ., উনি ৬ জনের নামই পাশ করলেন। আমিন তখন ল পাশ করেনি। তখন থেকেই ও এস. এস. ঘোষের ওখানে কাজ করত। পরে ট্যাক্সি অ্যাডভোকেট হল।

দ(ণ ২৪ পরগণায় কলকাতা ১৮,৪৪,৬৬,২৪ সব মিলিয়ে দুটো ওয়ার্ডে মোট ১২/১৪ হাজার আই. টি. ফাইল। তার মধ্যে তিন-চার হাজার গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রির। তবে অতগুলো ওস্তাগার নয়। এক-একজনের তিন-চারটে ফাইল আছে। আবার সিঙ্গল্ বিজনেসও আছে।

১৯৬৫ সালের আগে আমাদের এই এলাকায় ওস্তাগর ছিল না। এখানে অবস্থা তখন খুবই খারাপ। ১৯৫৬ সালে বাকুলি ব্লাউজ বানতো। ১৯৬৫ সালের আগে আর ছিল দাউদ ওস্তাগর, কারবালার ইসমাইল—মারা গেছে। ওস্তাগার ছিল জয়িতা, কানখুলি, চটা, রায়পুর, পাঁচুড়ে। মালিপাড়ায় কিছু ছিল। সফি ওস্তাগার কোরবান থানাদার ছিল। এখানকার লোক হাটে যারা যেত তাদের 'হেটো' বলে ব্যঙ্গ করত। এখানে তখন ছিল গাউন বানানোর লোক, প্রথমে তারা বৃটিশদের ঘরে গিয়ে অর্ডার নিয়ে আসত। বৃটিশরা চলে যাবার পর মারোয়ারিদের বাড়িতে যেত।

আর ছিল গভর্নমেন্ট কন্ট্রাক্টর।.....

ওস্তাগরি ব্যবসা এখানে জমজমাট হল যখন কারবালা হল, ১৯৭৯-৮০ সাল নাগাদ।

হাওড়াতেও প্রচুর ওস্তাগর আছে। পাঁচপাড়া, বাঁকড়ায়.....। এছাড়া ওস্তাগর রয়েছে বড়বাজার, মানিকতলা, যাদবপুর, পাইকপাড়য়। এরা হিন্দু। ননবেঙ্গলি মুসলমানরাও ব্যবসাটা ধরে নিয়েছে। আগে এমব্রয়ডারির কাজটা এখানে হত। তারপর মাঝে কিছুদিন বন্ধ থাকল। তারপর ওদিককার লোকরা কাজটা কিছু শিখে নিয়েছে। বজ বজেও ওস্তাগাররা রয়েছে।

তিন-চার হাজার ফাইল যে রয়েছে, এদের বেশিরভাগই তেমন বড়োসড়ো নয়, একটা রেকর্ড রাখার জন্য আই. টি. ফাইল। গার্ডেনরীচ-মহেশতলা নিয়ে এরকম খুব বেশি হলে একহাজার পরিবার রয়েছে। বড়ো ওস্তাগরদের ব্যবসার বাৎসরিক টার্নওভার পাঁচকোটি টাকা। তাও সেটা পরিবারগত, এক-এক ভাইয়ের আরও কম হবে। শি(া বা অন্যান্য চাহিদা কম, খরচ কম থাকায় এদের চলে যাচ্ছে। গড়ে টার্নওভার দশ থেকে বিশ লাখ টাকা বছরে।

মহেশতলা-মেটিয়াব্রুজে গার্মেন্ট সহ আনুষঙ্গিক ব্যবসা নিয়ে বছরে কয়েক হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হচ্ছে। এর মধ্যে বাঙালি হিন্দু, মারোয়ারিরাও রয়েছে। কাপড়ের ব্যবসা প্রায় পুরোটাই মারোয়ারিদের। ব্যবসাটা হচ্ছে হাট থেকে, হাওড়া হাটের থেকেও এখানকার হাটে বেশি হচ্ছে। তবে বড়ো ওস্তাগররা কোনও হাটে যায় না। নিজের বাড়ি থেকেই ব্যবসা চলছে। আগের দিন শনিবার থেকে লাইন পড়ে যায়। কাস্টমাররা এসে থাকে, থাকবার ব্যবস্থাও রয়েছে। এমন কাস্টমারও রয়েছে, যার স্কুটার কিনে এখানে রাখা আছে।

আগে ছিল শিল্প, শিল্পী, এখন শিল্পপতি। তবে দর্জি শিল্প কালকে না থাকলে এরা মার খেয়ে যাবে।

এখানকার পুরো ব্যাপারটাই খুব জটিল। কোনও পলিটিকাল পার্টি এটা বুঝে উঠতে পারেনি। এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা সরল।

এক্সপোর্টের ব্যবসা এখনও গড়ে ওঠেনি।

RECORDED INTERVIEW

আফতাব আহমেদ

৮.৪.২০০৫ হাজিরতন বেহালাপাড়ার বাড়িতে

আমি সেভাবে দেখতে গেলে খুবই ছোট থেকে এ ব্যবসায় আছি। বাবার সঙ্গে করতাম। স্কুল কলেজে পড়তে পড়তেই ট্রাডিশন অনুযায়ী বাবা কাকাদের যতটা সম্ভব সাহায্য করার করতাম। সেভাবে দেখলে একদম ছোট থেকে প্রত্য(ভাবে না হলেও পরো(ভাবে এ ব্যবসায় জড়িত। বাবা ঠাকুরদা এ ব্যবসায় ছিলেন। বাবারা থাকতেন মোল্লাবাড়ি (মোল্লাপাড়া)। ওখানেই কাজটা হত। মা, ভাই-বোন সবাই ওখানেই আছে। আমি একা ১৯৮১ সালে এখানে শিফ্ট করেছি জায়গা কিনে। বাবা সফিউর রহমান মোল্লা, ঠাকুরদা হাসেম মোল্লা। ক্লাস ফাইভে পড়াকালীন ১২-১৩ বছর বয়েসেই এ ব্যবসার সংস্পর্শে আসা। নগন্য হলেও কিছুটা সাহায্য করতে হত।

ঠাকুরদা ডাকব্যাকের কাজ করতেন। কাজটা ডাইরেক্ট হতো। কোম্পানির নিয়ম মতো আমরা প্রতিদিন সকালে তিন চার জন কাটার পাঠাতাম। তারা সারাদিন যে মালটা কাটিং করত সন্ধ্যায় গাড়িতে সে মালটা নিয়ে আসতো। প্রতিদিন যে মালটা সেলাই হয়ে কমপি-ট হতো সেটা সকালে কাটারদের সঙ্গে গাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হতো পাণিহাটিতে ডাকব্যাকের ফ্যাক্টরিতে। মাল নিয়ে যাওযা নিয়ে আসার জন্য আমাদের নিজস্ব গাড়ি ছিল। কাটিং-এর কাজটা ওদের নিজস্ব ফ্যাক্ট্রি প্রেমিসেসের মধ্যে করতে হতো। এটা ওদের নিজস্ব পলিসি ছিল। সে সময় নু(ল হক মালী ছাড়াও আরো তিনচারজন এখানে ডাকব্যাগের কাজ করতেন। থাদ্দার পাড়ায় আকতার হোসেনের মামার বাড়ির লোকেরা অন্য টেন্ডারের কাজ করতেন। ওরা ডাকব্যাগের কাজ করতেন।

বাবারা রেলওয়ে, পোর্ট কমিশনের টেন্ডারের কাজ করতেন। তারা সাব কন্ট্রাকটর ছিলেন। ডাইরেক্ট করতেন না। ডাইরেক্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় ITC,STC ও র মেটেরিয়াল কেনার মতো আর্থিক সঙ্গতি ছিলো না। ঠাকুরদারা করতেন ডাকব্যাকের ওয়াটারপ্রুফ, ব্যাগ এসবের কাজ। বাবারা এটার সঙ্গেই এসব কন্ট্রাকটরির কাজগুলো করতেন। ৭০ দশকের পর থেকে কেউ কেউ এসব কাজ থেকে যে কোন কারণেই হোক সরে এসে হাটের কাজের সঙ্গে যুত্ত(হন। আমি ব্যাক্তি(গত ভাবে ১৯৭৫ সাল থেকে ম্যাগনাম এন্টারপ্রাইজের সাথে এক্সপোর্টের কাজের সঙ্গে যুত্ত(হই। আমি এবং আমার ফ্যামিলি ৯৭ অবধি এদের সঙ্গে ছিলাম। ক্যামাক স্ট্রীটে এদের অফিস ছিলো। হেড অফিস ছিলো লন্ডনে। সেখান থেকে এরা অর্ডারগুলো সিকিওর করতো। কলকাতায় ২০-২৫ টা সাব-কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে এরা কাজগুলো সেলই করাতো। আয়রনিং এবং প্যাকিং-এর কাজটা এরা নিজেরা করে বাই সিপ অথবা এয়ারে বাইরে পাঠিয়ে দিত। লেডিস, জেন্টস ও লেডিস গারমেন্ট হতো। যখন যেমন অর্ডার আসতো তেমনই করতে হতো। র মেটারিয়াল, ডায়াগ্রাম ওরা দিয়ে দিতো। মোটামুটি কতটা কাপড় লাগবে ও র‍্যাটি ওরা বলে দিত। ম্যাগনামের মেইন মার্কেট ছিলো ইউরোপিয়ান দেশগুলিতে। ডিজাইনগুলো তেমনই হতো। আমাদের ইন্ডিয়ান ডিজাইনের সঙ্গে তার কোন মিল ছিল না। কাপড় হতো ১০০ শতাংশ কটন। সাউথ ইন্ডিয়া থেকে ওরা কাপড় আমদানি করাতো।

ওদের ৪০টার মতো আয়রনম্যান ছিলো। ৮৪ তে তাদের মধ্যে কোন সমস্যার কারণে এখানে লকআউট হযে যায়। ওরা মাদ্রাজের চেন্নাইয়ে টাটানগরে চলে যায়। এখানকার বাকি কন্ট্রাকটররা কাজের অভাবে বন্ধ করে দেয়। শুধুমাত্র আমাকে ওদের সঙ্গে যাওয়ার অফার দেয়। আমি ২৫ জন এখানকার কারিগর নিয়ে ওখানে চলে যাই। মাস ছয়েক পরে ওখানকার কারিগরও সেট করে ফেলি। বছর দেড়েক ওখানে ছিলাম। পরে ভাষা, খাওয়া-দাওয়া ও পারিবারিক সমস্যার কারণে আমার পার্টনার ও বন্ধু কৃপাণ সরকার ওঝাকে পুরো ফ্যাকটরি আমি কলকাতায় ফিরে আসি। পরে ওরা আবার কিরণ এক্সপোর্ট নাম দিয়ে নিউ আলিপুরে ফিরে আসে। মহেশতলার গোপলপুরে ফ্যাকটরি বানায়। আমি ওদের সঙ্গে আবার যুত্ত(হয়ে ৯৭ অবধি ওদের সঙ্গে থেকেছি।

এক্সপোর্টের সাব-কন্ট্রাকটরের বড় সমস্যা হলো মাঝে মাঝে কাজ না থাকা। ছয়মাস হয়তো দিনরাত কাজ হলো তারপর একমাস কিছুই নেই। এই সময় ইউনিটে কারিগর মেনটেন করা খুব সমস্যা হয়। ৯৭ এর পর আমি ঠিক করি নিজে কিছু করার। আমি ওদের থেকে আলাদা হয়ে যাই। প্রথাগত ভাবে জব্বার, হাওড়া, চেতলা হাটের মাধ্যমে নিজের হোসিয়ারি গারমেন্টসের কাজ শু(করি। এতে প্রথমদিকে যেমন দাঁড়াতে অসুবিধা হয় তেমনি আমারও হয়েছিল। এটা আমার স্বাধীন ব্যবসা। বড় বাজার থেকে র মেটারিয়াল কিনে এনে নিজেরাই ডিজাইন ও ফিনিসিং করে হাটে বিত্রি(করি।

এখানে এক্সপোর্ট বিজনেস ডেভেলপ না করার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। অন্যান্য province বিশেষত মাদ্রাজে আমি দেখেছি সরকার buyer and exporter এর যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য কিছু ভূমিকা পালন করে। আরো অন্যান্য ভাবেও সাহায্য করে। পশ্চিমবঙ্গে সেরকম নেই। তামিলনাড়ুতে আমি দেখেছি এক্সপোর্ট বিজনেসের জন্য প্রয়োজনীয় অত্যাধুনিক

মেশিন, র মেটারিয়াল ইত্যাদির জন্য সেখানকার সরকার আর্থিকভাবে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সাহায্য করে। সারা ভারতে বিশেষ করে গারমেন্টস এক্পোর্টে পশ্চিমবঙ্গের থেকে তামিলনাড়ুর অবস্থান অনেক ভালো। দিল্লি, বোম্বেও অনেক এগিয়ে। ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ এইসব সরকার গারমেন্টস এক্সপোর্টের মাধ্যমে অনেক কাজ দিতে পেরেছে। কয়েক ল(মানুষ এর সাথে জড়িত। এক একটা বিল্ডিং-এ তিন চারশো মেশিন চলে। সারা তামিলনাড়ুতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এই ব্যবসা হয়। দিল্লির গান্ধিনগর, ওকলার মতো কোন এক্সক্লুসিভ কোন জোন এখানে নেই। অবশ্য বছর দশেকের মধ্যে কি পরিবর্তন হয়েছে বলতে পারবো না। ১৯৮৯-এ আমি ওখান থেকে চলে আসি।

বাইরের থেকে অর্ডার সিকিওর করা একটা সমস্যা। এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউনসিলের মেম্বার হওয়া, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের RBI নাম্বার নেওয়া এসব অনেক টেকনিক্যাল ব্যাপার রয়েছে। দর্জি সম্প্রদায় শি(ার অভাবে এসব দিকে খুব একটা ঝোঁকে না। তবে সাব-কন্ট্রাকটরে কিছু কিছু কাজ চলছে। একদম চলছে না তা নয়। যাদের থেকে কন্ট্রক্ট নেয় তারা মেইনলি মারোয়ারি। তার সংখ্যা খুবই নগন্য। সবাই মেইনলি হাটের কাজের সঙ্গে যুক্ত(।

দেশের মাটিতে যথেষ্ঠ চাহিদার জন্যই বিদেশের মার্কেটের দিকে এখানকার দর্জিরা ঝুঁকছে না তা নয়। মেটিয়াব্রুজ ছাড়াও একন অন্যান্য প্রোভিন্সে দর্জির কাজ শু(হয়েছে। সেখানে তারা এক্সপোর্টের পাশাপাশি এগুলো করছে। সরকারের উদাসীনতাই মেইনলি এখানে এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট না হওয়ার কারণ। এখানকার মানুষ একযোগে চাপ সৃষ্টি করলে সরকারের টনক নড়তে পারে। কোন স্টেপ নিলেও নিতে পারে। কিন্তু এখানকার মানুষ হাটের কাজ নিয়েই অনেকটা সন্তুষ্ট। সরকার এর আগে রেডিমেড কমপে-ক্স করার, বাইরের বাইয়ার দের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবার অনেক প্রতিশ্রুতি আগে দিয়েছে। খবরের কাগজে এসব দেখেছি। কিন্তু সেগুলো কথাই থেকে গেছে বাস্তবে পরিণত হয়নি। সরকারি সাহায্য ও জটিলতা কম হলে এখান থেকে এক্সপোর্ট ভালোভাবেই সম্ভব। কারণ এখানে স্কিল্ড লেবার যথেষ্ট রয়েছে। বাইরেও তাদের সুনাম আছে। ব্রিটিশ পিরিওডে এখানকার মানুষই ইউরোপিয়ান দেশগুলির মানুষের পোশাক তৈরি করে দিত ক্যাটালগ অনুযায়ী। সুতরাং এদের স্কিল যথেষ্ট সুবিদিত। প্যান্টালুনস এর মতো কর্পোরেট কোম্পানিগুলোয় যে পারফেকসন প্রয়োজন সে পারফেকসন দেওয়ার মতো স্কিল এখানকার দর্জিদের নেই তা নয়। আসলে এখানকার কাজের ধারায় সে পারফেকসনের প্রয়োজন হয় না। আধুনিক মেশিনও প্রয়োজন তেমন হলে সেই পারফেকসন দেওয়ার মতো স্কিল এখানকার দর্জিদের যথেষ্ঠ আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় জামার কলার বা কাঁধে যে ডবল সেলাই হয় সেগুলো আমরা সিঙ্গল নিডল মেশিনে করি। একবারের কাজ দুবারে করতে হয়। কিন্তু ডবল নিডল মেশিনে এই কাজটা একবারেই করা হয়। ফলে দুটো সেলাই পার ফ্যাক্টলি প্যারালাল হয়। জামার সাইড সেলাইযে যে চারটে পরপর সেলাই হয় তা আধুনিক মেশিনে একবারেই সম্ভব। তাই পারফেকশনটা অনেক বেশি মেইনটেন করা যায় যা সিঙ্গল নিডলে সম্ভব নয়। এতে স্কিলের ব্যাপার নেই। কিন্তু এ মেশিন অনেক কস্টলি। অনেকের তা কেনার আর্থিক সঙ্গতি নেই।

WTO-এর শর্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের কোটা সিস্টেম শেষ হবার পর চীন ও ভারতের হাতে এক্সপোর্টের যে বিশাল সুযোগ আসছে তাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি না পাল্টালে আমরা কতটা উপকৃত হব তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি বদলের জন্য যে চাপ সৃষ্টির প্রয়োজন আছে, সেটা আমরা পরিনি। এটা আমাদের গাফিলতি।

আগে অন্যান্য প্রভিন্সের দোকানদার তাদের দোকান বন্ধ রেখে এখানে মালপত্তর কিনতে আসতো। কিন্তু এখন অন্যান্য প্রভিন্সেও রেডিমেড তৈরি হচ্ছে। এমনকি পুনেতে নাকি আরো সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। হোসিয়ারিতেও অন্যান্য প্রভিন্সের সঙ্গে কমপিটিশন অনেক টাফ হয়ে যাচ্ছে। ফলে এর ভবিষ্যতের ব্যাপারে অনেকেই সন্দিহান হয়ে পড়ছেন। বড় বড় ওস্তাগররা তাই রিয়েল এস্টেট বা অন্যান্য ব্যবসার প্রতি ঝুঁকছেন।

আজ বেকারত্বের যুগে সরকার যদি একটু উদ্যোগ নেয় তবে কয়েক মানুষ যে এই (দ্র ব্যবসার সঙ্গে প্রত্য(ও পরো(ভাবে জড়িয়ে রয়েছে তাদের কিছুটা নিশ্চয়তা দেওয়া যেতে পারে।

ছোটবেলা থেকে এই ব্যবসায় ইনভোলবড হয়ে যাওয়ার ট্রাডিশন এখনও আছে। তবে শি(ার ব্যাপারে এখন আগ্রহ দেখা দিচ্ছে। যাতে এই ব্যবসাতেও যুক্ত(থাকতে পারে সে ব্যবস্থাও করা হয়। এটা একটা ভালো দিক। আশা করা যায় যারা শি(ত হয়ে এই ব্যবসায় আসছে তারা কিছুটা আশার আলো দেখাবে। বেশিরভাগ অভিভাবক চায় সন্তানরা এই ব্যবসাতেই আসুক। তবে ব্যাতত্র(মও আছে।

ছেলেদের থেকে মেয়েরা শি(ায় একটু বেশি আগ্রহী। এ ব্যাপারটা শুধু এখানেই নয় সারা পশ্চিমবঙ্গের ফলাফলেই একই জিনিস দেখা যায়। আজ থেকে ২০-২৫ বছর আগে এখানে মেয়েদের স্কুলই ছিল না। পরে আকতার সাহেব, ফজলে আজিম মোল্লার প্রচেষ্টায় মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানেও ছেলেদের থেকে মেয়েদের মধ্যে পড়াশোনার হার ও আগ্রহ বেশি।

এটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। এতে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়নি।

মেয়েদের বিয়েটা সাধারণত এখানেই কাছাকাছি দেওয়ার প্রবণতাটা বেশি। সব বাবা-মাই যেমন তার মেয়েকে কাছাকাছি রাখতে চায়। তবে এ ব্যাপারে কোন বাধ্য বাধকতা নেই। উপযুক্ত(পাত্র বা পাত্রী পেলে ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দূরেও হয়। বাইরে বিয়ে হলে এই ট্রেডটা বাইরে চলে যাবে এমন ভীতির কোন ব্যাপার নেই। এই ব্যবসার বেশিরভাগ কারিগরই বাইরের।

সেলিং, পারচেস, হিসাব রাখার সঙ্গে প্রোডাকশনের কাজটাও আমরা নিজেরা দেখি। কারণ এ ব্যবসার ফান্ডামেন্টাল জিনিসগুলো আমাদের সবারই জানা। প্রোডাকশনের কোন লোক অনুপস্থিত থাকলে সেই কাজটা জানা থাকলে আমরা নিজেরাই করেনি। কাঁচামাল থেকে প্যাকেজিং অবধি সবটাই আমার এখানেই হয়। তবে এমব্রয়ডারি, প্রিন্টিং ইত্যাদি কয়েকটি কাজ আমি ফ্যাকটরির বাইরে থেকেই করাই। তবে তা মেটিয়াব্রুজ মহেশতলার মধ্যেই। প্যাকেজিং প্রোডাক্টগুলোও এখানে তৈরি হয়। বাক্স ইত্যাদি জিনিসগুলো মেইনলি রাজাবাজারে হলেও রয়ালের মতো কিছু লোকাল ফ্যাক্টরি এখানেও আছে। পলিথিন এখানেইতৈরি হয়। একদম গ্রেন থেকেই সিট তৈরি হয়। আগে বাইরে থেকে আসতো। সেলাই মেশিন আমরা কিনি বড়বাজার থেকে। আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী মেশিনই তারা তাদের শো(মে রাখে। আমাদের আগে থেকে কোন স্পেসিফিকেশন দিতে হয় না।

এস. ফেন্সি, ডিক্সেন, কোডেক্স ব্র্যান্ডের মাল কলকাতার প্রায় সব শো(মেই চলে। ওরা এখান থেকেই মাল নিয়ে যায়। এখানে প্রথম দশটা ব্র্যান্ড মোটামুটি— এস. টি. আলি, হ্যাপি, গাইড, ডি. এম, ডায়ান্যাক্স, নোভেলটি, এস. ফ্যান্সি, অ্যাপোলো, নিউ ইয়র্ক, এন. সানি, এন. পিন্টু এইরকম মোটামুটি ১৫-২০ জন।এদের মাল সম্পূর্ণ পশ্চিমবঙ্গ বেস করেই। নর্থ কোলকাতার তুলনায় এখানে হোসিয়ারি গার্মেন্টস খুব নগণ্য। তবে ওখানে হোসিয়ারি মানে যেমন আন্ডারগার্মেন্টস বোঝান হয় এখানে হয় মেইনলি ফেন্সি প্রোডাক্ট।

ডাকব্যাক প্রথম থেকেই বাঙালী এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। আগে শুধু ওয়াটারপ্রুফ করলেও এখন ভালো কোয়ালিটির ছাতা, জুতোও তৈরি করে।

RECORDED INTERVIEW

আখতার হোসেন

৩.৪.২০০৫ হাজিরতনের বাড়িতে

আমাদের এখানকার ভাষার সঙ্গে উড়িষ্যা ও আসামের ভাষার কিছু মিল আছে। তাদের 'মুঁই' ও 'মঁয়' - এর সঙ্গে এখানকার মুই-এর অনেক মিল। বড়জোর দশ থেকে বারো বছর আগে থেকে এর প্রচলন অনেক কমে গেছে কিন্তু একটু ইনটিরিওরে বিশেষত বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে এর প্রচলন এখনো কিছুটা আছে।

আমাদের পূর্ব পু(ষের ইতিহাস বলতে আমরা প্রথমে ছিলাম বেহালা সংলগ্ন সন্তোষপুর এলাকায়। ওটা কৃষিজীবী এলাকা ছিল। প্রায় ২৫০ বছর আগে আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার বাবারা এখানে আসেন। এখানে আসার পর তারা দর্জির কাজ করতেন।

প্রথম যখন উইলসন মেশিন বড়তলায় আসে তখন অনেকে মানুষ ভিড় করে দেখতে গিয়েছিল। সাহেবরাই এসে ডেমোন্সস্ট্রেট করেছিল। মেশিনটা আমেরিকান। এখানে এসেছিলো ১৯০০ সালের আগে। ২৫০ বছর আগে বিভিন্ন রকম ডিজানের কাজ হতো। সবই হত। আমি একটা বই দেখেছিলাম ডিজাইন অফ কাস্টমারস ইন ইন্ডিয়া। তাতে ইন্ডিয়ান বিভিন্ন রকম কা(কার্যের বর্ণনা ছিল। নেপোলিয়ানের অভিষেকের সময় তাকে বিশেষ রকম পোশাক পরানোর কথা ভাবা হয়। সেই পোশাকের ডিজাইন মুঘলদের সময়কার দর্জিদের কাছ থেকে ঘুষ দিয়ে বার করা হয়। সে সময় তাদের ডিজাইন অন্যদরকে সহজে দিতে চাইতনা।

আমার ঠাকর্দার বাবা দর্জি পেশায় ছিলেন তবে মুল পেশা ছিল চাষবাস। আমি চার পাঁচ বছর বয়সে থান্দার পাড়ায় আমার মামার বাড়ি চলে আসি। তখন ওদের চাষবাস আমি দেখেছি। চাষবাসের ঐ পার্ট শেষ হয়ে গেছিল স্বাধীনতার আগেই। দর্জির কাজে আয় একটু বেশি ছিল। তারা দর্জির কাজে বেশি করে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাছাড়া শহর খেঁচা ভাবও দেখা দিল। চাষবাস গুটিয়ে যাওয়ারও এগুলিই কারণ, কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়। আমাদের চাষের জমিগুলো ছিল পাঁচুড়ের লাগোয়া। তখন এদিকটায় চাষের জমি তেমন ছিল না। ছিল ফটক আর খালধারী সংলগ্ন এলাকায়।

আমার বাবা দর্জির পেশায় ছিলেন। উনি লেডিজ পোশাক করতেন। তবে গাউন নয়। এদেশীয় মহিলাদের রেডিমেড গার্মেন্টস।

মাড়োয়ারীরা তখন এসবের ট্রেডিং করতো। ওরা সব কেটেকুটে দিতেন। বাবা তৈরি করে জামা দিয়ে আসতেন। আমার ঠাকুরদা এদেশীয় বনেদী পরিবারের বাড়িগুলো থেকে অর্ডার নিয়ে এসে কাজ করতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের বাড়ির জামা-কাপড়ও বানিয়েছেন।

হিন্দুরা যে এই পেশায় একদম আসেনি একথা একদম বলা যাবে না। আমার মামাদের কয়েকজন হিন্দু কারিগর ছিল। মন্মথ কাকা, রঙ্গলাল। তারা সে সময়কার মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড দর্জি ছিলেন। মন্মথ কাকা ঈদের সময় আমার মামার বাড়ির বাচ্চাদের জামাকাপড় নিজে শখ করে বানাতেন। তিনি মামাকে বলতেন, 'ছোট ওস্তাগার এই বাচ্চারা কেমন জামাটামা পরে, কি মাপ আমার জানা আছে, আমি করবো।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন যুদ্ধের পোষাক বানানোর কাজ যখন আর থাকলো না তখন একটা বিরাট ভ্যাকেন্সি দেখা গেল। অনেকে তখন তাঁবু-টাঁবু এসব যুদ্ধের ডিজপোসাল দিয়ে জামাকাপড় বানাতে শুরু করলো। রেডিমেডের সেই শুরু। হিন্দুরা তখন এসবে আর এলোনা। তারা চাষবাসেই থেকে গেল। আমার মামাদের সন্তোষপুরের লাগোয়া যেখানে চাষের জমি ছিল তারা মন্মথ কাকাদেরই চাষের জন্য দিয়ে দেওয়া হল। তদারকি ওরাই করতো। মন্মথ কাকাদের সাথে আমাদের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। ওনার দুই স্ত্রী ছিল। তাদেরকে আমরা মায়ের মতো মনে করতোম। ওরা নিঃসন্তান ছিলেন বলে আমাদের দিয়ে পুষিয়ে নিতেন। ওরা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিলেন। একবার মন্মথ কাকা লুঙ্গি পরে এলেন মামার কাছে। মামা ইয়ার্কি মেরে বললেন যা আগে ধুতি পরে আয় তবে কোন কথা শুনবো। ওরা ওখানে আর নেই। চটার দিকেও ওয়ার পিরিযডে আমাদের অনেক দর্জি ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মুসলমানরা অন্য কোন পেশা ও সরকারি সাহায্য না পেয়ে এই পেশাকেই অনোন্যপায় হয়ে আঁকড়ে থাকে। মাড়োয়ারী রেডিমেডে সূচনা থেকেই এই ট্রেড ছিল। যদিও তখনও তারা এদিকে দোকান টোকান করেনি।

থান্দার টাইটেল কোথা থেকে এলো ঠিক জানিনা। থান্দার পাড়ায় আমাদের অনেক আত্মীয় আছেন। লস্কর, নস্কর সব একই। ওরা পার্থক্য করার জন্য লস্কর আর নস্কর আলাদা করে নিয়েছে।

আমি শিখা শুরু করি ১৯৭৬ সালে। তার আগে আমি দর্জি শিল্পের সঙ্গেই ছিলাম। আমাদের প্রথম থেকেই যুদ্ধের জামাকাপড়ের টেন্ডার পেয়েছিলাম। ১৯১৪ তেও আমরা টেন্ডার পেয়েছিলাম। হাইড রোডে অর্ডিন্যান্স ফ্যাকটরি হওয়ার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পোশাকের টেন্ডারও আমরা পাই। পরে সরকার চেঞ্জ হওয়ার পরে রেলওয়ে এইসবের কাজ আমরা পেতাম। আমি পড়াশোনা শেষ করা পরে রেল, এভারটন ফউনটেন এসবের অর্ডরপত্তরগুলো ডিল করতাম। পরে ওরা মহিলা সমিতি করার পর এসব অর্ডার বাইরে দেওয়া বন্ধ করে দিল। সাজাহানপুরে এখন এদের নিজস্ব ক্লোথিং ফ্যাকটরি আছে।

আমি ৭৬-এ শিখা কতায় জয়েন করে রিটায়ার করি ৯৮ এ। ৬৬ তে আমরা এখানে প্রথম মেয়েদের স্কুল করার উদ্যোগ নিই। সে সময় এসব উদ্যোগ নেওয়ার কথা ভাবাই হতো না। আকড়ার দিকে হয়েছিল। প্রথমে অনেক বিরোধিতাও হয়েছিল। পরে যারা বিরোধিতা করেছিলো তারাই রাতারাতি পাল্টে গিয়ে সমর্থন করেছিলো। সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলো। সে সময় মানুষের হাতে কিছু পয়সাও এসেছে। তাছাড়া ১৯৬৪ এর দাঙ্গার পর এখানকার মানুষের মধ্যে এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করার একটা মানসিকতা দেখা যায়। ফলে এরকম উদ্যোগকে তারা স্বাগত জানায়। সে সময় কংগ্রেসীরা বিরাট বিরোধিতা করেছিল। আসলে যেহেতু আমরা কমিউনিস্ট ছিলাম তাই তারা আশঙ্কা করেছিল যে এতে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি নষ্ট হবে। ওরা চাইতো যে স্কুল করলে ওরাই করবে। মুসলিম লিগের তখন কোন প্রভাব ছিলো না। বড়তলা মাদ্রাসা তৈরি হয়েছিলো অনেক আগে ১৯১৭ সালে। তখন এই মাদ্রাসায় মেয়েরা যেত না। প্রথম যখন আমাদের স্কুলের বিল্ডিং ছিল তখন মেয়েদের স্কুল চালু হয় এই মাদ্রাসায়। মাদ্রাসা তখন ফাঁকা পড়ে থাকতো। এর সম্পাদক ছিলেন নুরুল হক মালি।

১৯৬৪ সালে স্কুল করার কথা প্রথম মাথায় আসে। কিন্তু ৬৪-র দাঙ্গার কারণে আর কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়ে ওঠেনি। তারপর শুরু হল ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধ। ৬৫ এর ৩১ ডিসেম্বর হঠাৎ আড্ডা মারতে মারতেই গোলাম রসুল সাহেব বললেন, স্কুল করার আমাদের সে পরিকল্পনা তো আর কার্যকরী করা গেলনা। কংগ্রেসীরাও এগিয়ে এলো না। আসলে সে সময় স্কুল করতে গেলে কংগ্রেসীদের সাহায্য লাগতোই। কারণ ঘর-বাড়ি দিলে তো ওরাই দেবে। আমি বললাম চলো, আমরাই করি। পরদিন আমরা মালি সাহেবের কাছে গেলাম। আমরা একসঙ্গে ইফতার করলাম। তারপর মালি সাহেব অন্য একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বলল বল কি বলবি। আমরা বললাম আমরা স্কুল করবো। উনি বললেন, পারবি?। আমরা বললাম, হ্যাঁ। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায়?। আমরা বললাম, মাদ্রাসায়। উনি কয়েক মহুর্ত চুপ থেকে বললেন, কর। আমরা অবাক হয়ে গেলাম এত তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে যাওয়ায়। আসলে আমরা কমিউনিস্টরা কখনো বড় মুখ করে কংগ্রেসীদের কাছে কিছু চাইনি। তাছাড়া উনি আমাদের খুব ভালোবাসতেন। উনি বললেন চিঠি দিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিতে। আমরা সেদিনই সন্ধ্যায় এসে চিঠিপত্তর সব লিখে ফেললাম। পোস্টারও বানানোর অর্ডার দেওয়া হলো। বি. এ. রহমানকে দিয়ে উদ্বোধনের কথা ভাবলাম। ওনার কাছে ডেট ও অনুমতি নেওয়ার জন্য গেলাম। উনি রাজি হয়ে গেলেন। ১০ তারিখ সন্ধ্যাবেলায় মালি সাহেব নিজে এলেন খোঁজখবর নিতে। আমরা বললাম চিঠিপত্তর তো রেডি কিন্তু আপনাকে তো সই করতে হবে। উনি সই করে দিলেন। টাকা পয়সা যা লাগে

তাও দেওয়ার আশ্বাস দিলেন। এই ভাবেই শু(হয়ে গেল স্কুল। তারপর তো কয়েকদিন পরেই মহা হইহই....। ওরা সবাই বিরোধিতা করতে শু(করলো। কিছু ধোপে টিকলো না। এদের যুক্তি(ছিলো বড় বড় মেয়েরা এসে মাদ্রাসাকে অপবিত্র করে দিচ্ছে। মাদ্রাসা তখন চলতো না। শুধু নিচে প্রাইমারি স্কুল চলতো। উপরে ছাগল-টাগল পায়খানা করতো। আমার তো জানতাম চিরকাল ওখানে স্কুল চলবে না। অনেকে নিজস্ব বিল্ডিং এর জন্য তখন চাঁদা পত্তরও দিয়েছে। যখন ইন্সপেকশনের জন্য এ. ডি. আই. এলেন উনি বললেন মাদ্রাসার সেক্রে(টারিকে বলে মাদ্রাসাটাও চালু করতে। উনি মাদ্রাসার ব্যাপারটাও দেখতেন। ৬৮-তে আমরা নিজস্ব বিল্ডিং করে এখানে চলে আসি। মেয়েদের স্কুল দিয়েই এটা শু(। ছেলেদের স্কুল হয়েছে অনেক পরে।

আমরা কলেজের যে প্রোজেক্ট নিয়েছিলাম তা পরবর্তীকালে ড্রপ করতে হয়েছে। কারণ দেখলাম কলেজ তৈরীর ব্যাপারটা এত ঘরোয়া নয়। হরিমোহন ঘোষ কলেজ এতো সুযোগ সুবিধা পেয়েও দাঁড়াতে পারেনি।

ছেলেদের থেকেও মেয়েরা এখানে পড়াশোনায় এগিয়ে। এর কারণ মেয়েদের আউটডোর ডাইভারশন কম। তারা তাই পা(ক না পা(ক পড়াশোনা নিয়েই থাকে। একটু শি(িত মেয়েদের ভালো পাত্রের অভাবে অনেক সময় বাইরে বিয়ে দিতে হয়। বিবাহের ব্যাপারে এখনও পণপ্রথার মতো কিছু অধঃপতনও শু(হয়েছে।

এই শিল্পে আমাদের কিছুটা অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা দিয়েছে বটে তবে কিছু খারাপ জিনিসও ঘটেছে। প্রবল প্রতিযোগিতার জন্য আমাদের নিজেদের যে ঐক্য ছিলো সেটা অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। ঐ ঐক্য কোন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ছিলো না। এমনই একটা মনোভাব ছিল যে আমরা সবাই এক। এক ধরণের মানুষ। তারপর ধর্ম ও রাজনীতিও আমাদের মধ্যে অনেক বিভেদ সৃষ্টি করেছে। এই ঐক্যটা আমাদের একান্ত জ(রী। এইখানকার ছেলেমেয়েদের এই বুনিয়াদি শি(ার প্রয়োজন আছে। হাজিরতন মাল্টিপারপাস স্কুলকে মাল্টিপারপাস নাম দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিলো এখানকার দর্জি সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই বুনিয়াদ শি(ার ব্যবস্থা করা। ১৯৮৭ সালে প্রথম আমি আমার এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত(করি। এই নিয়ে কিছু কথা-বার্তাও বলি।

UNRECORDED INTERVIEW

আকিনা মন্ডল ও ফতেমা মন্ডল। দুই বোন দর্জি শিল্পের সঙ্গে জড়িত। ২৭-২৮ র ফতেমা বড়। আকিনার বয়স আনুমানিক ২৫। কথা হচ্ছিল দুজনের সঙ্গে আলমপুরের প্রদীপ জানার ছোট্ট ঘরটাতে বসে। ১০/৩/২০০৫ তারিখে সন্ধ্যে ৭.১০ নাগাদ। দুজনে একই কাজ করে একই ওস্তাগরের কাছে। রোজগার দুজনের একই। কথা বলছিল মূলত ফতেমা। পাশে বসে ছিল আকিনা।

—আপনার কি এই অঞ্চলেই থাকেন?
—হ্যাঁ, এই আলমপুরে।
—এটা কি আপনাদের শ্বশুর বাড়ি নাকি বাপের বাড়ি?
—বাবার বাড়ি। আমাদের দুজনের বিয়ে হয়নি।
—আপনারা কবছর এই কাজ করছেন?
—তা দশ বছর হবে।
—আপনাদের পরিবারে এ কাজ কি আগাগোড়াই হয়ে আসছে?
—আমার বাবা করতেন। তারপর বাবা মারা যাবার পর দাদা কিছুদিন এ কাজ করেছিল। প্যান্টের কাজ করতো। তারপর আমরা একাজ করছি। আমার দাদা তারপর পোদ্দারে কাজ পেয়ে যায়। আমরা দুই বোন প্রথমে মেশিনে কাজ করছি।
—আপনার একাজে কেন এলেন?
—কি করবো। পরিবারের অবস্থা ভালো নয়। তাই একাজ করতে হয়।
—আপনার বাবা মারা যাবার পর আপনার মা একাজ করেননি?
—না।
—কেন?
—মা এই কাজ জানতেন না। খুব বোকা সোকা মানুষ ছিলেন।
—আপনার বাবা কবে মারা যান?
—অনেকদিন। তখন এই বোনের বয়স তিনমাস।
—তখন আপনাদের কিভাবে চলতো?

—মা কাজ করতো।
—কি কাজ?
—লোকের বাড়ি ঝি-এর কাজ।
—আপনারা কোন ওস্তাগরের কাজ করেন?
—এই জামাইবাবু (প্রদীপ জানা) যে ওস্তাগরের কাজ করছেন, সেই এনায়েৎ ওস্তাগরের।
—প্রথম থেকেই এই ওস্তাগরের কাজ করছেন?
—না, কয়েকমাস ধরে করছি।
—আগে কোথায় করতেন?
—সন্তোষপুরে রহমান ওস্তাগরের কাছে।
—সেখানে কি কাজ করতেন?
—ছোট প্যান্ট বানাতাম।
—বাচ্চাদের প্যান্ট!
—বাচ্চাদের প্যান্ট মানে ১০/১২ বছরের বাচ্চারা পড়তে পারে।
—এখানে(এনায়েতের) কি বানান?
—এই গেঞ্জি, ছোট প্যান্ট।
—এখন কেমন রোজগার করেন?
—দুজনে মিলে বসে ১০০০ টাকার মতো।
—সুতো কি আপনার! কোথা থেকে কেনেন, ধারে নাকি নগদে!
—হ্যাঁ। এখান থেকেই কিনি। যখন যেমন সুবিধা হয় সেরকম।
—সুতোর জন্য কি রকম খরচ হয়?
—মাসে ৭৫ টাকার মতো।
—তার মানে ১০০০ টাকা রোজগারের মধ্যে কি সুতোর দামটাও আছে?
—হ্যাঁ।
—ভালো ছিল না। কোন রকমে চলে যেত।
—যদি কখনও কোন অসুবিধায় পড়তেন তাহলে কি ওস্তাগর আপনাদের কোন সাহায্য করতো। অথবা কোন বোনাস দিত?
—কিছু কিছু সাহায্য করতো। হয়তো আগেই টাকাটা দিয়ে দিত। পরে কাজ করে শোধ করে দিতাম। তবে বোনাস কিছু দিত না। ঈদের সময় জামা দিত।
—কখনও কি এরকম হয়েছে যে ওস্তাগর আপনাদের ঠকিয়েছে?
—না। কখনও সেরকম হয়নি। বরং যদি ৯৫ টাকার মতো হয় তবে একেবারে ১০০ টাকাই দিয়ে দিয়েছে।
—আপনারা কি এরকম শুনেছেন যে অন্য কেউ এভাবে ঠকেছে।
—না, সেরকম শুনিনি।
—আগে যে প্যান্টের কাজ করতেন তার রেট কিরকম ছিল?
—২৪ টাকা ডজন দিত।
—বিক্রি(হতো কততে বাজারে প্যান্টগুলো?
—১০ টাকা পিস।
—এখন যে কাজ করছেন তা কিরকম রেটে করছেন বা কি হারে?
—তিন দিন বাদে ৯ ডজন, প্রতি ডজন ২০ টাকা, প্যান্ট ধরলে।
—যে প্যান্ট তৈরি করতেন তা কোথায় বিক্রি(হতো?
—মঙ্গলাহাটে।
—সেখানকার খদ্দের কারা ছিল, এখানকার নাকি বাইরের?
—সেটা আমরা জানিনা। আমাদের সঙ্গে এসব নিয়ে কোন আলোচনা হত না।
—রজমান ওস্তাগরের মেয়েরা কি লেখাপড়া শিখতো?
—সেরকম কিছু নয়?
—আপনারা তো দুজনে বেশ কয়েক বছর কাজ করেছেন আপনাদের ব্যাঙ্কের পাশ বই আছে?

—ছিল। কিন্তু সব টাকা তুলে নিয়ে কেনসেল করে দিয়েছি। টাকার দরকার ছিল।
—এখন আবার বই করছেন না কেন?
—এখন যা রোজগার করি খেতে চলে যায়। জমাবার মতো কিছু থাকে না।
—আপনারা কি কিছু লেখাপড়া জানেন?
—সেরকম কিছু নয়। ফাইভ অবধি। বাড়ির অবস্থা ভালো ছিল না কি করে পড়বো।
—এই কাজ ছাড়া অন্য কোনও কাজের চেষ্টা কখনও করেছেন?
—কয়েক মাস আগে মাঝের হাট ব্যাগ কোম্পানিতে একটা কাজের জন্য চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমার শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছিল, যেতে পারিনি, অন্য জনের হয়ে যায়।
—আগে তো মুসলিম বাড়ির মেয়েরা বাইরে গিয়ে কোন কাজ করতো না। এখন কি সেটা করছে?
—কিছু কিছু করছে।
—বাড়ির বাইরে না যাবার কারণটা কি?
—মানে, বাড়ির বাইরে খারাপ কিছু হতে পারে। সেটাই আমরা ভাহতাম।
—আপনি তো বেশ কয়েক বছর আপনার বোনকে নিয়ে বাইরে গিয়ে কাজ নিয়ে এসেছেন। যাতায়াত করেছেন। আপনার কি মনে হয় বাড়ির বাইরে যাওয়া মানে খারাপ কিছু?
—আমার তো তা মনে হয় না। তবু সবাই বলে, নিন্দে করে।
—কারা মানা করে যেতে। নিন্দা করে কারা?
—দাদা-ভাইরা মানা করে। পাড়া প্রতিবেশি নিন্দা করে বাড়ির মেয়ে বাইরে যাচ্ছি। (পাশ থেকে আকিনা বলল, কেউ একটা পয়সা হাতে দেবে না, কিন্তু নিন্দা করতে, বাধা দিতে ছাড়বে না)
—আপনার কাছে কোন ছোট মেয়ে এসে যদি বলে আমি বাইরে গিয়ে কাজ করবো, তাহলে কি আপনি তাকে নিন্দা করবেন নাকি বাধা দেবেন?
—না আমি সেরকম কিছু করবো না। বাইরে কাজ করতে যেতেই হবে।
—দর্জি সমাজটাকে আপনি কেমন দেখছেন। এটা কি আগের থেকে উন্নতি হয়েছে?
—হ্যাঁ হয়েছে। আমার বাবারা যখন কাজ করতো ছোট মেশিনে সেরকম পয়সা ছিল না। এখন তো তার চেয়ে বেশি হয়েছে।
—মুসলিম সমাজেই কিন্তু আছে মেয়ে চাকরি করে সারাদিন বাইরে থাকছে!
—ভালো ছিল না। কোন রকমে চলে যেত।
—যদি কখনও কোন অসুবিধায় পড়তেন তাহলে কি ওস্তাগর আপনাদের কোন সাহায্য করতো। অথবা কোন বোনাস দিত?
—কিছু কিছু সাহায্য করতো। হয়তো আগেই টাকাটা দিয়ে দিত। পরে কাজ করে শোধ করে দিতাম। তবে বোনাস কিছু দিত না। ঈদের সময় জামা দিত।
—কখনও কি এরকম হয়েছে যে ওস্তাগর আপনাদের ঠকিয়েছে?
—না। কখনও সেরকম হয়নি। বরং যদি ৯৫ টাকার মতো হয় তবে একেবারে ১০০ টাকাই দিয়ে দিয়েছে।
—আপনারা কি এরকম শুনেছেন যে অন্য কেউ এভাবে ঠকেছে।
—না, সেরকম শুনিনি।
—আগে যে প্যান্টের কাজ করতেন তার রেট কিরকম ছিল?
—২৪ টাকা ডজন দিত।
—বিক্রি(হতো কততে বাজারে প্যান্টগুলো?
—১০ টাকা পিস।
—এখন যে কাজ করছেন তা কিরকম রেটে করছেন বা কি হারে?
—তিন দিন বাদে ৯ ডজন, প্রতি ডজন ২০ টাকা, প্যান্ট ধরলে।
—যে প্যান্ট তৈরি করতেন তা কোথায় বিক্রি(হতো?
—মঙ্গলাহাটে।
—সেখানকার খদ্দের কারা ছিল, এখানকার নাকি বাইরের?
—সেটা আমরা জানিনা। আমাদের সঙ্গে এসব নিয়ে কোন আলোচনা হত না।
—রজমান ওস্তাগরের মেয়েরা কি লেখাপড়া শিখতো?
—সেরকম কিছু নয়?
—আপনারা তো দুজনে বেশ কয়েক বছর কাজ করেছেন আপনাদের ব্যাঙ্কের পাশ বই আছে?

—ছিল। কিন্তু সব টাকা তুলে নিয়ে কেনসেল করে দিয়েছি। টাকার দরকার ছিল।
—এখন আবার বই করছেন না কেন?
—এখন যা রোজগার করি খেতে চলে যায়। জমাবার মতো কিছু থাকে না।
—আপনারা কি কিছু লেখাপড়া জানেন?
—সেরকম কিছু নয়। ফাইভ অবধি। বাড়ির অবস্থা ভালো ছিল না কি করে পড়বো।
—এই কাজ ছাড়া অন্য কোনও কাজের চেষ্টা কখনও করেছেন?
—কয়েক মাস আগে মাঝের হাট ব্যাগ কোম্পানিতে একটা কাজের জন্য চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমার শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছিল, যেতে পারিনি, অন্য জনের হয়ে যায়।
—আগে তো মুসলিম বাড়ির মেয়েরা বাইরে গিয়ে কোন কাজ করতো না। এখন কি সেটা করছে?
—কিছু কিছু করছে।
—বাড়ির বাইরে না যাবার কারণটা কি?
—মানে, বাড়ির বাইরে খারাপ কিছু হতে পারে। সেটাই আমরা ভাহতাম।
—আপনি তো বেশ কয়েক বছর আপনার বোনকে নিয়ে বাইরে গিয়ে কাজ নিয়ে এসেছেন। যাতায়াত করেছেন। আপনার কি মনে হয় বাড়ির বাইরে যাওয়া মানে খারাপ কিছু?
—আমার তো তা মনে হয় না। তবু সবাই বলে, নিন্দে করে।
—কারা মানা করে যেতে। নিন্দা করে কারা?
—দাদা-ভাইরা মানা করে। পাড়া প্রতিবেশি নিন্দা করে বাড়ির মেয়ে বাইরে যাচ্ছি। (পাশ থেকে আকিনা বলল, কেউ একটা পয়সা হাতে দেবে না, কিন্তু নিন্দা করতে, বাধা দিতে ছাড়বে না)
—আপনার কাছে কোন ছোট মেয়ে এসে যদি বলে আমি বাইরে গিয়ে কাজ করবো, তাহলে কি আপনি তাকে নিন্দা করবেন নাকি বাধা দেবেন?
—না আমি সেরকম কিছু করবো না। বাইরে কাজ করতে যেতেই হবে।
—দর্জি সমাজটাকে আপনি কেমন দেখছেন। এটা কি আগের থেকে উন্নতি হয়েছে?
—হ্যাঁ হয়েছে। আমার বাবারা যখন কাজ করতো ছোট মেশিনে সেরকম পয়সা ছিল না। এখন তো তার চেয়ে বেশি হয়েছে।
—মুসলিম সমাজেই কিন্তু আছে মেয়ে চাকরি করে সারাদিন বাইরে থাকছে!
—তারা তো সব লেখা পড়া শেখা পয়সাওয়ালা লোক। আমরা লেখপড়া জানি না। বাড়ির অবস্থা ভালো নয়।
—আপনারা তো হিন্দু-মুসলমান সব একসঙ্গেই থাকেন! হিন্দুদের পরবে নিশ্চয় আপনারা অংশগ্রহণ করেন, যেমন ঠাকুর দেখা!
—হ্যাঁ করি। ওরাও আমাদের উৎসবে আসে। আমাদের মধ্যে সে রকম কোন ভাগ নেই। আমরা তা মনে করি না।
—আপনারা তো সেরকম ভাবে পড়াশোনার সুযোগ পাননি। এখন যারা মুসলিম মেয়ে আছে তারা কি পড়াশোনা করছে।
—হ্যাঁ আগের চাইতে বেশি করছে।
—এখানে যেটা আমি জানি যে বুধবার দর্জি ভাইদের ছুটি থাকে, তারা সেদিন কাজবাজ করেনা। আপনারাও কি সেরকম কোন ছুটির দিন নেন?
—আমরাও নিতে পারি। কিন্তু নিই না। কারণ কাজ না করলে তো পয়সা পাবো না।
—আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কি বোরখা ব্যবহার করেন?
—সেরকম ভাবে না।
—কারা বেশি করেন?
— উর্দুভাষীরা বেশি ব্যবহার করেন।
—বোরখার দাম কি রকম?
—২০০-৩০০-৪০০ বিভিন্ন রকম হয়।
—অবিবাহিত বিবাহিত সবাই কি বোরখা পরতে পারে?
—হ্যাঁ, তবে চল আগের থেকে নেমে গেছে।
—বিভিন্ন সময় সরকার সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন রকম ঋণ দেন। সেরকম কোন ঋণের জন্য কি কখনও আবেদন করেছিলেন?
—না।
—এখন বিভিন্ন রকম ট্রেনিংও দেওয়া হচ্ছে, কিছু নেবার চেষ্টা করেছেন?
—না।

UNRECORDED INTERVIEW

অনুপ মজুমদার, কলকাতা পৌরসভা, কথা হচ্ছিল পৌরসভার (রামনগর কার্যালয়ে)। তার নিজের ক(বসে। ১৬.১১.২০০৪ বেলা ২ টা নাগাদ।

প্র(ছিল, মোট কত লাইসেন্স হোল্ডার দর্জি আছে এ অঞ্চলে। তিনি উত্তর দিলেন ৩০-৪০ শতাংশ লাইসেন্স হোল্ডার দর্জি আছে এ অঞ্চলে। ১৯৯৮-৯৯-তে মোট ৫০০০ হাজার লাইসেন্স হোল্ডার ব্যবসায়ী ছিল(সবরকম ছোট বড় মিলিয়ে)। তিনি জানান ১৯৯৩-৯৪ তে দশটাকা লাগতো লাইসেন্স করাতে। সে সময় বেশ কিছু দর্জি লাইসেন্স করিয়েছিল। কারণ অল্প পয়সায় সুবিধাটা পয়সা যাচ্ছে। কিন্তু পরে প্রবনতাটা কমে আসে। লাইসেন্স না করার কারণ হিসাবে অনুপবাবু মনে করেন, লাইসেন্স করলেই সরকারের সঙ্গে ওদের একটা যোগসূত্র তৈরী হবে। তাতে হয়তো ভবিষ্যতে ওদের ব্যবসা অসুবিধায় পড়বে। সেজন্য বেসরকারি ভাবেই ওরা ব্যবসা চালিয়ে যায়। সেজন্য বেসরকারি ভাবেই ওরা ব্যবসা চালিয়ে যায়। যদি কখনো লাইসেন্স সংত্র(ান্ত কোন বিষয়ের প্রয়োজন হয় তার জন্য কয়েক টাকা খরচ করতেও ওরা পিছপা হয়না। তবে উর্দূভাষী মুসলমান ব্যবসায়ীদের (দর্জি নয়) মধ্যে এই প্রবণতাটা কম।

প্র(করেছিলাম, এখানে ঘুড়ি শিল্পটির অবস্থা কিরকম? তারা কি লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করছে? তিনি বলেন, অধিকাংশ ঘুড়ি মালিকেরই লাইসেন্স আছে। অন্তত এ ব্যপারে তারা দর্জি শ্রেণীর চাইতে এগিয়ে। ব্যবসায়িক লেনদেন দর্জিদের চাইতে কম হলেও এদের অধিকাংশেরই লাইসেন্স আছে।

২০০২ তে একবার লাইসেন্সের ব্যাপারে বেশ চাপ দেওয়া হয়েছিল। এমনকি দর্জিপ্রবণ এলাকাগুলোতে গিয়ে পুরকর্মীরা এ ব্যাপারে তাদের সজাগ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাতেও বিশেষ কাজ হয়নি। বরং উল্টোফল হয়েছিল। কিছুটা বি(োভের মুখে পড়তে হয়েছিল তাদের। এর পিছনে কোন রাজনৈতিক দলের দাদাদের প্ররোচনা থাকতে পারে বলেও মনে করেন অনুপবাবু। এর পিছনে শি(ারও একটা ব্যাপার আছে। কারণ বাংলাভাষী মুসলমান শ্রেণীর মধ্যে শি(ার আলো তেমন ভাবে পৌঁছায়নি।

ওয়ার্ড ভিত্তিক একটি পরিসংখ্যান চাওয়া হয়েছিল তার কাছ থেকে। তিনি বললেন, ১৩৩নং ওয়ার্ড ১০৯-এর মধ্যে ৫ শতাংশ দর্জি, ১৩৪-এ ০ শতাংশ, ১৩৫-এ ০ শতাংশ, ১৩৬-এ ০ শতাংশ, ১৩৭-এ ০ শতাংশ। এইগুলিতে দর্জি সংখ্যা খুবই কম। ১৩৮ এ ১৭২ জন, তারমধ্যে ৬০ শতাংশ দর্জি, ১৩৯-এ ২৯৭ জনের ২০ শতাংশ দর্জি, ১৪০-এ ৮৯ জনের ৫০ শতাংশ দর্জি, ১৪১-এ ৭৪ জন এর ৪০ শতাংশ দর্জি।

সবমিলিয়ে ৩০০০ মতো দর্জি লাইসেন্স আছে। সেটা মোটামুটি ৪০ শতাংশ। তবে সংখ্যাটা আগের থেকে বেড়েছে। অনুপবাবুর মতে সামগ্রিকভাবে এ অঞ্চলে দর্জি শিল্পের অবস্থাটাই খুব খারাপ। এটা বর্তমানে শ্যামনগর ও বোনগাঁ লাইনে বহু জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারছে না এ অঞ্চলের দর্জিরা।

দর্জিশিল্পের আধুনিকতার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কিছু কিছু (ত্রে আধুনিক মেশিন ও যন্ত্রের সাহায্যে নেওয়া হলেও সেটা খুব বিরাট কিছু নয়। তবে মেটিয়াব্রুজের দর্জি শিল্পের এই অবহতির জন্য এসকল দর্জিরাই দায়ী বলে তিনি মনে করেন।

কারণ একসময় এরা ভাহতো এদের সমক(বোধহয় কেউ নেই। তার দলে কিছু কিছু (ত্রে মালের মান এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে অন্যান্য জায়গার অমুসলিম কারিগররা বাজারটা ধরে নেয় (বনগাঁ, শ্যামনগর)। তাছাড়া মেটিয়াব্রুজের দর্জি শিল্পটা অনেকটা ছড়িয়ে যায়। বর্তমানে হাটগুলো হওয়াতে কিছুটা জৌলুস বাড়লেও আগের সেই সময় আজ আর নেই।

বলেছিলাম, আবার যদি প্রয়োজন পড়ে আপনার কাছে আসবো। অনুপবাবু হেসে বললেন, নিশ্চয় আসবেন।

UNRECORDED INTERVIEW

অনুপ মজুমদার, কলকাতা পৌরসভা, কথা হচ্ছিল পৌরসভার (রামনগর কার্যালয়ে)। তার নিজের ক(বসে। ১৬.১১.২০০৪ বেলা ২ টা নাগাদ।

RECORDED INTERVIEW

ডাঃ কিউ. এইচ. হান্নান। ১০/৪/২০০৫, সকাল ১১ টা, গার্ডেনরীচ নার্সিংহোম।

১৯৬৪ সালে দাঙ্গার সময় আকড়া ফটক থেকে মেটিয়াব্রুজ থানা পর্যন্ত ৩০ টা দোতলা বাড়ি ছিল। বেশিরভাগ বাড়ি ছিল একতলা, ছিটেবেড়া খাপলা-টালির চালের। নতুন গাড়ি ছিল একটাই, লক্ষ্মীবাবুর।

১৯৬১ সালে অ্যামবাসাডারের দাম ছিল ন'হাজার সামথিং। সবে অ্যামবাসাডার লঞ্চ করলো। গাড়ি পেতে হলে ৬ মাস, ১ বছর অপে(া করতে হতো। সেটা লক্ষ্মী ডাক্ত(ারের জামাই ডিসকাউন্টে পেত। ও হিন্দুস্থান মোটর্স-এ কাজ করতো। আবার ২

বছর চড়ে বিক্রি(করে দিতেন। লক্ষ্মীবাবু ছিলেন এই অঞ্চলের এম. বি. ডাক্ত(ার। উনি গার্ডেনরীচ মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। আমার শ্বশুর চেয়ারম্যান হতেন, উনি ভাইস চেয়ারম্যান।

দর্জি শিল্পের কথা বললে আমি ১০ বছর ১০ বছর করে এগোতে পারি। আমি এখানে আসি ৫৪ সালের ২ রা জানুয়ারি। বি. এস. সি. পাশ করে আগে আমি বর্ধমানে মাস্টারী করতাম। এখানে এসে মেটিয়াব্রুজ হাই স্কুলের মাস্টার হলাম। বাবা মারা যান ১৯৫৩ তো, উনি এল. এম. এফ. ডাক্ত(ার ছিলেন। বাবার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিলো আমি ডাক্ত(ার হই। মেটিয়াব্রুজ হাইস্কুলে একজন পন্ডিতমশাই ছিলেন। হেরম্ববাবু। তিনি প্রথমদিকে আমায় গালাগাল করতেন। পরে আমায় কী ভালোবেসে ফেললেন.....।

এখানে ডাক্ত(ার হয়ে এলাম ১৯৫৯-এ। দর্জি সমাজের চিত্রটা কিন্তু একই রকম ছিলো। তখন এই লেভেলে ছিলো, এখন এই লেভেলে উঠলো। গরিব ছিলো, এখনও আছে। তখন চটকল ছিলো এখানে, জি. আর. এস. ই.-র জায়গাটাকে বলা হতো হাড়ভাঙা কল। গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপ ছিলো না, ছিল বোর্ন ব্র(্যাসিং শপ। তারপর কেশোরাম, ক্লাইভ জুট মিল। ইউনিয়ন সাউথ জুট মিল, east of ganges it was the biggest jute mill—মানে গঙ্গার পূর্বতীরে ওই নদীয়া থেকে আরম্ভ করে এটাই ছিলো সবচেয়ে বড়। আর এখানে ছিল বিখ্যাত সোরার কারবার—সোরা, বন্দুকে যেটা লাগে। ওই বড় সাহেবের হাটে বিক্রি(হতো। CIWTC'র নাম ছিল আগে RSF, সেই কোম্পানির বড় সাহেব বসিয়েছিলেন বলে বড় সাহেবের হাট। যেমন সুতানুটিতে সুতো বিক্রি(হতো। দর্জিদের সমাজ চিত্রটা কিন্তু একই। তখন ৫ টাকা ছিল, একন ২৫ টাকা।

প্রথম যখন এলাম ইলেকট্রিসিটি ছিল না। সবাই কলে সেলাই করতো। আজকের কল নয়, তখন ছিল উইলসন মেশিন। কাজ ছিল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। সুর্যি ডুবে গেলে, সে মেঘলা হোক বা যাই হোক, কাজ বন্ধ। সন্ধ্যের সময় গা ধুয়ে, একটু আতর টাতর লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লো সব। কেউ সিনেমা দেখল, কেউ পান খেল, কেউ গল্প করল, কেউ মাগীর বাড়ি গেল।

মঙ্গলবার হাটে রোজগার হয়, এই ৫ দিন ধরে কাজ করে হাটে গিয়ে বিক্রি(হয়। বুধবার দিন ওমুককে দেব। মানে পে-ডে।

বুধবার দিন আমাদের (গী বেশি হয়। এখনও বুধবার, বৃহস্পতিবার। পয়সাটা পায় বলে। আজকে হাতে পয়সা নাই রে.....। তখন (গী দেখতাম বিশেষ করে রাত ন'টার পরে। সন্ধ্যের সময় বেড়িয়ে এল, রাত্রি ন'টার পর ঘরে গেল। বিবি ঝগড়া করতে লাগলো, ছেলেটার সকাল থেকে শরীর খারাপ, তুমি কোনও খবর রাখলে না....রাত্রি ন'টা, ১০টা,১১টা,১২টা পর্যন্ত (গী নিয়ে ডাক্ত(ারের কাছে দৌড়লো।

৫৪ সালে এসে দেখলাম এইসব দহলিজে কাজ হচ্ছে, অপূর্ব সব। আমি যখন প্রথম আসি হাসেম মোল্লার ঘরে থাকতাম। Y-211 মোল্লাপাড়া। ওই বাড়ির সামনে যে বিরাট দহলিজ আছে, ওর পাশে আমার বাস ছিল, প্রথমে ৭ মাস। ওখানে কাজ বসতো, তিনজন বসতেন হাসেম মোল্লা, কাসেম মোল্লা আর হাদা মোল্লা। হাসেম মোল্লার ছেলে হল হবিবর, সফিউর, গোরা,.....। কাসেম মোল্লার ছেলে হল ....., ফজলে আজিম.....। হাদা মোল্লার কাজ কম ছিল। উনি বাড়ি ভাড়া দিতেন, লাইন ঘর। হাদা মোল্লার লাইন ঘর। বটতলা বাজারে।

তখনকার দিনে রোগ ছিল কাসি-সর্দি। এখনও তাই আছে, রোগের চালচিত্র কিছু পাল্টায়নি। style of treatment পাল্টেছে।

একটা ঘটনা বলি। একটা ছেলেকে—বছর কুড়ি—ওর মা নিয়ে এসেছে পদিরহাটি থেকে। ওর তিন ভাই, আর তিন বোন। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কাজ করতে হয়। বাবা গরিব। ছেলেটার খুব খারাপ অবস্থা। আমি তো ওর মাকে বেধড়ক উল্টোপাল্টা কথা বললাম। তুমি ওকে মেরে খাচ্ছো। ওকে খেতে দাওনা, গরিব বলে, আর ওকে কলে খাটিয়ে নাও। ও কীভাবে কল চালাবে। এরপর তো কলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে। সেদিন ওর মা কসম খেয়ে যায়, আমি নিজে একবেলা খাব, ওকে তিনবেলা খাওয়াবো, দুধ দেব।

প্রথম দশবছর এরকম দেখেছি। আমি ডাক্ত(ারি করতে বসলাম এখানে ৫৯-এ। অ্যাকসিডেন্টালী। ডাক্ত(ারি পাশ করেছি সবে দু মাস। পরী(া দিয়েছি এক মাস, রেজাল্ট বেরিয়েছে এক মাস। সেপ্টেম্বরের ১৯ তারিখে এখানে এসে ডাক্ত(ারি শু(করেছি। তখন ট্রেনিং পিরিয়ড। হবি গেল, বলল, কী সারাদিন বসে বসে গল্প করিস, আমাদের ওখানে ডাক্ত(ার নেই, চল না।.....। ওতেই হবে। প্রথম বসেছিলাম ইয়াকুব ডাক্ত(ারের পাশের ঘরে। তখন তো ডাক্ত(ারির ড বুঝি না। সফি বসত একপাশে। সফি ছিল এল. এম. এফ.। ফণীভূষণ চ্যাটার্জী তখন পড়াশোনা করতে গেছেন। চেম্বার ছিল, প্র্যাকটিশ ভাল হচ্ছে না বলে ডি. আই. এইচ. পড়তে গেলেন, চাকরি করবেন।

আমার প্রথম (গী, একটা খুব মারাত্মক (গী, মরে যাবেই। দেখতে গেলাম। রহিম বকসের খালা। দেখতে গিয়ে চোখ দিয়ে জল এসে গেল। ছেড়া কাথা গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। ভাঙা টালির ছাদ। এদিকে জল পড়ছে, ওদিকে জল পড়ছে। (গীটা মরেই যাবে। সেই (গীটা
-কে দেখে ভাল হয়ে গেল।

ছেড়া কাঁথা আর কারও ঘরে নেই। রোগটা ঠিকই আছে। ডাক্ত(ার আগে ঘরে গিয়ে দেখত, এখন ডাক্ত(ারখানায় এসে

দেখানো তখন ৫ টাকাতেও হত, এখন পাঁচশো টাকায় তা হয় । তখন সারা দিনের মজুরি দেড় টাকা। এখন তিন দিনের মজুর পঁচশো টাকা। এখন বরং জামাকাপড় সস্তা হয়েছে।

বদরতলার দিকে ধান হত, তবে আমারা গ্রামের ছেলে তাকে আর ধানচাষ বলব না। শখ করে ফুল গাছ লাগনোর মতো।

বাচ্চা হলে টিটেনাস হত। সকালবেলায় আই. ডি. হাসপাতালে পাঠাতাম। মরে গেলে সন্ধ্যেবেলায় নিয়ে আসত। ঘরে ঝাড়ফুঁক হত। আর বাচ্চা হওয়া তো দশ মিনিটের ব্যাপার। বেশিরভাগ লোকই সপ্তাহে ৫ দিন খেত, আর দুদিন খেতে পেত না। এখনও বহু লোকের সপ্তাহে দুদিন খাওয়া জোটে না। এখন তো বড়লোকের বাড়িতে নতুন বড়লোক হয়েছে প্রমাণ করার জন্য খাওয়ানো হয়। আন্তরিকতা নেই, জাকজমকটা আছে। ৫৬ সালে একটা খেয়েছিলাম আজও মনে আছে। রিলিফ ওয়ার্ক করতে গিয়ে এক ভদ্রমহিলা আমাকে গরদের শাড়ি পরে খাইয়েছিলেন। হাওড়ার.....পাশের গ্রামের নামটা আমার মনে আছে।

এখানে পেশাগত রোগ নেই। তবে ওর বাড়ি আর আমার বাড়ি, মাঝখানে দু ফুট, ঘেসাঘেসি, যা কিছু রোগ হচ্ছে এর জন্য।

১৯৬৪ সালে রাতারাতি একটা স্ট্রাইক হলো এখানে। এই সমস্ত গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিটা একেবারে ডেডলক হয়ে গেল, স্টপড। এইখানে পুরো স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়ে গেল। স্ট্রাইকের প্রথমদিকে.....কী করে খাব? সাত দিন পরে সেই লোকই বলল, আরে ভাই মজা হয়ে গেছে। রাত্তিরবেলা এসে কেঁদে বলছে, 'দাদা দুটো কাজ দে, না হলে ছেলেপুলে খাবে কী, ভোরবেলা এসে দিয়ে যাব, কাকপ(ীও জানতে পারবে না।' স্ট্রাইকে সব বন্ধ। রাত্তির বেলা কল চালিয়ে সকালে এসে দিয়ে গেল দুডজন তিনডজন মাল। মেয়েরা কাপড়ের তলায় আড়াল করে। এক মাসের মধ্যে আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল স্ট্রাকচারটার। স্ট্রাইক অফ হয়ে গেল। সব চলে গেল। কেউ খেতে পারছে না। সবাই সন্ধ্যার সময় গিয়ে কাপড় নিয়ে আসে ওস্তাগারের ঘরে থেকে, আর ভোরবেলায় দর্জির স্ত্রী বোরখার তলায় করে মাল্ দিয়ে আসে। পয়সা নিয়ে আসে। এই যে কন্ট্রাকট বেসিসটা এইবার এসে গেল। তার আগে তো সন্ধ্যার পর কল চলতো না। সান্নাটা, কেউ বসে তাস খেলছে, গল্প করছে গাছতলায় বসে। তখন এখানে কয়েকজন লোক বাইরে থেকে ধরে নিয়ে আসা হত কাজ করার জন্য।

কানাই বলে একটা ছেলে হাসেম মোল্লার দহলিজে কাজ করত। মহা ত্যাঁদোড় বদমাস ছেলে ছিল। বলত, 'এই শালার দর্জিরা বড়ো খচ্চর, আমাদের রক্ত(চুষে খায়। আর আমাদের খেতে দেয় না।' হাসেম মোল্লা ওকে খুব ভালবাসত। কারণ কাজকর্মে সে ছিল খুব পাকা। কানাই বাইরের ছেলে।

মাসখানেকের মধ্যে সব চেঞ্জ হয়ে গেল। ওস্তাগররা বলল, 'ভাই, আমাদের ভাল হয়েছে। এদ্দিন আমাদের বৌরা খাবার নিয়ে ঠেলাঠেলি করত। শালা দহলিজে কাজ করত, এই তেল দাও, নুন দাও, ঘি দাও। এখন আর কিছু না। তুমি হয় কাজ করতে হয় করো না হলে যাও। এখন কমপিটিশন। এইকটা মাল সেলাই করলে এই পয়সা নাও। কন্ট্রাকট সিস্টেম এসে গেল। পিস রেট। তখন থেকে এখন পর্যন্ত চলছে সকাল ছটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কাজ। তার আগে ছিল ডে-রেট, রোজ হিসাবে কাজ।

যারা এখন ওস্তাগর তারা শুধু কী করে বিজনেসটাকে চালিয়ে রাখবে ভাবে, আর যারা কাজ কাজ করবে তারা মাল নিয়ে যাচ্ছে। একদম ভাগ হয়ে গেল .....। পচন্দসই কাজ হলে, কডজন মাল আছে রে, তিন ডজন। ঠিক আছে। চার ডজন ঠিক আছে। এর মধ্যে কেউ কেউ আবার একটু নতুন কায়দা করেছে, একদম আনকোরা লোককে নেবার জন্য, আমাক কল, আমার চাকা, আমার পাখা সব। তুমি খালি সেলাই করবে খাবে। তিনদিনে আমার কাজ গুছিয়ে দেবে। এইসব যখন হল, তখন নন্দীগ্রাম, মুর্শিদাবাদ থেকে আসতে লাগল। ওদের হাতে কিছু নেই। কলও নেই, টাকাও নেই। কলকাতায় এল। কী আর হবে? বসে গেল। কাজ দিল। কিংবা তুমি কাজ করছিলে, কুড়ি বছর বয়স। আমাকে সাথে করে নিয়ে এলে। তুমিই মেইন। এ সেকেন্ড, ও থার্ড। ও জল-টল এগিয়ে দেয়, কলে তেল দিয়ে দেয়, খাবরটা নিয়ে আসে। রান্নাবান্না করে, থালা ধোয়। এইভাবে নন্দীগ্রামের এক-একটা গ্রুপ এল। চার-পাঁচ জন করে এক একটা গ্রুপ। একজন ওদের মধ্যে রান্না করে, দেখাশোনা করে। বাকি কজন কাজ করে। এক খানা ঘর দুখানা ঘর নিল। তিন চারজন মিলে করল। দেশে গিয়ে জমির কাজটা করে এল বর্ষার সময়। বাকি সময়টা এখানে কাজ করল।

এবারে এখানকার লোকেরা আটকে গেল। এখানকার লোকের তো জমি নেই। নন্দীগ্রামের লোকের এখানে বারো আনা। ওখানে চার আনা। যারা এখানকার লোক ওই। এখন তো আরোও খারাপ হয়েছে। এরা এখানে আর ঘর নিচ্ছে না। একটা বাস যায়। দুপুরবেলা যাচ্ছে। আজকে কাপড় নিয়ে যাচ্ছে, তিনদিন পরে মাল দিচ্ছে। আমারই কল, আমারই তেল, আমারই নুন....ঘরও ভাড়া নিচ্ছে না। এরা তো আমার পেশেন্ট।

এখন পার পিস দাম কমেছে। সস্তা হয়েছে। যে জিনিসটার দাম দশবছর আগে ছিল পাঁচটাকা। এখন তার দাম সাত টাকা, মার্কেট ভ্যালু অনুযায়ী হওয়া উচিৎ আট টাকা। এই সস্তা হওয়ার কারণ তুমি অ্যাফোর্ড করতে পারছ, তোমার ছেলেকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। কমপিটিশন একটা ফ্যাকটর। কিন্তু মেইন ফ্যাকটর আমি পারছি বলে।

একটা ঘটনা বলি। মাঝের পাড়ায় একদিন গেছি, চাঁদা না কিসের জন্য, সেবা সদনের জন্য। আমার চা(ষ দেখা। একটা দহলিজ থেকে একজন বেরিয়ে এসে খুব জোরে, 'সালাম ওয়ালেকুম' বলল। আমি বললাম কীরে তোর বাড়ি?' বলল, হ্যাঁ।

একটা ছোট্ট ছেলে,

ছেলে, দশ বছর বয়েসের, কাপড় কাটছে সুন্দর করে। আমি দেখে থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম, 'এটা কেরে?'—'কেন, ছেলে'। —'কাজ শেখাচ্ছিস?'—'কাজ না শিখলে খাবে কী?' দশ বছরের ছেলে কাজ না করলে খাবে কী। আমি যখন এক ডজন মাল সেলাই করে কুড়ি টাকায় দেব, ও তখন ওর ছেলেকে দিয়ে কাটিয়ে সেলাই করে সেটা উনিশ টাকায় দিতে পারছে।

শি(া বলতে কী বোঝ? খিদিরপুরে বহু ছেলে মেয়ে গিয়ে পড়ে, নাম লিখতে পারে না। পল সায়েন্স পড়ছে যে মেয়ে, জিজ্ঞেস করো, 'লেনিন রাশিয়ার কে ছিলেন?—উত্তর দিতে পারবে না।

ট্রাডিশনাল চিকিৎসা ব্যবস্থা আগে যা ছিল তাই আছে। বরং এখন বেড়েছে। ঝাড়-ফুঁক, হেকিমী সব আছে। হাকিম সাহেবদের তিনটে দোকান হয়েছে। ডাক্ত(ারি কলকাতায় শু(হয় ১৮৩৫ সালে। লর্ড বেন্টিকের আমলে। Best medicine in the world is rest. সেই রেস্টটা দিতে পারলেই হল। মডার্ণ মেডিসিন এবং ট্রাডিশনাল মেডিসিনের সহাবস্থানটা চিরদিনই থাকবে।

১৯৬৪ সালে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে পুরো সিস্টেমটা পাল্টে গেল। এবার এটা ঠিকে মজদুরী সিস্টেম। তুমি কাজ করলে তুমি খাবে। না কাজ করলে খেতে পারবে না। আজকে দুটো strata—একটা বড়লোক, যারা ব্যবসাটাকে কন্ট্রোল করবে। আর নীচের লোক যারা ব্যবসায়ীকে বাঁচিয়ে রাখবে। শ্রমিকশ্রেণী, শ্রমিকরা শ্রমিকই রয়ে গেল। আমি কয়েকটা পরিবারকে জানি, যারা ওস্তাগরি করতে গিয়ে ফেল মেরে নিঃস্ব হয়ে আজ পরের দহলিজে কাজ করে। 'পরের দহলিজ'-এ মানে জন মজুরি। আর ওস্তাগরদের অবস্থা আর একটা জায়গায় গিয়ে কঠিন হয়ে গেল। কঠিন হয়ে গেল এই জন্য, '৬৪ থেকে ৭৪ দশবছরে এইটা চলল। ৭৪ এর পর থেকে আবার পরিবর্তন হয়ে গেল। আনুমানিক বলছি। সাধারণ যে কাপড় আগে কেটে দিত লোকে, সেইটা আর বাজারে চললো না। মার্কেটটাই চেঞ্জ হয়েগেল। এরা দেখল ভালা রে ভালা। কলকাতার বাজার ছেয়ে গেল বোম্বের কাপড়ে। এরাও ছুটতে লাগল বোম্বেতে, ওখান থেকে ডিজাইন নিয়ে এসে কাপড় বানিয়ে বিক্রি(করল, সেটা আরও সস্তা। ৫০০ টাকায় যেটা কিনে নিয়ে এল সেটা এরা ৩২৫ টাকায় হাটে বিক্রি(করল। বম্বেকে কলকাতার বাজারে এরা ঢুকতেই দিল না।

এর মধ্যেই জব্বার হাট করল। জব্বার হাট করতে লোকাল দর্জি যেটা ওখানে গিয়ে বিক্রি(করতে পারছিল না, সে এখানে বিক্রি(করল। রোববার দিন জব্বার হাটে দেখেছি, ১৬-১৭ বছরের ছেলে সাইকেলে করে গাঁটরী বেঁধে নিয়ে এখানে বিক্রি(করছে। এফিসিয়েন্টলি বিক্রি(করছে। জব্বার হাটে স্টল যাদের আছে, তাদের চেয়ে এদের সংখ্যা বেশি। এরা হল সেই মানুষ, যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাল বিক্রি(করে কাল আম্বানী হয়ে যাবে। বাবার সঙ্গে ব্যবসা করতে করতে বাবা বলল, 'তুই আলাদা কর'। আলাদা যেই করে দিল, সেই যে মাথা লাগাল। বড়ো ভাই যা পারছে না, ছোট ভাই সেটা করে দিচ্ছে। তিরিশ বছর বয়েসে মা(তি গাড়ি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড়ো ভাই পারছে না। এইটা খুলে গেল শুধু জব্বারের দৌলতে। তার আগে ছিল না। এইটা ৮০ অনওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট।

নেকস্ট টু ১৯৮৪, যেটা দেখা গেল, ডাইরেক্ট কমপিটিশন উইথ বোম্বে। ১৯৯০ অনওয়ার্ডস হল হল কেস্পোর্ট। একস্পোর্ট মাঝখানে মার খেল। সালেমের মার্কেট....। শাপে বর হল।

আজকে অল ইন্ডিয়া মার্কেটে ৬০ পারসেন্ট অফ দ্য রেডিমেড গার্মেন্টস সাপ-াইড বাই মেটিয়াব্রুজ। আমার অ্যামিউসমেন্ট ঠিক নাও হতে পারে। দিল্লী, বোম্বে, হায়দ্রাবাদ একস্পোর্ট করছে। কিন্তু লোকাল মার্কেট এদের হোল্ডে, তার কারণ সস্তা। সাধারণ ত্রে(তার জিনিস এরা বানাচ্ছে।

আজস ৫০ বছর শুনে আসছি, ত্র(াইসিস, ওটা বলে।

RECORDED INTERVIEW

কলকাতা বি(বিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের প্রধান ডঃ শামিম আনোয়ার। তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল তার চাঁদনি চকের চারতলার ফ্ল্যাটে বসে। শামিম আনোয়ারের সঙ্গে কথা বলছেন ফ(কুল ইসলাম, শান্তনু ভট্টচার্য্য, জিতেন নন্দী। চা খেতে খেতে শু(হল কথোপকথন, সময় সন্ধ্যা ৭.০০ টা ৮.৩.২০০৫।

....৫২ বই তখন লিখেছিলেন। তারপর এখানে এসে কিছু কাজ করেছেন উনি। নিশ্চয় আরো বই হবে। তিনি তো নিজেই উল্লেখ করেছেন ৫২ বই আমি লিখেছি। 'বাণী' বলে একটা বই আছে, তাতে লিখেছেন উনি।

—এটা কি উর্দূতে আছে?

—উর্দুতে আছে। পার্শিয়ানে অনেক বই আছে। পার্শিয়ানে বেশি বই লিখেছেন ধার্মিক। পার্শিয়ানে নাটক নেই। রাধা কানাইয়া নামে নাটকটা উনি লিখেছিলেন। উর্দূতে দুটো আছে। —রাধা কানাইয়া, আর ইন্দ্রসভা। ইন্দ্রসভা—আমানত বলে একটা লেখা ছিল, তা ইন্দ্রসভা আছে। ইন্দ্রসভা কন্ট্রোভার্সি আছে যে কে আগে লিখেছিলেন। ইন্দ্র আছে দেবরাজ, তার সভা। তখন তো

ওকে ড্রামা বলা যেত না। ড্রামা বলে ওটা হতো না। ওটা ছিল 'রাহাস'। তো ইন্দ্রসভা রাহাস আছে, রাধা কানাইয়া ওটাও রাহাস আছে। রাধা কানাইয়া স্টেজ হয়েছে অনেক বার। তারপর ইন্দ্রসভাও স্টেজ হয়েছে অনেকবার।

—কারা করেছে?

—তো এখানে নেই। ইন্দ্রসভা তো বাইরে লেখা হয়েছে। ...তো আমাদের যে ড্রামা লিটেরেচার পাওয়া যায় তাতে এই দুটো উল্লেখ করতেই হবে। রাধা কানাইয়া আর ইন্দ্রসভা। তো ইন্দ্রসভা স্টেজ হযেছে, রাধা কানাইয়া স্টেজ হয়েছে। রাধা কানাইয়া যে স্টেজ হয়েছে তাতে ডাইরেকশন উনি নিজেই দিতেন। কিন্তু কিছু রাইটার্স লিখেছেন যে উনি শুধু ডাইরেকশনই দিতেন না, পাটও করতেন। একটা ক্যারেকটার করতেন উনি। কিন্তু একটা কনট্রোভার্সি আছে। কিছু লোক বলতেন পার্ট উনি করতেন না, শুধু ডাইরেকশনই দিতেন। কিছু লোক বলতেন পাট করেছেন উনি, একটা ক্যারেকটার করেছেন।

—আমি আজকে একটা বই পড়লাম তাতে দেখলাম লেখা আছে, উনি পার্ট করেছেন।

—পার্ট করলেন না। তো উর্দূতে এটা কনট্রোভার্সি আছে। লাইটিং কি হবে, সেট কি হবে উনি ঠিক করতেন।

—একটা জায়গায় লেখা আছে উনি যোগীর পার্ট করতেন।

—লেখা আছে। তা ঠিক আছে। কিন্তু অনেকে রিফিউজ করেছে। যে না উনি পার্ট করেননি। রাধা কানাইয়ার যেটা আছে সেটা হিন্দু মিথলজির উপর আছে।

—আচ্ছা যে রাহাস কথাটা আছে, সেটা আমরা বাংলায় রাস বলি।

—আপনারা রাস বলেন, আমরা রাহাস বলি। বিগিনিং অফ ড্রামা—সেটাই হচ্ছে রাহাস। তারপর আছে রাসলীলা হ্যায় না। ....হুজনে আখতার উর্দুতে হয়েছে। ওটা রিপাবলিকেশন হয়েছে। এখন হয়েছে কিনা ওয়েস্টবেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ওটা প্রেসত্র(াইব করেছিলাম, হুজনে আখতার।

—ওটা কি ইংরাজিতে নাকি উর্দুতে?

—উর্দুতে আছে, ইংরেজিতে নেই ওটা। ট্রান(-সন হয়েছে ওটা।

—'সরোজ অফ আখতার'—খুব ছোট। তারপর নিজের লাইফ লিখলেন। ওটার নাম আছে পরিখানা। ....পরিখানা, নিজের বায়োগ্রাফি আছে ওটা।

—ওটা কি পাওয়া যায়?

—এখন আর পাওয়া যায় না।

—ওনার তো প্রচুর কবিতা আছে।

—হুঁ, প্রচুর কবিতা আছে(ডিমান্ড আছেও সবের। হুজনে আখতার ওটাও কবিতা আছে।

—বইটার নাম পরিখানা। তো বইটা যে লিখেছেন সেখানে নিজের লাইফটা শো করেছেন। যে ভাবে উনি ছিলেন, সেই ভাবেই বলেছিলেন। কোন মিথ্যা কথা বলেননি উনি। মানে সাত-আট বছর বয়স থেকে সেক্স আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। তাও বলেছেন উনি....প্যালেসে যে ঝিগুলো ছিল আয়াগুলো ছিল, তাদের সঙ্গে সেক্স করেছেন উনি। ওটাও উল্লেখ করেছেন উনি(তো লাইফে ভালো ক্যারেকটারটাও লিখেছেন ব্যাড ক্যারেকটারটাও উল্লেখ করেছেন। তো বহুত নামকরা বইটা। উনি ওখানে দেখিয়েছেন, মেহনত করেছেন। ইলাবরেট ডেসত্রি(পশন দিয়েছেন অনেকটা।

—নাইয়ার কাদার, উনি মাঝখানে লন্ডনে থেকে এসেছিলেন।

—উনার ছেলে আছে বিরজেস কাদার। বিরজেস কাদারের তিনটি ছেলে। নাইয়ার কাদার, ককব কাদার, আনজুম কাদার। অনজুম কাদার সব চাইতে বড় ছেলে। ট্রাষ্টি হয়েছেন ওখানে। উনার মারা যাবার পর ট্রাষ্টি হয়েছেন নাইয়ার কাদার। ককব কাদার ফ্যামিলি থেকে কেটে আলিগড়ে চলে গিয়েছিলেন। আলিগড় মুসলিম ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ছিলেন উনি। তো রিটায়ার করেছেন। রিটায়ার করে এখানে বাস করছেন। কলকাতাতেই আছে। ওনার কাছে অনেক বই আছে। ওয়াজেদ আলির লেখা অনেক বই আছে। কিন্তু কাউকে দেখাতে চান না। কাউকে দিতে চান না। একেবারে হাওয়া লাগতে দিচ্ছেন না উনি।

—উনি কোথায় থাকেন?

—উনি থাকেন রিপন স্ট্রীটে।

—কোন জায়গায়?

—রিপন স্ট্রীটে ট্রাঙ্গুলার পার্ক থেকে ঢুকলে সেন্ট মেরি স্কুল আছে। সেন্ট মেরি স্কুলের আগে ট্রাঙ্গুলার পার্ক থেকে যে ঢুকছেন না, একটা চলে গেছে লরেটো স্কুলের দিকে, একটা চলে গেছে তালতলার দিকে।

—ওই যে গ্যারেজের পাশ দিয়ে?

—হ্যাঁ, ওই লাইব্রেরির পাশ দিয়ে যে চওড়া রাস্তা আছে না। যাবার সময় বাঁ হাতে, একটু আগে গেলে যে বিল্ডিং আছে, খুব পুরোন বিল্ডিং আছে।

—যেগুলিকে কুঠিবাড়ি বলে?

—হ্যাঁ, সেই বিল্ডিং-এ থাকেন।

—বাড়িটা কি ওনাদেরই?

—ওনাদেরই, আমার মনে আছে। খুব পুরোন বাড়ি। আর রিপিয়ার কিছু হয়নি। চেহেরা দেখে বোঝা যাবে ওনাদেরই বাড়ি।

—বাড়ির তো কোন নাম নেই?

—না, নাম কিছু নেই। আর নাম হওয়ার তো কথাও ছিল না, কারণ উনি তো সারা জীবন আলিগড়েই কাটালেন। কিন্তু রিটায়ার করার পর এখানে এসেছেন।

—মেটিয়াব্রুজে থাকেননি?

—মেটিয়াব্রুজে থাকেননি। কিন্তু ওই লোকটা যতটা বেনিফিট দিতে পারতো তা দেয়নি। ওয়াজেদ আলি শা-র উপর কাজ করেছেন। আর্টিকেল লিখেছেন। বইও একটা লিখেছেন। আমাদের কাউকেই উনি দেননি। আলিগড় থেকে লিখেছেন। নামটাও আমরা জানিনা।

—আনজুম কাদার.....।

—আনজুম কাদার সাব খুব ভালো লোক ছিলেন। লোকের সঙ্গে মিশতেন। বই পড়তেন। খুব নলেজ ছিল উনার। হিস্ট্রির উপর খুব ভাল কমান্ড ছিল উনার। উনি মাই ডিয়ার লোক ছিলেন। যতটা মেটিয়াব্রুজে থাকতেন অনেকটা পোগ্রাম করেছেন।

—সমাজবাদি পার্টিতে থাকতে.....

—উনি কোন পার্টিতে যাননি। অনেক লোক বলে উনি সমাজবাদি পার্টিতে ছিলেন, কেউ বলে কমিউনিস্ট পার্টিতে ছিলেন, কেউ বলে কংগ্রেস পার্টি করেছেন। কিন্তু ডাইরেক্ট উনি কোন পার্টিতে যাননি। কিন্তু যে ভালো কাজ করতেন তার সঙ্গে থাকতেন। অনেক লিটারারি ওয়ার্ক করেছেন এখানে বসে। তারপর তো ওনার যে লাইব্রেরি আছে, সাওতালিবাদ ইমামবাড়ায় যে লাইব্রেরি ছিল, বাদশাহি লাইব্রেরি, তো লাইব্রেরি যখন ছিল তো আমি নাইয়ার কাদার শাহের সঙ্গে একদিন আলাপ হয়েছিল। আমি যখন কর্পোরেশনে থিলাম তখন গার্ডেনরীচ রোডটা বিরজেস কাদারের নামে করবেন বলে একটা পাবলিক মেমোরান্ডাম দিলেন। তো তখন আমি মিটিং-ফিটিং গুলো দেখতাম। মেমোরান্ডামগুলো আমি দেখতাম। তো আমি একটা এজেন্ডা করে দিয়ে দিলাম। কিন্তু রির্পোটটা পাশ হতে পারলো না(পাশ হয়নি।

—সাপোর্ট পায়নি?

—কোন সার্পোট পায়নি। তখন মান্নান সাহেবের বোর্ড ছিল। এখন তো গার্ডেনরীচ রোড চেঞ্জ করে নাম হল নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ রোড। ওই নামের কোন মানে ছিল না। নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ নাম দিলে পাশ হয়ে যেত। আনজুম কাদারের নাম হলেও হতো না। এরা ডিসপুট লোক(এখন হলেও হতে পারে। যখন বেঁচে ছিলেন তখন সেটা সম্ভব ছিল না। অসুবিধাটা ছিল। আমরা অনেক পোগ্রাম করেছিলাম আগে। তো সিকতানাবাদ ইমামবাড়ায় কোন লিটারারি ওয়ার্ক হতো না। শুধু মাতাম হতো। ওনাদের কমিউনিটির কাজ হতো। কিন্তু উনি এসে আমাদের জন্য দর্জাটা খুলে দিলেন, যে লিটারারি ওয়র্ক করি। আমি অনেক পোগ্রাম করেছি। আমাকে অনেক ভালোবাসতেন। তো আমি মনে করি ওনার সঙ্গে ভালো আলাপ ছিল। যে বলি ওই করি। একদিন এমনি বসেছিলাম আমারা, তো ২৫ তারিখ আছে, ২৫ শে ডিসেম্বর। তা আমরা বললাম যে নবাব সাব ২৫ ডিসেম্বর আছে, তো আমরা বড়দিন করবো না। তো বললেন, হুঁ, কেন করবো না। কিন্তু আমাদের ওখানে ওরকম করা উচিৎ নয়। বড় দিন কোন মুসলমানরা করে না। তো বসে বসে একদিন বললাম আমরা বড় দিন করবো না। তা বলল হ্যাঁ করবো, বড়দিন করবো, একটা গেদারিং করে দিন। তো আমরা গেদারিং করে দিয়েছি। ৩০-৩৫ জন এসে গেছে, তো ওনার পাত্তা নেই। কোথায় আপনি। উনি নিজেই কোথায় আছে কেউ জানিনা। আমরা অপে(া করলাম, তো আধঘন্টা পরে উনি এলেন। নামলেন উনি গাড়ি থেকে। তো এতবড় কেক নিয়ে এলেন তিনি নাহাম থেকে। তারপর কেক কাটা হল। আমরা সেলিব্রেট করলাম। তো উনার লাইফের কথা বললাম। তো খুব ভালো গেদারিং হলো। কোন কাজকেই উনি ছোট মনে করেননি। অন্য কেউ যদি খারাপ কাজ করে তাতেও কিছু এসে যায় না উনার।

—আচ্ছা এই ইমামবাড়ার পাশে আর একটা ইমামবাড়া আছে?

—এই ইমামবাড়ার পাশে আর একটা ইমামবাড়া আছে। ছোট ইমামবাড়া বলে। আগে একসঙ্গে ছিল পরে আলাদা হয়ে যায়।

দেখবেন ভিতরে একটা রাস্তা আছে। অন্য ট্রাস্টি হয়ে গেল। ওদের তো অনেক প্রপার্টি আছে। আস্তে আস্তে সব বদলে গেল। বাঙালি বাজার পুরো নবাব ওয়াজিদ আলি শার ছিল।

—বাঙালিবাজার দেখা যায় যে আঠেরোশো কতসালে সেটা স্থাপিত হয়।

—কিসের উপর?

—টুকরোপট্টির উপর।

—টুকরোপট্টি স্থাপিত হয়েছে। ওটা বহুত পুরোন। আগে ওস্তাগররা ছোট ছোট কাপড়ের টুকরো যে বের হতো না ও সব ওখানে নিয়ে এসে বিক্রি(করতো। এখনও তো হয়। বড় বড় কাপড়ের থেকে কাটা, যাকে ছাঁট বলে এখনো তো বিক্রি(হয়। এখানেও তো আছে, চাঁদনিতে। ....এখনতো বিরাট মার্কেট হয়ে গেছে। কাটপিসের সাথে ছোট ছোট টুকরো বিক্রি(হতো। খুব চিপ দামে বিক্রি(হচ্ছে। সেজন কলকাতা থেকে অনেকে যায় মাল ওখানেতে। হাওড়া থেকে আসে, বিরাট একটা মার্কেট হয়ে গেছে। কিন্তু আগে আরম্ভ হয়েছিল ওভাবেই। এখন দোকান হয়ে গেছে। সিমেন্টের উপর সব বসতো।

—আমরা ছোটবেলায় দেখেছি সিমেন্টের স্টল ছিলো।

—হ্যাঁ, স্টল ছিল। ঢালাই করা বড় বড় সব ছিল। তার উপর বসে সব বিক্রি(হতো। এখন ছোট ছোট দোকান বেরিয়ে গেছে। ওখানে রেখে তালা দিয়ে চলে যায়। তারপর তো রোববার সকলে ফুটপাতের উপর বসে। তো সেই জন্য ওর নাম হলো টুকরোপট্টি।

—ইমামবাড়ার ভিতর যে লাইব্রেরিটা ছিল সেটা কি এখনও আছে?

—কোন লাইব্রেরি?

—ইমামবাড়ার ভিতর যে লাইব্রেরি।

—ইমামবাড়ার ভিতরে একটা লাইব্রেরি ছিল। বাদশাহি লাইব্রেরি। এই যে সিবতেনাবাদবাদ ইমামবাড়ার ভিতর একটা লাইব্রেরি ছিল। ...নাইয়ার কাদার যখন এসেছিলেন লন্ডন থেকে কিছুদিনের জন্য তো আমার সঙ্গে ওনার আলাপ হয়ে গেল। তো অনেক কথাবার্তা হল। তো আমি ওনাকে বললাম যে আপনি আমাকে পার্মিশান দিন না যে আমি লাইব্রেরিটা ব্যবহার করবো। তো উনি আমাকে লিখেদিলেন, যে এই শামিম আনোয়ার যখন ইচ্ছা আসবে আর এখানে বসে যত(ন খুশি পড়াশোনা করবে। আমি ওনার লেটারটা নিয়ে আনজুম কাদার শাহকে দেখালাম। আনজুম কাদারকে আমি চিনতাম না আগে। আনজুম কাদার শাহ আমাকে বললেন যে, ঠিক আছে আপনি লাইব্রেরিতে গিয়ে বসুন। তখন লাইব্রেরিতে জানাশোনা আমার ছিল। 'খাঞ্জার'। তার ছেলেটা এখন ওখানে ম্যানেজার আছে। তার বাবা ছিলেন শাদিক হোসেন খাঞ্জার। উনি আমাকে হেল্প করলেন। লাইব্রেরিতে বসে গেলাম। তো অনেকটা বই দেখে আমি আনজুম কাদারকে বললাম, যে এখানে অনেক ভ্যালুয়েবল বই আছে। আর ওই বই গুলো সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অনেক বই আমি দেখলাম যেগুলো খোলা যায় না।...তা আমি বললাম যে এখানে কলকাতায় প্রসেস আছে আপনি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পাবেন। তো করতে পারেন। গ্যাস চেম্বার দিয়ে ওটা খুলবে, এভাবে খোলা যায় না এটা। উনি বললেন হ্যাঁ করবো, আপনি অ্যারেঞ্জ করে দিন। আমার হাতে পুরো রর করা ছিল, কিছু বই আমি খুলতে পারলাম না। ইংরেজি বই ছিল, পার্শিয়ান বই ছিল, আরবী বই ছিল, ধার্মিক বই বেশি ছিল। অনেকগুলি ম্যানস্ি(প্ট ছিল, হাতে লেখা, নিজের হাতে উনি লেখেন নি। কাউকে দিয়ে লিখিয়েছেন। খুব পরিস্কার করে লিখেছেন। একেবারে ছবির মতো। একটা মসনবি আদে হায়াতুল কুলু আর একটা আছে সায়াতুল কুলু। একেবারে ছবির মতো। গোল্ড ওয়াটার দিয়ে লিখা আছে। চারদিকে ডিজাইন করা, ফুল পাতা করা ওখানে ছিল। খুব সুন্দর। একটা পেজ যদি বিক্রি(করতে যান তো দুহাজার তিনহাজারের কমে বিক্রি(হবে না। আমি ওটা কাজ করেছিলাম। খাতা নিয়ে যেতাম, হাফ টুকেছিলাম। ওই মসনবিটা আমার কাছে ৫০ শতাংশ আছে। তারপর একদিন গায়েব হয়ে গেল। তা শুনলাম যে ককর কাদার এসেছিলেন, তিনি নিয়ে গেছে। তা আমি নাইয়ার কাদার আর আনজুম কাদারকে বলেছিলাম যে খুব দামি বই আছে ওটা। ওটা ভালো করে রাখুন। ভালো করে রাখবে কি বইটা গায়েব হয়ে গেল। আমার কাজটাও বাকি রয়ে গেল। চুরি হয়ে গেল নাকি বিক্রি(করে দিয়েছে আমি জানি না। ওসব বই পাবলিক ওয়ার্ক হয়নি।

—ওই বই কি নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ তৈরি করেছিলেন?

—হ্যাঁ, সব উনি করেছেন। লাইব্রেরির ভিতর যে আলমারিগুলো আছে না ওসব নবাবের আমলের। খুব ভাল আলমারি।

—কত বই হবে?

—আমার ধারণা সাতশো/আটশো বই হবে।.....অনেকটা বই আমি খুলতে পারলাম না, ওসব ধার্মিক বই ছিল। একটা বই....একটা আলমারি তো আমাকে খুলতে দিল না, বলল ওটা আপনি দেখবেন না। কোন কনট্রোভার্সি আছে।

—এই সাতশো/আটশো বই এর মধ্যে এখানে আসার পর লেখা কত?

—এখানে আসার পর কিছু বই লিখেছিলেন কিন্তু বেশির ভাগটা লিখেছেন লন্ডনে থাকতে। ওনার যে বানি বইটা বের হলো না ওখানে উনি ৫২ বই এর উল্লেখ করেছেন। উনি নাম দিয়ে লিখেছেন যে এত বই আমি লিখেছি। আপ টু দি মার্ক। তারপর কি হয়েছে জানা যায়নি।

—'বানি' কি এখানে হয়েছে?

—না ওটা ওখানে হয়েছে।

—'বানি' লিখেছেন কোথায়?

—ওখানে লিখেছেন।

—তারপর তো আরো হয়েছে?

—অনেক হয়েছে। তারপর তো বসে বসে কাজ করেছেন। তা কাজগুলো গেল কোথায়!

—আচ্ছা 'হুজনে আখতার'

—আমি একটা ছেলেকে দিয়ে রিসার্চ করাচ্ছি যে তুমি খুঁজে খুঁজে বের করো কোথায় কোথায় বই আছে। এখানে বসে কত বই লিখেছেন তুমি হিসাব করে বের করো। কোন কোন বই লিখেছেন। একানে ওনার প্রেস ছিল। ছাপাখানা ছিল। সব ফেসিলিটি এখানে ছিল। বই ছাপানো হয়েছে, নিশ্চয় হয়েছে। কি হয়েছে, বইগুলো কোথায় গেল ওটা জানার।

—'হুজনে আখতার' তো জেলখানায় লেখা।

—ওটা পুরো লাইফ আছে। ওখানে আমি কিভাবে ছিলাম। তারপর এখানে এলাম, আমার উপর কিরকম অত্যাচার হয়েছে। কোথায় এসেছি, কবে এসেছি, আমাকে কি কি প্রব্লেম ফেস করতে হয়েছে, তারপর এখান থেকে শু(করে আমি কোথায় গেলাম, পুরো লেখা আছে.....কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিল।

—ওটা কবিতার লেখা!

—পুরো কবিতার লেখা। ওটা আপনার হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনে প্রেসত্র(াইব করা আছে। তারপর বি. এ. পাশ কোর্সে আছে।

—ওটার পাবলিশার্স কে?

—ওট ঠিক এখন বলতে পারবো না।

—ওটা মার্কেটে পাওয়া যায় তো!

—মার্কেটে পাওয়া যায়। আমার কাছে আছে। অনেকটা বই আমার দেখা আছে। হুজনে আখতার, পরিখানা আমার দেখা আছে, কলামে আখতার আমার দেখা আছে। ওতে গজল আছে। তারপর বানি আমি দেখেছি। বানি মিউজিকের উপর পুরো বই আছে। এক একটা ভাও কি ভাবে হয়। কোথায় লাগে সব লেখা আছে। ওটা টেকনিক্যাল বই আছে, ওরকম বই পাওয়া যায় না। ওই রকমই আছে যা বাংলা কালচারে আছে। তারপর আপনাকে বললাম না হায়াতুল কুলু—ওসব ধার্মিক বই আছে।

—আচ্ছা পরিখানা যেটা বললেন ওনার যারা বাঈজি ছিলেন তাদের পরি বলা হত!

—না, ইন্দ্রসভা যদি আপনি দেখেন তবে সেই যে নর্তকি। না নর্তকি না....নর্তকি তো মানুষ হয়ে যাচ্ছে.....অপ্সরা, হ্যাঁ হ্যাঁ অপ্সরা...ঠিক অপ্সরা, পরি মানে অপ্সরা।

—আমি আজকে একটা বইতে দেখলাম যারা নাচগান করে তারা হলেন পরি, যারা স্ত্রী হলেন পরে তারা হলেন বেগম আর যারা সন্তানের মা হলেন তারা হলেন মহল।

—উনি নিজেই বলেছেন যে আমি ৩৬৫ টা বিয়ে করেছি। উখানে কায়দাটা আলাদা আছে। ওদের কমিউনিটিতে একসঙ্গে চারটি বিবি রাখতে পারবেন। তার বেশি রাখতে পারবেন না। একটা মরে গেলে আবার একটা বিয়ে করতে পারেন। কিন্তু ওখানে একটা কায়দা আছে 'মোতাহি' বলে। মানে কিছুদিনের জন্য একজনকে কন্ট্রাক করে ওরা বিয়ে করেছে। ওটা রেজিস্টার্ড হয়েছে। কিন্তু মতাহি বিবি যে সে প্রপার্টিতে শেয়ার পাবে না। কিন্তু যাদের ম্যারেজ সিরমনি হয়েছে তারা প্রপার্টিতে শেয়ার পাবে। তা তিনিই নিজেই উল্লেখ করেছেন ৩৬৫ টি বিবি। মুতাহি বিবি নিয়ে। আর একটা কথা শুনুন, অনেকে বলে যে উনি সেক্সের জন্য এত মহিলাকে রেখেছিলেন মহলে কিন্তু কিন্তু পরে পরে অনেকে উল্লেখ করলো যে অনেক আছে ৬৫/৬৮ বছর বয়স। অনেক ছেলে আছে, দেখতেও ভালো নেই, তাকেও উনি রেখেছিলেন যে গরীব মানুষ এটা করলে একটা শেলটার পাবেন। তাই মোতাহ করে রেখেছেন। কিন্তু কোনদিন তার কাছে যাননি। ভালো ফ্যামিলির মেয়ে, বরবাদ হয়ে যাবে। তাই মোতাহ করে নিজের কাছে রেখেছিলেন। অনেক হিস্ট্রি আছে যে অনেকের চেহারাও উনি দেখেননি যে মোতাহ করেছেন। ৩৬৫ টা বেগম যে আছে তার মধ্যে ১০০ টার বেশি বেগমের উনি চেহারাও দেখেননি।

—আচ্ছা এই যে খবরটা এটা তো ইংরেজরাই চালাতো?

—ইংরেজরা একটা পেনশন দিত। পেনশন একটা ছিল। একনও এর ফ্যামিলির মেম্বাররা ওই পেনশনটা পাচ্ছে। ২৫ টাকা, ১০ টাকা, ১৫ টাকা হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও অবধি লোকগুলো পাচ্ছে। আমার থেকে আটাসটেট করে নিয়ে যায়, এখনও আছে অনেকে। তো ওনার সময় তো জিনিসপত্র সস্তা ছিল। যে টাকা পেতেন তাতে ভালো ভাবে উনি ম্যানেজ করে নিতেন। এখানে অত ঘর বাড়ি করলেন সে সব টাকা উনি উখান থেকে নিয়ে এসেছিলেন। ওখান থেকে অনেক টাকা পয়সা পাঠাতো। এখানে ওনার সঙ্গে দুটো লেখক এসেছিলেন, একটা আপনার আবদুল হালিম শরর, সে এখানে ৫০ শতাংশ বই লিখেছেন। 'গুলিস্থা লখ্নৌ' অর 'মেটিয়াবু(জ' বই লিখেছেন। তারপর উনার সঙ্গে আর একজন এসেছিলেন নাজুম তব তবাই, ওনাকে

এনেছিলেন টিচার হিসাবে। তারপর শাহাজাদাদের বাচ্চাদের পড়াবার জন্য উনি এনেছিলেন। তো নাজুম তব তবাই বললেন যে আমাকে একটা জায়গা দিন আমি একটা মাদ্রাসা খুলবো, তো উনি ইমামবাড়া তে একটা মাদ্রাসা খুলেছিলেন। সেই ট্রাডিশনটা এখনও চলে আসছে। কিন্তু খলেছিলেন ওটা নাজুম তব তবাই।

ওখানে বাদশাহের ছেলেদের নিয়ে আর বাকি যেসব বড় লোকের ছেলেরা ছিল তাদের নিয়ে পড়াতেন। তারপর হায়দ্রাবাদ চলে গেলেন। ওখানে ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর হয়েছিলেন। খুব নাম করা।

—আচ্ছা 'গুলিস্থা লখ্নৌ' আর 'মেটিয়াবু(জ' বই দুটো পাওয়া যায়?

—হ্যাঁ, পাওয়া যায়।

—আচ্ছা 'গুলিস্থা লখ্নৌ' যেটা সেটা কি লখ্নৌতে উনি যে মনুমেন্টগুলো বানিয়েছিলেন তার উপর?

—না, ওটাতো আলাদা আছে।

—মেটিয়াবু(জ বইটা আপনি দেখেছেন?

—বই একটাই আছে 'গুলিস্থা লখ্নৌ', ওর মধ্যে একটা চ্যাপ্টার আছে 'মেটিয়াবু(জ'। আলাদা বই নেই। ওই বই আপনি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পাবেন।

—মেটিয়াব্রুজে কি আছে?

—অনেক বড় আছে ওটা অনেক লিখেছেন। 'গুলিস্থা লখ্নৌ' যদি পান দেখবেন, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে।

—এবার আমরা অন্য একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। আপনার যে ঠাকুরদা এসেছিলেন ওনার বাড়ি কোথায় ছিল?

—উনি এসেছিলেন বিহার থেকে। শেখতিয়ারপুর থেকে, বখতিয়ার পুর দিয়ে যাওয়া যায়। বিহারে আছে, আমি কোন দিন যাইনি। ঠাকুরদা এসেছিলেন ওখান থেকে। ভায়া বখতিয়ারপুর বলে একটা জায়গা আছে, যাকে শেখতিয়ারপুর বলা যায়। ওখানে আমাদের অনেকটা প্রপার্টি ছিল। ঠাকুরদা ছোটবেলায় বলতেন, আমি দেখিনি। উনি বলতেন যে ওখানে অনেক প্রপার্টি ছেড়ে চলে এসেছি।

—উনি এসেছিলেন কেন! কি জন্য এসেছিলেন?

—ফ্যামিলি ডিসপুটের জন্য উনি ওখান থেকে চলে এসেছিলেন। উনি খুব ভাল কবিরাজ ছিলেন। একটু বেশি বয়েসেই উনি এসেছিলেন। যাকে বলে হাকিম। তো তখন তো জমি সস্তায় পাওয়া যেত। এখানে একটা প্রপার্টি উনি ভাগে কিনলেন। এখানে এসে কাঁচ সড়কের কাছে একটা জমি কিনলেন, নিজের জন্য একটা ডিসপেনসারি খুললেন। 'আখতারখানা' যাকে বলে। হাকিমের দোকান করলেন, দেখবেন ওখানে শাহি দাওয়াখান। এখনও আছে আমার চাচা বসে। ওখানে একটা ফার্ণিচারের দোকান আছে। ওই ডিসপেনসারি অনেকদিন ধরে চালিয়েছেন।

—আপনার বাবা?

—আমার বাবা মেডিকেল ছিলেন। তখন তো এম. বি. বি. এস ছিল না ছিল এল. এম. এফ.। উনি ওখানে প্র্যাক্টিস করেছেন। দেখবেন ওর পাশে একটা বিউটি স্টোর আছে না, ওটা আমি করেছি। আমার বাবা মারা যাবার পর আমি বিউটি কর্ণার করেছি। উনি অনেক পুঁথে লিখেছেন। একেকটা রোগের উপর বই লিখেছেন। দুটো আমি পাইনি। আমার ছোটবেলায় লিখেছিলেন। আমার ঠাকুরদা এখানে বাস করেছেন এবং রেসপেক্টেবল ফ্যামিলি। হাজি গফুর খান খুব নাম করা লোক ছিল, ঠাকুরদা। উনি কয়েকটা মসজিদ করেছেন, ওখানে একটা মসজিদ আছে না ধানু(তি মসজিদ, ওখানে নামাজ পড়তেন উনি। ওখানে ওনার অনেক কন্ট্রিবিউশান আছে ওনার। আঠাশ নম্বরের আগে কোন মসজিদ ছিল না। তো পোর্ট ট্রাষ্টে অনেক মুসলমান কাজ করতো। তো পোর্ট ট্রাষ্টকে লিখে একটা জায়গা উনি বের করে নেন। মুসলমানদের নামাজ পড়ার কোন মসজিদ ছিল না। ন নম্বরে যে মসজিদটা উনি করেছেন টাকা পয়সা জোগাড় করে, আমার কাকা আছে, ওরা সব ম্যানেজ করে।

—এখানে যে উর্দুভাষীরা এসেছে বেশি সংখ্যায় তারা কি কলকারখানার জন্য এসেছে, নাকি ওয়াজেদ আলির জন্য এসেছে?

—আমার ধারণা ওয়াজেদ আলির আসার আগে এখানে লোক ছিল কিছু। জঙ্গল ছিল কিছু জমি ছিল। তো ব্যবসা কিছু হতো। লোক গুলো ছিল এখানে, কিন্তু ওর উপর ভাল করে কাজ হলো না। কিন্তু ছিল আগে, বুঝতে পারছেন, লোক ওখানে বাস করতো। কত লোক নিয়ে আসবেন। হানড্রেড টু হানড্রেড লোক নিয়ে আসুন।

—কেউ কেউ বলে ৩০,০০০ লোক নিয়ে এসেছিলেন।

—আমার তো মনে হয় না। ওয়াজেদ আলির সঙ্গে তো বেশি লোক আসেনি। উনি তো সোজা এখানে আসেননি। প্রথমে ফোর্ট উইলিয়াম, সেখান থেকে মেটিয়াব্রুজ তারপর আবার ফোর্ট উইলিয়াম সেখান থেকে নমক মহল....।

—নমক মহল কোনটা.....

—বি. এন. আর.-এ যে রেলের অফিসটা।

—ওটা তো বর্ধমানের মহারাজার বাড়ি ছিল।

—ওখানে থাকতেন আগে। তারপরে মেটিয়াব্রুজে এসেছিল। আর লোকগুলো সব জড়ো হয়েছে। ধোবি আছে দর্জি আছে, ঝি আছে। এরকম যেমন দরকার লোক নিয়েছেন উনি। আস্তে আস্তে সব লোক আনিয়েছেন, একসঙ্গে সবাইকে নিয়ে আসেননি। আর শুধু মুসলমান আসেনি, হিন্দুও এসেছে ওনার সঙ্গে। এই যে পান্না পানওয়ালা, মতি পানওয়ালা, এখন মারা গেছেন। ওরা সব ওখান থেকে এসেছিলেন। তারা সব হিন্দু। পান খেতেন বলে পান খাবার জন্য লোক নিয়ে এসেছিলেন। যত সব শখ ছিল ওনার সব তিনি যোগাড় করেছিলেন।

—এই ইমামবাড়াটা কবে নাগাদ তৈরি হয়েছিল?

—ওর উপর লেখা আছে।

—এটা কি উনি বানিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ উনি বানিয়েছিলেন, এই যে সিকতানাবাদ। এটা ওনার স্ত্রীর নাম আছে।

—উনি কোথায় থাকতেন, যখন ওটা তৈরি হয়?

—উনি থাকতেন ওই ইস্পাহানি জুটমিল আছে না, ইমামবাড়ায় থাকতেন না উনি, মারা যাবার পর এখানে কবর হয়েছে। কাচি সড়কের কাছে আয়রন গেট, এখন অনেকটা হিন্দুস্থান লিভারের গোডাউন হয়ে গেছে। খুব বড় জুট মিল ছিল। অনেক লোক কাজ করতো। আমি দেখিনি। আমি যখন একটু একটু করে জানতে পারলাম তখন ওখানে চটকল ছিল, চট হতো। শাদিদ্দুলা শাহি ওখানকার লিডার ছিল। চটকল মজদুরদের লিডার ছিল। এটা বলছি কেন ওখানে আগে ময়লা হাতে করে নিয়ে আসা হতো তো তখন মিটিং হয়েছিল তখন ময়লাগুলো এনে ফেলা হয়েছিল। ও বহুত খারাপ লোক। কিন্তু তখন ট্রেড ইউনিয়ন করতো। শুধু প্যালেস নয়, ওখানে ওনার চিড়িয়াখানা ছিল। এখন প্যালেস নেই, জু-টা গঙ্গার ধারে ছিল।

—শাহি মহল যে রেস্টুরেন্ট করেছে....

—ওর সঙ্গে কোন মিল নেই....তার আগে শাহিমহলের বিল্ডিংটা যেখানে শেষ হচ্ছে। আয়রন গেটের দিক থেকে একটা গেট ছিল। আয়রন গেটের ভিতর একটা মসজিদ আছে। ওটা ওয়াজেদ আলির মসজিদ আছে। আয়রন গেট দিয়ে ঢোকার রাস্তা আছে। ওখানে নামাজ হয়। মাঝে মধ্যে....যে নারসিং হোম আছে তার একটু আগে গিয়ে বাঁদিকে। খুব বড় মসজিদ আছে। আমবানি জুট মিলের বাউন্ডারির মধ্যে আছে। ইস্পাহানি জুট মিলটা যখন হলো না তখন মসজিদটা উনি আলাদা করে দিয়ে দিয়েছিলেন।....হিন্দুস্তান লিভার ফ্যাকটরির পাশে...আপনার মনে আছে আগে আমাদের বাস ন নাম্বার দিয়ে একদম সোজা চলে যেত। যখন হিন্দুস্থান লিভার হলো না তখন ্ই রাস্তাটা বন্ধ করে দিল। ধর্মতলা আসতে ১০ মিনিট লাগতো হিন্দুস্থান লিভারের তিন নম্বর গেট দিয়ে ভূতঘাট হয়ে চলে আসতো। আর বলি শুনুন, হিন্দুস্থান লিভার অনেক ছোট ফ্যকটরি ছিল। তার পিছনে অনেক জায়গা ছিল। তার পশ্চিম দিকেও ানেক জায়গা ছিল। ওখানে অনেক ঘর করা ছিল। একটা বড় ট্যাঙ্ক করা ছিল, তার উপর একটা বসবার জায়গা করা ছিল ছাতা মতো, ঢালাই করা। চারদিকে গার্ডেন ছিল আর বিরাট বড় বড় গাছ পোঁতা ছিল। ইভিনিং-এ এসে বসতেন। অনেক সুন্দর গার্ডেন ছিল। আমি দেখেছি। হিন্দুস্থান লিভার টুকরো টুকরো করে নিয়েছে। একেবারে নেয়নি। ওনার আমির স্বজন যারা মারা গেছে তাদের সব কবর আছে ওখানে। ৭০ শতাংশ কবর ওরা নিয়ে নিয়েছে, ২০ শতাংশ ছেড়ে দিয়েছে। ছোটবেলায় দেখেছি, যাকে বলে তালাব, ওখানে মাছ ধরতে দেখেছি। বহুত ডিপ আছে। আমাদের বলত সাত কুয়োর মতো ডিপ আছে। যে ডুবে যাবে তার আর লাশ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

—এর সঙ্গে গঙ্গার কানেকশন ছিল?

—গঙ্গার সঙ্গে কোন কানেকশন ছিল না। গঙ্গা অনেকটা দূরে আছে। ওখান থেকে ন নাম্বার পোর্ট ট্রাস্টের যত জমি ছিল সব ওদের।

—ওয়াজেদ আলি আসার আগে ওখানকার যারা লোক ছিল, আমরা বিভিন্ন উপন্যাসে দেখলাম তা হলে তারা ছিল চাষী। কৃষিজীবি...তাদের মধ্যেই একটা সেকশন দর্জির কাজ করতো।

—লোকগুলো ওখানে বাস করতো। জঙ্গল ছিল, সুন্দরবনের এলাকা ছিল। তো (ে তিবাড়ি করতো, কালটিভেশন করতো। তো নিজের খাবার জন্য কিংবা বিক্রি(র জন্য। তো করেছে। তো ওখানে পপুলেশন ছিল। কিন্তু উর্দু স্পিকিং মুসলমান ছিল কি ছিল না বলা যায় না। আর একটা ইতিহাস খুঁজতে হবেযে ওস্তাগাররা কোথা থেকে আসছে। অরিজিনাল কোথায় ছিল তারা। ওরা হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছে নাকি আগে থেকে ওখানে ছিল....।

—হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছে অনেকেই বলে। কারণ অনেকেই বলে যে আমাদের পূর্ব পু(ষ হিন্দু ছিল।

—আমি দেখেছি যে ধাওয়া পাড়ায় আপনি ঢুকবেন তো কবর পাওয়া যাবে। ওখানে বাড়ি বাড়ি কবর আছে। আমাদের ইসলামে কবর দেওয়া হবে কিন্তু হিন্দুদের কিছু কমিউনিটি আছে যেখানে কবর দেওয়া হয়। কয়েকটা কাস্ট আছে। কবর দেখেও আমি বলতে পারবো না কি মুসলমান আছে।

—আমাদের মধ্যে বৈষ(বদের। নাথ, তাদের কবর দেওয়া হয়। নাথ আছে সাউ আছে। এখনও পর্যন্ত ইন্ডিয়াতে আছে। যারা

বডি পোড়ায় না। আর আমাদের মুসলিমদের মধ্যে আছে কবর দিতেই হবে। ওখানে অনেক বাগানবাড়ি ছিল। একটু পয়সাওয়ালা লোক তো বাগানবাড়ি হবেই। বাগানের মধ্যেই কবর হবে। তিন চারটে জায়াগায় এখনও পর্যন্ত আছে। তো হিন্দুর কবর নাকি মুসলমানের কবর। ....তো আমার মনে হয় কনভার্ট করেছে। কিন্তু ওখানে পপুলেশন ছিল। অনেক আগে থেকে ছিল। কিন্তু ওরা সিভিলাইজড হতে পারলো না। ওরা কিভাবে থাকতো নাকি জংলি মতোন বাস করতো। তারপর এখন পপুলেশন বেড়েছে। ওয়াজেদ আলি শাহ অনেক পরে এসেছিল।

....পুরনো ওস্তাগারদের জিজ্ঞাসা করবেন বেশিরভাগ মাল যেত রেঙ্গুন। শুধু রেঙ্গুনে কাজ করতো না। ওখান থেকে প্রোডাক্ট করে রেঙ্গুনে সাপ-াই দিচ্ছে। আমার গাড়ি আছে আমি লোক রেখেছি লোক য়েত, ওখান থেকে লোক আসতো। এখান থেকে কারিগর যেত। ওখানে বসে ওরা রেডিমেড গার্মেন্ট তৈরি করতো। এখন তো বিরাট মার্কেট হয়ে গেছে, বিরাট কারবার হয়ে গেছে। তিনটে সেন্ট্রো কার

বুকিং হয়েছিল প্রথম ওয়েস্ট বেঙ্গলে। আর তিনটেই গার্ডেনরীচে। তো চিন্তা করে দেখুন। একটা মার্ক করার মতো ব্যাপার।

—আমি বলছি যে উর্দুভাষীরা প্রথমদিকে কি প্রফেশনে ছিল?

—কলকারখানায় কাজ করতো, ব্যবসা ছিল না। একটা তো ছিল ইস্পাহানি জুটমিল। রাজাবাগানে সি. আই. ডব্লিউ. টি. সি. আর কেশোরাম।

—রাজাবাগানে একটা জুট মিলও ছিল।

—রাজাবাগানে একটা জুট মিল ছিলো, রাইস জুট মিল। ওখানে রেললাইন ছিল। আগে রেল চলতো। মাল লোডিং হত। ওখানে যারা কাজ করতো...ওখানে তো ওত লোক ছিল না, বাইরে থেকে লোক আসত। আসা যাওয়ার প্রব্লেম হচ্ছিল বলে বাড়ি করে নিয়েছে, ফ্যামিলি রেখেছে। অনেক উর্দুভাষী ছিল। ওয়াজেদ আলির জন্য কিছু আসলো, কিছু বেশি এলো কলকারখানার জন্য। এখন তো মুসলমানদের রেশিওটা কমে গেছে। আগে এল. মি. কোম্পানি ছিল, এসবেস্টর সিমেন্ট কোম্পানি ছিল। জি. ই. সি. কোম্পানি ছিল। তার আগে ফাঁকা ছিল, বেশি লোকে যেত না। এখন যায়। এই যে ল্যাম্প ফ্যাকটরি, হিন্দস্থান লিভার এসব কোম্পানিতে বহু লোক কাজ করতে তারা কোথা থেকে এসেছে। মুসলমানরা বেশি কাজ করতো। জমি জায়গা সস্তা ছিল ওরা এভাবে ওখানে বাড়ি করে নিয়েছে।

—শুনেছি হিন্দুস্থান লিভার প্রথমে কোন ফ্যাকটরি ছিল না। বাইরে থেকে তৈরি করে এখানে.....।

—একথা আমাকে একজন বলেছে। কিন্তু আমি এটা মানি না। হয়তো বড় ব্যান্ড কিছু করতো না। কিন্তু কাজ কিছু হতো। ওয়ের হাউস করেছিল। কিন্তু ফ্যাকটরি একটা ছিল।

—বাঙালি মুসলিমদের আপনি ছোটবেলায় কি করতে দেখেছেন?

—শুধু দর্জির কাজ দেখেছি। আর কোন কাজ দেখিনি। পড়াশোনা করলো না। একজন আট ক্লাশ পাশ ছিল, তো আমরা বলতাম যে ভাল ফ্যামিলি আছে। আপনি নাম শুনেছেন যে আদ্যনাথ পাল। তার একটা ছোট মেডিকেল হল আছে এখানে, খিদিরপুর ব্রীজের দিকে। দেখবেন আদ্যনাথ পাল, ডঃ রফকার ছিল, কমলটকির গায়ে একজন ডাক্ত(ার ছিল। ডাক্ত(ার হাননানের আত্মীয় ছিল। এরকম ভাল লোক ছিলেন....আপনি যদি রিসার্চ করে দেখেন তো দেখবেন যে এরা ওখানকার লোক ছিল না। বাইরে থেকে এসেছিলেন। ডঃ হাননান বলুন, ডাঃ আদ্যনাথ পাল বলুন, ডাঃ রফকার বলুন, আমার ঠাকুরদা বলুন এরা সব বাইরের। এইভাবে ওখানে পপুলেশন বেড়েছে। ডাক্ত(ারের দরকার হল, হাকিমের দরকার হল, যে জিনিসের দরকার হল....মহম্মদ খাঁ পুরনো লোক। মহম্মদ খাঁয়ের নাম ভুলে গিয়েছিলাম।

—আমার ঠাকুরদা ওখানকার লোক উনি বাইরে থেকে এসেছিলেন, আত্র(া থেকে।

—ওর ঠাকুরদাও ডাক্ত(ার ছিলেন, সেই থেকে পাড়াটার নাম হয়ে যায় ডাক্ত(ারপাড়া।

—হৃষিকেশ পাল ডাক্ত(ার ছিলেন। তার বাবাও ডাক্ত(ার ছিলেন। এরা সব পুরনো লোক। বদরতলা....

—প্রথমে যে বাংলা হরফ তৈরি করেছিলেন তিনিও নাকি মেটিয়াব্রুজের লোক। পঞ্চানন কর্মকার।

—তা আমি বলতে পারবো না।

—পরি সিনেমা যেটা সেটা প্যারি সাহেব।

—প্যারিসন ... ছিলেন পিসন সিনেমার। প্যায়েরা সন, মানে প্যায়েরি সাহেবের ছেলে। প্যায়েরি সাব খুব ভাল গান করতেন,খুব ভাল ডান্সার ছিলেন।

—উনি কি ওয়াদেজ আলি শার সঙ্গে এসেছিলেন?

—ওয়াজেদ আলি শার সঙ্গে আসেননি, পরে এসেছিলেন। খুব ভাল ডান্স করতেন। ওনার আওয়াজটা আপনি শুনবেন, যদি অন্য ঘর থেকে শোনেন তো আপনি বুঝতে পারবেন না কি পু(ষ নাকি মহিলার গলা, বহুত স(গলা। অনেকদিন আগের কথা, প্যায়েরি সাহেবকে আমি মেটিয়াব্রুজে দেখেছি। আমার জন্ম হয়েছে দেখুন ১৯৪৮ এ। তো ৫৬-৫৭ তো দেখেছি খুব বুড়ো হয়ে

গিয়েছিলেন। পিসন সিনেমার ভিতর প্যায়েরি সাহেবের বাড়ি ছিল। তো উনি ওখানে থাকতেন না। সিনামাতেই একটা (ম করে রেখে ছিলেন উনি। ওখানেই থাকবেন। মহম্মদ বলে একটা ডাঁয় হাত ছিল। মানে সব কাজ করার লোক ছিল। ওনার আত্মীয় ছিল নাকি চাকর ছিল তা আমি জানি না। কিন্তু ওনাকে প্রচুর সাপোর্ট করেছিলেন। আমরা তখন ছোট ছিলাম, সিনেমা দেখবার জন্য আসতাম তো প্যায়েরি সাহেব আসতেন, হাঁটতে পারতেন না কিন্তু আসতেন, বলতেন এই লাইন দিয়ে দাঁড়াও।

—তখন সিনেমা হলটা কেমন ছিল?

—সিনেমা হল—সেটা আমার ঠিক মনে নেই। সিনেমা যা দেখেছি তা এখনকার মতো নয়। তখন সাইলেন্ট ছবি ছিল। আর প্যায়েরি সাহেব লোক রেখেছিলেন। তিনি কমেন্ট্রি করতেন। সিনের সামনে দাঁড়িয়ে নাহলে বসে না হলে কোন অ্যাকশন করে ও কমেন্টিরি দিত। হলটা টালি অ্যাসবেস্টস দেওয়া ছিল। অ্যাসবেস্টস টিন তখন থেকে দেওয়া আছে।

—প্যায়েরে সাহেবের কি প্রোগ্রাম হত?

—হত। শুধু এখানে নয় উনি বাইরে বাইরে যেতেন। মেটিয়াব্রুজে হতো না। আমি শুনিনি। অল ইন্ডিয়া বেড়িয়ে প্রোগ্রাম করতেন।

খেয়াল, ঠুংরী, দাদরা, ডান্স খুব ভালো জানতেন। পায়ে ঘুঙ(বেঁধে উনি ডান্সকরতেন। আমি দেখিনি। শুনেছি। ওনার একটা ছেলে ছিল আমি দেখেছি জনি সাব বলে। আমি তো ওখানেই থাকতাম তো জনি সাব চলাফেরা করতে পারতেন না। উনাকে চেয়ারে বসিয়ে রডে বেঁধে পিসন সিনেমা হলে নিয়ে আসতো তারপর বাড়ি দিয়ে যেত। ঘুড়ি ওড়ানোতে ওনার খুব নাম ছিল। ঘুড়ির প্যাঁচ লড়তেন। ঘুড়ির মধ্যে একশোটাকার নোট বেঁধে উনি উড়াতেন।

—ঘুড়ি ওড়ানটা কি নবাবের সময় থেকে এসেছে।

—হ্যাঁ, লখ্নৌ থেকে এসেছে। আগে ছিল না।

—ঘুড়ি বানানোটা?

—ওখানেই। কারিগররা সব এসেছিল। সবটাই ওখান থেকে এসেছে। তবে আমি ছোটবেলায় দেখেছি বাড়িতে মেয়েরা ঘুড়ি বানাচ্ছে। কাঁপ ছিঁড়ছে....কাগজ কাটা, লেই মারা, তারপর সাইডে সুতো দিয়ে ঘেরা। তা নাহলে ছিঁড়ে যাবে....সব হতো। তারপর কড়ি দিয়ে ঘুড়ির কাগজের উপর লাইন করতো ডিজাইন করবার জন্য। এখন তো আর তা হয়না। এসব মেয়েরা করতো বাড়িতে বাড়িতে। বিচালিঘাটে, আয়রন গেটে। ইমামবাড়ার পিছনে এসব হতো। কামানি ছিলতো। ওখানে এখন আঠাশ নম্বর হয়, আর কোথায় হয় না।

—জনি সাবকে আপনি কত বয়েসে দেখেছেন?

—৫৬, ৫০ এর বেশি, তখনও ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন। পিসন সিনেমার পাশে বড়ময়দান ছিল। এখন তো বাড়ি হয়ে গেছে।

—তখন ওখানে একটাই হল ছিল?

—একটাই ছিল পিসন, তারপর করল কমল টকি, আগে ছিল কমল টকিজ। কামালউদ্দিন না কার। তারপর এরা কিনলো। ওরা করলো কমল টকিজ। হিন্দু নাম হয়ে গেল। পিসন সবচেয়ে পুরনো। তারপর কমল টকীজ, তারপর পরি সিনেমা, না ভুল বললাম সব চেয়ে আগে পিসন, তারপর খাতুনমহল, তারপর কমল টকীজ, তারপর পরি তারপর শৈলশ্রী...পরি সিনেমা যেদিন আরম্ভ হয় সেদিন টিকিট লাগেনি।

—তবে পানওয়ালা অনেক পুরনো। আমার ঠাকুরদা ওয়াজেদ আলি শা দিয়েছিলেন, পান ভালো লেগেছিল, কোন বড় আর্টিস্টের আঁকা, ওতে নাম ছিল কি ছিল না আমি জানি না। যে পান খেতে আসতো সেই দেখতো। তো বলতো ওয়াজেদ আলি শা আমার ঠাকুরদাকে এ ছবি দিয়ে গেছে, দু লাখ টাকা দাম আছে, কিন্তু আমি বিত্রি(করবো না। মতিলালের বাবা কাঠের মিস্ত্রী ছিলেন, মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করেছিল, সেইজন্য ওরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। ওরা ট্রাডিশনাল পানওয়ালা....আর একটা পান্না পানওয়ালা। ওরা পরে। ওটা অনেক পুরনো বিল্ডিং। পান্না, মতি এরা হিন্দু হলেও ওরা উর্দু কাগজ পড়তো।

—আর কোন প্রফেশন?

—ঘুড়ি আছে, কবুতর বাজি হতো। এখনও আছে....ওখানে চিড়িমার মহল্লা ছিল, ওখান থেকে নিজস্ব জায়গায় বিত্রি(হত।

—চিড়িমার পেশাটি কি লখ্নৌ থেকে এসেছে?

—বলা মুশকিল আমার মনে হয় ওরা আগে থেকেই ছিল। যেহেতু জঙ্গল ছিল সেহেতু ওখানে লোকেরা এসব করতো।

—তখন বাজার ছিল?

—ওখানে কোন বাজার ছিল না। গাড়ি ঘোড়া কম ছিল। ঘোড়ার গাড়ি কম ছিল। পালকি ছিল। কাহার যাকে বলে। বড় বাড়ির মেয়েরা পালকি নিয়ে যেত। এটা এসেছে ওয়াজেদ আলি থেকেই। বেক হাউসে থাকতো ওখান থেকে ডেকে আনতে হত। তবে মেয়েরা যাবে।

—ইমামবাড়ার নিছে দোকানগুলো অনেক পুরনো, আমার দাদু একটা দোকান করেছিলেন, হাজি মহম্মদ ইয়াসিন। ট্রাস্ট

বোডের ম্যানেজাররা দোকান বিত্রি(করতো।

—রি(ত, পি. কে. ধারা এন্ড সন্স এরা বহু পুরনো। ঘোড়াগাড়ি , টমটম এসব লখ্নৌ কালচার। আমি ছোটবেলায় দেখেছি পালকি মুসলিম কালচারে ছিল না। হিন্দু কালচারে ছিল। পালকিটা নবাব ইন্ট্রোডিউস করেছে। কিন্তু পালকির ডিজাইন আলাদা। খাটিয়ার মতো পালকি। এখানেই বসতে পারবে। আপনাদের তিনজন চারজন বসতে পারবে। গরীবরা ব্যবহার করতে পারতো না, পয়সা ছিল না। তখন ডুলি আটানা নিত।

—পান কি?

—পান নবাবের কালচার। কাবুরি পাত্তা। ওখানে হতো না।

—খাওয়াদাওয়ায় কোন ট্রাডিশন আছে?

—আমাদের মধ্যে একটা আছে খানসামা। তারা উর্দূভাষী বাংলাভাষী হতে পারে। সেটাও অনেকটা ট্রাডিশন। খানসামাদের নবাব এনেছিলেন। মেটেব্রুজে যত বাবুর্চি কলকাতায় পাওয়া যেত না।

—ভাল বাবুর্চিকে কি ওস্তাগার বলা হয়?

—না, ওস্তাদ বলা হয়।

—সবাই মিলে একসঙ্গে খাওয়া.....

—ওটা লখ্নৌ কালচার না। ওটা ইসলামিক কালচার। এখনও কোন কোন জায়গায় চলে। তবে ওটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। কারণ হাইজিনিক প্রব্লেম আছে। কার কি রোগ আছে কেউ জানে না।

—ছিলিমছি....

—ওটা মুরদাবাদ থেকে আসে। হুকো লখ্নৌ কালচার আছে। হামিদ তামাকুওয়ালা, ওরা খুব নাম করা।

—লখ্নৌয়ে দর্জি শিল্প সেটা নবাব আসার জন্য বন্ধ হয়ে যায়.....

—হতে পারে.....

UNRECORDED INTERVIEW

কালী ভান্ডারী

২১/২/২০০৫, রাত ৮.৩০ টায়, নিজের বাড়িতে

১৯৫২ সালে আমার বাবা সুধীর ভান্ডারী কংগ্রেসকে হারিয়ে নির্বাচিত হন মাত্র ২০০ ভোটে। তার আগে পার্টি মহেশতলায় তেমন গু(ত্ব দেয়নি। ওই নির্বাচনের কাজে এখানে এসেছিলেন মজফফর আহমেদ। তিনিই প্রথম দর্জিদের মধ্যে সংগঠন করার কথা বলেন। ১৯৫৩ সালে মজফফর আহমেদ আবুল বাশারকে নিয়ে দর্জিদের মধ্যে কাজ শু(করেন। ১৯৫৭ সালে তৈরি হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল টেলার্স ইউনিয়ন। ১৯৫৪ সালে একটা বড় মিছিল হয়েছিল ডাকঘর পোস্টঅফিস থেকে। আমিও সেই মিছিলে গিয়েছিলাম। আমার তখন নয়-দশ বছর বয়স।

সংগঠন ছিল চটা,মহেশতলা,কানখুলি এলাকায়। বড়তলায় ছিল না তেমন। তখন ভূমিকা নিয়েছিলেন আকবর আলি থানাদার। তখন দর্জিরা ছিল গরিব, কৃষকদের মতোই বছরে তিন মাস কাজ, আর ন'মাস ফাঁকা। পরে দর্জিদের শ্রেণী অবস্থান পাল্টে যায়। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ওইসব দর্জিরা নিজেরাই পেটি ওস্তাগার হিসেবে কাজ করেছে।

একসময় সরকারের কাছে দর্জি ইউনিয়ন টেন্ডার নিয়ে দাবি করেছে। রেল, পুলিশের অর্ডারের টেন্ডার চলে যেত মারোয়ারীদের কাছে।

আবুল বাশার এবং আমার বাবার লেখা দুটি বই আছে। আবুল বাশারের লাইব্রেরিতে পাওয়া যাবে।

এখন ওয়েস্ট বেঙ্গল টেলার্স ইউনিয়ন-এর অস্তিত্ব একভাবে নেই। ৭০-এর দশক থেকে মুরসালিন মোল্লা সবটা জানেন। আবুল বাশারের লাইব্রেরিতে পাওয়া যাবে বই-পত্তর।

RECORDED INTERVIEW

বক্তা কওসর আলি
তারিখ ২০।৮।২০০৪ সময় সকাল ১১টা
স্থান মধ্য রামদাসহাটি, ভান্ডারীপোল, ভবানীপ্রসাদ চক্র(বর্ত্তীর বাড়ি

—প্রথমে নাম বলুন
—আমার নাম শেখ কওসর আলি
আপনার বাড়িটা কোথায়?
—বাড়ি আমার এই কাজির ডাঙায়, ভান্ডারীপোল।
—আপনার নাম কি?
—আমার নাম গোলাম রসুল। (কওসর আলির পাশে বসে)
—উপস্থিত আপনি কি করছেন? (কওসর আলিকে প্র()
এখন আপনি তো মনে ক(ন ধ(ন না আমি আট বছর বেকারই আছি। ছেলেপুলেরা যা কিছু কাজ করছে। তার আগে দোকানদারি কাজ করেছি আমি পঁচিশ বছর....আগে থেকে দোকানদারি কাজ করেছি।
—কিসের দোকান?
—এই ধ(ন না রেডিমেড জামাকাপড়। কেসি দাসে কাজ করতাম।
—মিষ্টির দোকান?
—না, শ্যামবাজারে রেডিমেড কাপড়ের দোকানে। প্রত্যেক স্থলে স্কুলে গিয়ে ওদের ছেলেরা অর্ডার পত্তর নিয়ে আসে, তা করতাম।
—তা কি গিয়ে করতেন?
—ওখান থেকে কাপড় পত্তর নিয়ে এসে তৈরি করে দিয়ে আসতাম। এরকম ভাবে চলল, প্রায় বছর কুড়ি পার হয়ে গেল। ওই দোকানে কাজ করতে করতে। তারপর আমার শরীর খারাপ হয়ে গেল। দুবার দুবার অপারেশন হয়ে গেল। আর সম্ভব হল না। আর ওখানে কাজ খুব ভাল হয়। ওরা গেরানটি দিয়ে কাজ করে, সেরকম মাল দিতে হয়। ....স্কুল ইউনিফ্রম মানে ফ্রক, প্যান্ট জামা যাবতীয় স্কুল ইউনিফ্রম। তা ধরো আট বছর ও কাজ আমি ছেড়ে দিয়েছি। যা দর্জি পত্তর এখানে জোগাড় করতে পারছি, বাইরে থেকে যারা আসছে তাদের হাতে কাজ ভাল না। বাধ্য হয়ে আমাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। ছেলেরা বেশিরভাগ সব হাটে বিজনেস করছে, রেডিমেড।
—হাটে বিজনেস বলতে ওরা নিজেরা সেলাই করে?
—একটা ছেলে মনে করো মাল এনে তৈরি করে হাটে দিয়ে আসে। আর বাকি তিনটি ছেলে মনে কর কাজ এনে তৈরি করে দিয়ে দেয়।
—কোন ওস্তাগরের কাজ করে?
—বেলাল ওস্তাগরের কাজ করে। বেলাল রাজাবাগানের। ...তারপর ধরো ছোট ছোট দু একটা ওস্তাগর আছে, বাড়িতে মেশিন আছে। মানে প্রত্যেক ছেলের দুটো করে মেশিন আছে। একটা করে কারিগর রেখেছে। একটা নিজেরা করে। এইভাবেই চালিয়ে যাচ্ছি.....
—চারটে ছেলের আটটা মেশিন। তা ছেলেরা কি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে, নাকি একসাথে আছে?
—না, সব ভেন্ন ভেন্ন। আজকের পরিস্থিতি দেখছেন তো!
—ছেলেদের সব বিয়ে থা হয়ে গেছে?
—সব ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে। একটা ছেলের শরীর খারাপ। ভবানীদা দেখে এসেছে। কেলাস ফাইভ অবধি তাকে পড়ানো হল। তারপর মনে কর টাইফয়েড হল। তারপরই শরীরটা দূর্বল হতে শু(করল। হাত পা গুলো কাঁপছে। অনেক চিকিৎসা করেছি কিছু হয়নি।
—তা ধ(ন ওই যে আপনি ২০ বছর কে. সি দাসে কাজ করেছেন, তার আগে আপনি কি করেছেন?
—তার আগে মনে করো অন্য জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় যা কাজ হতো তা গিয়ে করতাম। আমার মামা ছিল ঠুটোর কলে, মাকালহাটি।
—তখন আমি এক টাকা রোজ পেতাম।
—সেটা কত সাল?

—তা ধরো (কিছুটা থেমে) আমাদের দেশ স্বাধীন হবার পরেই। তখন আমার বয়স হবে মনে কর পনেরো ষোল বছর হবে।
—কি কাজ করতে হত?
—কাঁধ সেলাই করতে হতো(তখন তো ধরো সস্তা বাজার ছিল। জামা সেলাই করতে হতো, বিভিন্ন রকম কাজ করতাম। বিভিন্ন কাজ শিখেছিলাম।
—সেগুলো কি কোন ওস্তাগরের বাড়ি গিয়ে কাজ করতেন?
—হ্যাঁ, আমার মামার কাছে। ঠুটোর কলে।
—তিনি কি ওস্তাগর ছিলেন?
—হ্যাঁ, ওস্তাগর ছিলেন। তিনি মনে করো কাজ করতেন হরলালকার, বড়বাজারে।
হ্যাঁ হরলালাকার কাজ করত। আর একটা ওই.....
—মামার নাম কি ছিল?
—মায়া আলম মোল্লা। উনি কাজ করতেন বড় বাজারে। ওনার ওখানে কাজ করতাম। তারপরে আমাদের বয়স্ক লোক ছিল, ওনার মেয়ে ছিল(তো আমার মামিমা আর কি বলতো এই ছেলেটিকে আমার জামাই করবো।
—আচ্ছা।
—তো এই কথায় কথায় হতে হতে একদিন মনে করো কমপি-ট হয়ে গেছে কথা। একদিন মনে করো আমার দিদিকে ডাক করলো। ...তো এই ব্যাপার মেয়ের তো কাজ টাজ আসছে, কি করবো। তোমরা ভায়ের বিয়ে দেবে আমার মেয়ের সঙ্গে? তো দিদি আমায় বলল, মামা বলছে এরকম কি হবে! ...তা আমি বলি সব কিছুই তো আমার জানা আছে। আমি কি করি, কোথায় থাকি সবই তারা জানে। এরপর তাদের যদি মেয়ে দেবার ইচ্ছা থাকে আমাদের কোন আপত্তি নেই। ...তো আমার মামা বললো আমি যখন কথা দিয়েছি তখন আমি মেয়ে দেবো। তা যাই হোক কথাবার্তা হবার পর আমি ওখান থেকে চলে আসি। কাজ ওখান থেকে এনে, বাড়িতে একটা মেশিন ছিল...তখন উইলসন মেশিন ছিল। বড় মেশিন বলে, তখন ওই মেশিন আকড়া থেকে কিনে আনি কত ষাট টাকা দিয়ে।
—তা আপনার বিয়ে হলো যে, ওখানেই হলো?
—হ্যাঁ ওখানেই হলো। মাস ছয়েক আগে চলে এসেছিলাম।
—এই সময়টা কি স্বাধীনতার পরে....নাকি কোন সময়টা।
— স্বাধীনতার পরে একটা দাঙ্গা হয়েছিল। আমাদের পূর্ববঙ্গের অনেক লোক চলে এসেছিল পঞ্চাশে। তার আগে না পরে?
—পরে। তার পরে পরে। আমার বিয়ে হয়েছিল ৬৩ সালে।
—তারপর একটা দাঙ্গা হয়েছিল ৬৪ সালে।
—হ্যাঁ ৬৪ তে। ৬৪ আমার বিয়ে হবার অনেক পরে।
—আচ্ছা।
—বছর তিনেক পরে। আমার বড় ছেলে হয় যখন ৬৪। ৬৩ তে মনে কর ছেলে হয়। তারপর ৬৪ তে আমি চলে যাই বাংলাদেশে। হ্যাঁ আমার ভগ্নিপতি মনে কর পশ্চিম পাকিস্থানের লোক, পাঞ্জাবের লোক।
—ভগ্নিপতি, ওকি বাংলা না উর্দূভাষী?
—উর্দু, ও চলে আসে অনেক আগে। এসে খিদিরপুরে বিয়ে করে। তারপর পরিবার থাকা স্বত্তেও ঝামেলা হয়, তারপর ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে থাকে। তো কিছু লোক বললো, লোকটা ভালো আছে, বোনটা বিধবা হয়ে পড়ে আছে। বিয়ে দেবে?.....এসব নিয়ে মতামত করা হলো হ্যাঁ বিয়ে দেবো।
—আপনারা কি এখানকার মানুষ?
—বাপ দাদা চোদ্দপু(য আমরা এখানকার।
—এখানে নাকি আগে অন্য জায়গায় থাকতেন?
—এখানে, এখানেই।
—তো আগে ঐ গল্পটা শেষ ক(ন।
—হ্যাঁ তো যাই হোক, ৬৪ তো ঝামেলা হল। তো আমার ভগ্নিপতি বলল, আমি চলে যাবো থাকবো না এখানে। .....বাংলাদেশে। সং(পে কিছু বলছি....
—সং(পে বলতে হবে না। আজ যতটুকু হবে হবে, তারপর পরে হবে। তারপর যেটা বলছিলেন সেটা বলুন।
—যাই হোক ৬৪ তে মনে করো আমি বাংলাদেশে যাই।....
—যেটা বলছিলেন, ভগ্নিপতি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের লোক....তারপর উনি এখানে চলে এলেন। তারপর থেকে বলুন।

—মনে কর এখানে আসার পর বিয়ে সাদি হবার পর এখানে ছিল। বছর দশেক ছিল আর কি।

—খিদিরপুর থেকে এখানে চলে এলো!

—আচ্ছা বছর দশেক থাকার পর এখানে ছেলেমেয়ে হল মনে কর। আমার এখানে ছিল, আমার বাড়িতে ছিল। বাড়িতে থাকাকালীন পাশে জমি ছিল তা আমাকে বললো ঘর করবো, আমাকে জায়গা দাও। রাস্তার পাশে যে পাঞ্জাবি বাড়িটা রয়েছে তো ওটা মনে কর আমার হাতে তৈরি। দু কামরা ঢালাই ছাদের ঘর একটা রান্না ঘর আর একটা দলিজ মতো।...তা আমার হাতে তৈরি। ওটা তেরো হাজার টাকায় বিত্রি(করা হলো।

—নিজের হাতে তৈরি মানে আপনি কি কাজ করেছিলেন। মিস্ত্রি ছিলেন?

—হ্যাঁ নিজে দাঁড়িয়ে তৈরি....মানে ঘরটা আমার নিজের হাতে গড়া আরকি। এবার যখন ভগ্নিপতি বলল তা আমি থাকবো না আমি চলে যাবো....আমাকে বললো তুমিও চলো। তা আমি বললাম আমি তো যাবো না। ....আমি বললাম তোমার মন চইছে তাহলে চল। তা পাসপোর্ট ফাসপোর্ট করলাম.....ওখানে গেলাম।

—ওখানে মানে?

—বাংলাদেশে। পূর্ব পাকিস্তানে। ঢাকায়....ঢাকায় মীরপুরে, দুনম্বর কলোনিতে ছিলাম—মীরপুরে। ওখানে আমি থাকি মাস তিনেক। নতুন তো গিয়েছি, ফার্স্টে গিয়ে মনে কর বাড়ি ঘর কিছু ছিল না।

—পরিবার নিয়ে গিয়েছিলেন?

—আমি পরিবার নিয়ে যাইনি। আমার দিদি গিয়েছিল, ভগ্নিপতি আর ছেলেপুলেরা....ওদের ফ্যামিলিটা পুরো গিয়েছিল। আর আমি একা গিয়েছিলাম। ওখানে মাস তিনেক থেকে কিছু কাজ করেছিলাম মনে কর। ঢাকা নিউ মার্কেটে কিছু কাজ করেছিলাম। ওখানে মাস দুই থেকে মনে কর আমার মনটা আর লাগছে না.....

—ওখানে কি সেলাইয়ের কাজ করেছেন?

—হ্যাঁ সেলাইয়ের কাজ করেছি।

—নয় নম্বর কলোনি তো নন বেঙ্গলি যারা পাকিস্তানি উর্দুভাষী তারাই থাকে। (ফা(ক)

—হ্যাঁ উনি তো একজন উর্দুভাষীর সঙ্গেই গিয়েছিলেন।

—ওখানে এখান থেকে অনেকে গিয়েছিল। বিহারিরা এসেছিল বেশি। আর আসার পরেতে, আর ওদের কথাবার্তা....ওদের ভাষাটা তো খারাপ। সেই জন্য তো ওখানকারের লোকের সঙ্গে দাঙ্গা বেঁধে গেল। আয়ুব খান যখন নেমে গেল, তারপর তো ওখানে একটা আন্দোলন চালু হল।

—বাহাত্তোরের আন্দোলন, মুক্তি(যুদ্ধ.....

—হ্যাঁ ওটার আগেই...মনে কর আয়ুব খান নেমে যাবার আগেই আমার ভগ্নিপতি এখান থেরে পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায় করাছি। তা আমি এখানে মনে কর আছি। এখানেই থাকাকালীন.....

—তা আপনি ফিরে এলেন, আপনার ভগ্নিপোত করাচি চলে গেল।

—না, আমি চলে আসার পর ওরা ওখানে ছিল। তারপর চলে গেল।....দেড় বছর ছিল।

—আপনি কবছর থাকলেন?

—কোথায়?

—ওখানে, ঢাকাতে....মারপুরে?

—আমি মাস তিনেক ছিলাম।

—মাস তিনেক।

—তিনমাস ফার্স্টে গিয়েছিলাম। তারপর একবার লাস্টে গিয়েছিলাম, তাতে একমাস ছিলাম। দেখা করতে গিয়েছিলাম, দেখা করে চলে এসেছি। চলে আসার পর তারপরেতে মনে কর আমার ভগ্নিপতি জমিটা সাতশ টাকায় বন্ধক দিয়ে যায়। বাড়ি ঘর দোর সব। ওনার নামে একটা দলিল করে দিয়েছিল। বিত্রি(করার দলিল করে দিয়েছে। ও বলল আমাকে এরকম করে দিতে হবে। তখন আমি ছোট। আমার বয়স হবে মনে কর কুড়ি বাইশ বছর বয়স মাত্র। তা যাই হোক আমি বললাম, আমার তো কেউ নেই, একটা ভাই ছিল সেও মারা গেছে। আমি বললাম, ঠিক আছে বাড়ির দলিল পত্তর কর। করতে মনে কর এইবার ও যখন ওখানে চলে গেল...তখন মনে ভাব হলো ওটাকে বিত্রি(করবো। তা এটাকে মনে কর জমিটাকে মর্ডগেজ দিয়ে গিয়েছিল, সেটা সুদে আসলে মিলিয়ে মনে কর আট হাজার টাকা হয়েছিল। আট হাজার টাকা হবার পরেতে ওরা বলঠে আমি বিত্রি(করবো কি ভাবে। তা আমি বলি দেখুন আপনারা তো বিত্রি(করবেন। তো পাঁচ হাজার টাকা নেবেন...এই আট হাজার টাকা নেবেন। বাকি টাকা ফেরৎ দেবেন কিন্তু আমি তো ওই টাকা দিয়ে করতে পারবো না। আমায় কিছু সময় দেওয়া থাক। তাহলে আমি ওটাকে কোন রকমে নিতে পারি।

কষ্ট করে গয়নাগাটি বিত্রি(বাট্টা করে দিয়ে ওদের টাকা পয়সা খুসিয়ে আমি আবার নিজের নামে দলিল করে নিলাম। তা খবর পেলো যে শালা জমি জায়গা ছাড়িয়েছে তা বলল চল বিত্রি(করে সব চলে যাই। তা আমি আমার ভগ্নিপতিকে বললাম না, আমি এখান থেকে কোন জায়গায় যাব না। ...হ্যাঁ তোমার বাড়ি আমি ছাড়িয়ে দিয়েছি, তুমি এবার বিত্রি(করে দাও, আমার তো (মতা নেই যে নিয়ে নেব। যে টাকা পয়সা আমি খরচ করেছি সেটা আমাকে দিয়ে দাও তা হলে আমি একটা দলিজ করতে পারি, এখানে আমি থাকবো। এখানে (জি রোজগার করবো যা হবে হবে। এপর্যন্ত যা পাঞ্জাবিদের সঙ্গে মনে কর কথা হলো তেরো হাজার টাকা। তেরো হাজার যেমন কথবার্তা হল কিছু টাকা আগে নিয়ে মনে কর শ পাঁচেক টাকা নিয়ে বাউন্ডারি পাঁচিল দিয়ে কোর্টে রেজিস্ট্রি হল তেরো হাজার টাকায়, বারো হাজার টাকা উনি নিজের কাছে নিল। আমাকে বলল, এক কাজ করো দু একজন মান্যী লোককে ডাকবে, ডেকে তোমার যা টাকা পয়সা আছে দিয়ে যাবো। দুপুর বেলা তখন এসেছে উনি খেতে বসেছে, আমি চান করতে গেছি...চান করে আমি খেয়ে দেয়ে এসে দেখি উনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন। খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে গেছে, গিয়ে দেখি বাইরের ঘরেও নেই। আর নেই, তা নেই ডাইরেক্ট উনি এখান থেকে টাকা পয়সা নিয়ে চলে গেছে। আমাকে উনি টাকা দেননি(আমাকে অতটাকা ফাঁসিয়ে দিয়ে গেল। যে মনে কর ধূলি খুলি বষ্টম খুলি, তখন মনে কর সস্তায় বাজার ছিল, সপ্তা ভোর কাজ করলে দুশো টাকার কাজ হয়।

—কথাটা কি বললেন, একবার বলুন—ধূলি খুলি বষ্টম খুলি!

—ধূলি খুলি বষ্টম খুলি মানে কিছু নেই।

—কথাটা বাংলা কথা তো!

—হ্যাঁ, বষ্টম খুলি মানে কিছু নেই, ভিখারি হয়ে যাবার কথা।

—মানে যা ছিল সব ঝেড়ে একেবারে ফিনিস।

—তার উপর মনে কর আমার কিছু দেনও ছিল। আমার বৌমার আর কি বালা নিয়ে গিয়ে বন্ধক দিয়েছে, তারপর একজনের ভায়ের বিয়ের টাকা ছিল তার কাছ থেকেও নিয়েছি। সব মিলিয়ে জমিটা ছাড়িয়েছিলাম। মনে কর যখন টাকা পয়সা দিয়ে গেল না আমার শেষ অবস্থা। তা যা হোক যখন চলে গেল তখন আমার ভিখারী অবস্থা।

—উনি চলে গেলেন করাচিতে।

—না, উনি চলে গেলেন বাংলাদেশেতে। এখান থেকে যাবার বাংলাদেশে গেল। তার কিছুদিন পর যখন আয়ুব খান নেমে গেল ওখানে একটা ঝামেলা আন্দোলন হল তার ফাঁকেতে চলে গেল করাচি। তা মনে কর ও তো পশ্চিমের লোক, ও থাকলে ঝামেলা হবে তা চলে গেল।

প্রায় বছর দশ পনেরো পরে একদিন আমার দিদি, আমার দিদি এসেছিল ফাস্টে, দিদি আমার একটা ভাগনেকে নিয়ে করাচি থেকে। তা এসে বলল এই এই ব্যাপার। তা আমি আর কিছু বলিনি। তখন আমার মনে কর মালিকের দায় বাড়িঘর দোর যা হোক কিছু করেছি। .....দেনাপাওনা যা ছিল সে আদায় করে ফেলছি। তা যা হোক আমি আর দিদিকে কিছু বলিনি, দিদির মনে দুঃখ হবে।

—জায়গাটার কি হল?

—জায়গাটা পাঞ্জাবিদের বিত্রি(করা হলো। তার তেরো হাজার টাকা পুরেই নিয়ে চলে গেছে। আমাকে আর দেখেনি। তা যখন এলো আবাক হঠাৎ আমার বড় ভাগনেটার মনে কর বিয়ে হয়েছে। বিয়ে হবার নদিনের মাথাতেই ছেলেটা মার্ডার হয়ে গেল। ওবদর ক্যাসেট নিয়ে ক্যাসেট নিয়ে কি ঝামেলা হয়েছিল।

—কোথায় মার্ডার হয়েছিল, বাংলাদেশে?

—না করাচিতে।

—কত সালে!

—এই হালে, বছর দশেক আগে মনে কর ছেলেটা মার্ডার হয়। হয়ে যাবার পর মনে কর জামাইবাবুর মাইন্ডটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। .....আমার দিদি যখন আসছিল তখন বলল আমাকে নিয়ে চল, আমি যাব।

—আচ্ছা।

—তা যা হোক আবার এলো এখানে। এসে প্রায় মাস খানেক ছিল। ...আমার দিদি যখন আসছিল তখন বলল আমাকে নিয়ে চল, আমি যাবো।

—আচ্ছা।

—তা যা হোক আবার এলো এখানে। এসে প্রায় মাস খানেক ছিল আমার দিদি জামাইবাবু। তো ছিল মনে কর ওই সব আমি কোন কথাই বলিনি, যে আমাকে এ রকম ফাঁসিয়ে দিয়ে গেল। কিছু করলো.....আমি কোন কথাই বলিনি। আমার যতটা কর্তব্য কিছু একমাস ধরে হয়তো যা ডাল ভাত হয়েছিল আমি খাইয়েদিয়েছি। এবারে যাবার সময় ছেলেদের কাপড় চোপড় দিয়ে

নিজেদের কাপড় চোপড় দিয়ে আবার ছেড়ে আসি। .....ছেড়ে আসতে তারপর ওই পর্যন্ত মনে কর হয়ে গেল। এর কিছুদিন পর পরে মনে কর বছরখানেক পরে আমাপ ভগ্নিপতি আবার একবার এলো, একাই এলো। মনে করো দিন দশ পনেরো ছিল। থাকার পরে তো উনার অবস্থা খুব খারাপ, চোখের জ্যোতি চলে গেছে। আমি তো আর আসতে পারবো না। যাবার সময় কিছু কাপড় পত্তর কিনে, বড়বাজার থেকে আমার দিদির জন্য একটা বেনরসি শাড়ি কিনে নিয়ে চলে গেল। এর পর আর কোন চিঠি পত্তর আসছে না। আমারও কোন চিঠি পত্তর দিইনি।

—কোন যোগাযোগ নেই।

—না। এ পর্যন্ত ওদের সাথে শেষ হয়ে গেছে।

—আপনার ক ভাই ছিলেন?

—আমার দু ভাই।

—বোন নেই?

—দুই ভাই দুই বোন।

—এক ভাই মারা যায়।

—আমার বিয়ের সময়, মনে কর এক সাথেই বিয়ে হবার কথা ছিল। আমার মামার কাছে ভাই ছিল। আমার বাবা যখন মারা যায় আমরা তখন ছোট।

—বাবার নাম কি ছিল?

—আবদুল রহমান। বাবা যখন মারা যায় আমি তখন বছর আষ্টেক বয়স হবে আমার। খুব ছোট।

—মা বেঁচে ছিলেন?

—মা যখন মারা গেছে মনে কর তখন আমার খেয়াল ছিল না।

—আরো আগে মারা গেছেন?

—অনেক আগে মারা গেছেন।

—বাবা কি করতেন?

—বাবা এই দর্জির কাজ করতেন।

—তার বাবা?

—উনি সিঙ্গাপুরে যাতায়াত করতেন। ওই দর্জির কাজ মানেই সবকিছু।

—ঠিক আছে তা হলে এই অবধি থাক ....

RECORDED INTERVIEW

মহম্মদ মোত্ত(ার হোসেন মোল্লা। বয়স ৬৮। বাসস্থান পাঁচপাড়া রোড (রাজাবাগান)। তারিখ ১৬/১/২০০৫।

আমরা প্রথমে ছিলাম ফোর্ট উইলিয়ামের ওখানে। কিনু ফকিরের সময় আমরা প্রথমে আসি আকড়ায়। তারপর সেখ এওয়াজির সময় আসি রাজাবাগানে। রেস কোর্সের কাছে তখন ছিল বাঁশবাগান। কিছু কিছু গ্রাম ছিল। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজুদ্দোলার পতনের পর ব্রিটিশ ওখানে ফোর্ট উইলিয়ামের পত্তন করে। ওখান থেকে অনেকে প্রথমে সোনাই-এ আসে। ওখান থেকে মেটিয়াব্রুজ। পাশের পাড়ার বাসিরা সোনাই হয়ে এখানে এসেছে। কিনু ফকির দর্জির পেশায় ছিল। ওরা কিছু ঝাড়ফুঁকের কাজও করত। নবাব পিরিয়ডে জাহাজ ছিল না। ওগুলো ব্রিটিশের সময়ে এসেছে। তখন পাল, বজরা এসব ছিল। দিনু ফকিরেরা আকড়ায় আসার পর মোল্লা টাইটেল পেয়েছে। ওরা মসজিদের কাজ টাজ দেখাশোনা করত। মাতব্বর গোছের ছিল। তাই মোল্লা টাইটেল পেয়েছে। এখানে মসজিদে যে 'দ্যাগ' আছে তার কানায় এখনও জহি(দ্দিন মোল্লা নাম খোদাই করা আছে। জাই(দ্দিন মোল্লার ছেলের নাম মহিত মোল্লা। সেখ এওয়াজিও দর্জির কাজ করতেন। কিন্তু তার মোল্লা টাইটেল ছিল না।

তখন ফোর্ট উইলিয়ামের ওখানে ছিল গ্রামীন পরিবেশ। মাঝে মাঝে কিছু পাতার বা মাটির ঘর ছিল। তারা কৃষিজীবী ছিল। আকড়ায় আসার পরই আমার পূর্ব পু(ষেরা দর্জির কাজ শু(করে। তখন মেমসাহেবরাই প্রধানত দর্জির কাজ করাত। কিছু মুষ্টিমেয় এদেশীয়রা দর্জির কাজ করাত। তখন এরা সাধারণত নিমা, গেজে, ধুতি, চাদর, ফতুয়া এসব ব্যবহার করত। সেলাই হাতে হত। মেশিন এল ব্রিটিশের পর। তখন উইলসন মেশিন ছিল। সিঙ্গারও ছিল। আমার উইলসন ছিল। বাবা মেমসাহেবদের গাউন সেলাই করত। পার্ক সার্কাস, বালিগঞ্জ যেতেন। এসব জায়গাতে তখনও ইংরেজরা থাকত না। ১৯৪২ সালে তখন আমার বয়স হবে সাত-আট। জাপানের সঙ্গে ব্রিটিশের যুদ্ধের কথা আমার স্মরন আছে। তখনও ইংরেজরা মেটিয়াব্রুজে ছিল

না। ৬১ নং পার্কে কিছু মুষ্টিমেয় ইংরেজ ছিল। তখন বড় বড় সব কলকারখানা তো সবই ওদেরই ছিল। এদেশীয়রা কুলি-মজুরই ছিল। অনেকে চাষবাস করেই জীবন কাটিয়েছে। পরে আস্তে আস্তে পরিবর্তন এসছে।

আমার বাবা কিছুদিন পিনাং-এ কাটিয়েছে। বিয়ের আগে। বাবা আমার ঠাকুরদার একমাত্র ছেলে ছিলেন। দেশে ফেরার পর বৃদ্ধ বাবাকে ছেড়ে আর বাইরে যাননি।

বাবাকে আমি গাউনের কাজ করতে দেখেছি। বাইরে থেকে অর্ডার নিয়ে আসত। বাড়িতে এসে কাজ করত। রেডিমেড তখন ছিল না। ৫০-৫৫ সাল থেকে রেডিমেড আরম্ভ হয়েছে। প্রথম দিকে ব্লাউজ-টলাউজ হত। মঙ্গলা হাটে বিত্রি(হত। ফ্রক-ট্রক পরে এসেছে। বর্তমানে ররর হাউসের ওখানে অনেক পুকুর ছিল। ওখানে বাইরে থেকে আসা অবাঙালীরা থাকত। ওরা ধোপার কাজ করত। সাহেব-মেমেরা ওদের দিয়ে কাপড় কাচাত। আয়রন করাত। তাই এ জায়গার নাম ধোপা-পাড়া। আমাদের কাপড়-চোপড় বাড়ির মেয়েরা নিজেরা কাচত।

এখানে কিছু জলা মতো আছে। হয়ত আগে চাষবাস হত। আমরা দেখিনি। আগে আমরা মাছ ধরে খেতাম। এখন কিনে খাই।

বাবার সময় কাপড় ইংরেজদের দেশ থেকেও আসত। ব্রিটিশরাও কিছু বড় বড় দোকান করেছিল। যেমন পার্ক স্ট্রীটের মোড়ের হল এন্ড অ্যান্ডারসন। এখন বন্ধ। তারা দর্জি রেখে কাজ করাত। আমার জ্যাঠার ছেলে মাইত মোল্লা ওদের কাজ করত। ট্রাম কোম্পানির সমস্ত ইউনিফর্ম ওরা করত। ওরা কাপড় দিয়ে দিত। এরা কাটিং করে সেলাই করে দিত। সুতো-টুতো কিনে নিতে হত। কিছু বড়বাজারে পাওয়া যেত।

মহিত মোল্লারা তখনকার সময়ে ছিল বিরাট ধনী লোক। অনেক জায়গা জমি ছিল। হল অ্যান্ড অ্যান্ডারসনের কাজ করেই তারা এসব করেছে। ওনার ছেলেরাও করেছেন। স্বাধীনতার পরও হল অ্যান্ড অ্যান্ডারসন চালু ছিল। এখানকার কেউ কারো কাছে থেকে কাজ করত না। তারা নিয়ে আসত। মেশিন-টেশিন নিজেদের ছিল। মাইত মোল্লারা সারাজীবন এসব কাজই করেছেন। আলাদা কিছু করেননি। ছেলেরা বিলাসিতা করে কাটিয়েছে। তেমন কিছু করে উঠতে পারেনি। একমাত্র বড়ছেলে মারোয়ারিদের সঙ্গে কিছু কাজ করেছে। কিন্তু সেও বেশিদিন চালাতে পারেনি।

যুদ্ধের সময় খুব রমরমা কাজ হয়েছে। কারণ তখন ওরা এসব কাজ করতে পারত না। ওয়াইডওয়াইস লেডলা ছিল মেট্রো সিনেমার পাশে। মশারী বেডিং-এর যাবতীয় দর্জির কাজ হত। ওখান থেকে অর্ডার নিয়ে আসত এখানকার লোকেরা। ওদের পেমেন্ট খুব ভালো ছিল। ওয়ারড্রবও ছিল তখনকার নামকরা। এদের অনেকের দিল্লি, বোম্বেতেও দোকান ছিল। এখন আছে কিনা জানিনা। থানকে থান কাজ হত এদের। টেন্ডার হত। আমরা ছোটখাটো অর্ডার নিয়ে কাজ করতাম। এরকম বড় অর্ডারের কাজ কখনও করিনি।

দর্জির কাজ এখানকার মানুষ এখানেই শিখেছে। কেউ কেউ সিঙ্গাপুর, পিনাঙ , রেঙ্গুন এসব জায়গায় গেছে। আমার বাবা কাজ এখানেই কিছু শিখেছিলেন। পরে পিনাঙে কিছুদিন কাজ করার পর আরো একটু পাকা হয়েছিলেন।

দর্জির কাজের আগে এরা চাষবাসের সঙ্গে ছিল কিনা ঠিক জানিনা। আমার বাপ-ঠাকুর্দারা দর্জির কাজই করে এসেছে। এখানে কোন ধানজমি ছিল না। ফোর্ট উইলিয়ামের ওখানে অনেক বাঁশঝাড় ছিল। গঙ্গার ধারে যখন ধানজমিও নিশ্চয় ছিল। পরে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা আস্তে আস্তে দখল নিতে থাকল। শামপাল নৌকা করে তারা আসত। নবাবা ওয়াজেদ আলী শাহের আগেই এখানে দর্জি

সম্প্রদায় ছিল। ওরা নবাবাদেরও অনেক কাজ করেছে।

পরে আস্তে আস্তে সকলে জানল যে কলকাতায় ভাল জামা-কাপড় পাওয়া যায়। প্রথমে ব্লাউজ-টলাউজ হত। একন তো পা থেকে মাথা পর্যন্ত সব হয়। আমাদের জামা-কাপড় সব এখন ইংলিশ স্টাইলের। নবাবাদের ছিল চাপকান-চোপকান। বাঙালীদের ছিল ধুতি-পাঞ্জাবী এসব। হিন্দু-মুসলিম সবাই। আমি কাজ করেছি শোভাবাজারের রাজা রাজেন্দ্র নাথ মল্লিক। পিজি-এর উল্টোদিকে রাজা কমলা রঞ্জন রায় দের পরিবারের। আমার বাবাও করেছে। আমরা কাজগুলি পেতাম বাড়ি বাড়ি ঘুরে। কখনও কখনও কেই রেকমেনডেড করত। মেয়েরা পরত সেমিজ, সায়া, ব্লাউজ এসব। এক একটা সেমিজ (ব্লাউজ ও তলা একসঙ্গে) এর মজুরি ছিল দু-টাকা। এখন একশ টাকা দিলেও হয়ত কেউ করবে না।আর এক কোম্পানী যারা আগে ম্যালেরিযার ওষুধ তৈরি করতো। গণেশ টকিশের কাছে ওদের বাড়ি ছিল। আমি ওদেরও কাজ করেছি। এক-একটা বাড়িতে পাঁচ-ছটা মেয়ে থাকত। তাদের সবার হয়ত ১২ টা করে অর্ডার দিল। লং ক্লথ হত। ৪০ গজের থান। তারা নিজেদের লোক দিয়ে বাড়িতে আনিয়ে রাখত। ওরা চিঠিতে খবর পাঠাত। আমরা বাড়ি গিয়ে নিয়ে আসতাম। বাসে নিয়ে আসতাম। কখন দু-তিন বারে আনতে হত।

স্বাধীনতার আগে ক্লাস ফাইভে পড়ি মেটিয়াব্রুজ হাই স্কুলে। ক্লাস নাইন অবধি পড়েছি। বাবা অসুস্থ ছিল। ছোট ছোট ভাই-বোন ছিল। পড়াশোনা ছাড়তে হয়েছিল।

১২ টা জামা করলে ২৪ টাকা মতো পেতাম। তাতেই চলে যেত। তখন ৪ আনা ৫ আনা চালের সের। সুতো-টুতো এখানেই পাওয়া যেত। কখনও নিউ মার্কেটে বা বড়বাজারে যেতে হত।

হিন্দিভাষীরা তখন ছিল তবে খুব কম। তারা কলকারখানায় কাজ করত। রাজাবাগান ডক ইয়ার্ডে, জি. আর. এস. ই. এসবে। স্থানীয় মুসলিমরা সেভাবে এসব কাজে যায়নি। তারা কুলি কাবাড়ী হওয়া পছন্দ করত না। দর্জির কাজই করত। বজবজ এসব দূর দূরান্ত জায়গা থেকে হিন্দু-মুসলিম সবাই এখানে কাজ করতে আসত। তার ভোর চারটেয় বেরিয়ে সকাল আটটায় জয়েন করত। স্থানীয় হিন্দুরাও কম গেছে। তারা দোকান টোকান এসব ছোটখাট ব্যবসা করত। পরে শি(া দী(া অর্জন করে অফিসার-টফিসার হয়ে ঢুকেছে।

হিন্দুরা দর্জির কাজে কেন যায়নি ঠিক বলতে পারবো না। তাদের ভাল লাগেনি হয়ত। দর্জির কাজে সারাদিন বসে কাজ করতে হত। কোমর ভেঙ্গে যেত। এজন্য তারা এসব কাজ পছন্দ করেনি।

হিন্দু বা খ্রীষ্টান বাড়িতে যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের কোনও সংস্কারজনিত বাধা ছিল না। ওরা কখনও অশ্রদ্ধা করেনি। খ্রীষ্টান বাড়িতে যাওয়ার ব্যাপারে হিন্দুদের কোনও সংস্কারজনিত বাধা ছিল না। তারা যেত তবে দর্জির কাজের জন্য নয়। তারা শি(িত হয়ে ফ্যাক্টরি, অফিসে গেছে।

আমরা যখন পড়াশোনা করেছি তখন মুদিয়ালি হাই স্কুলে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫০ ৫০। কিন্তু যেহেতু মুসলিম জনসংখ্যা ছিল বেশি সেদিক দিয়ে ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট কম।

বাসস্ট্যান্ড ছিল বদরতলা আর বড়তলায়। বড় তলারটা এখন চলে গেছে আকড়া ফটকের কাছে।

সাহা, মল্লিক এসব জমিদার জমিদার বাড়িগুলোতে এখন আর যাওয়া হয় না। তাদের পরিবারের মেয়ে-বৌ রা এখন রেডিমেডের দিকে ঝুঁকেছে। তাছাড়া তারা ছিল জমিদার। পয়সা দিতে কোন দ্বিধা করত না। সে তুলনায় রেডিমেড অনেক সস্তা। এখন যে ব্লাউজের মজুরি ৫০ টাকা তখন ছিল দেড়-দু টাকা। দিনে একটা কারিগর ৬/৭ টা ব্লাউজ করে দিতে পারত। কারিগর রেখে মালিকরা সারা দিনে পেত ৪/৫ টাকা।

তখন সস্তার বাজার ছিল। আমরা পাড়ার ৫/৬ মিলে ফিস্ট করলে চলের দোকান থেকে স্যাম্পল হিসাবে চাল নিতাম। কয়েকটা দোকান ঘুরলেই ৫/৬ জনের মত ফিস্ট হয়ে যেত। মাংস, মশলা এসবও আমরা দোকান থেকে চেয়ে নিতাম।

একটা অর্ডারি কারিগরের এখনকার বাজারে ১০০ টাকা রোজ আছে। তার উপর খাওয়া দাওয়া দেওয়ার আছে। একটা কাজ করলে তাই পোষায় না। কাটিং আছে। যোগাড় আছে। অর্ডারী কারিগর এখন অনেক কমে গেছে। এটা তো ভি(ে করার মতো। বাড়ি বাড়ি যাওয়া। কাজের ত্রুটি হলে ছোটবড় কথা শোনানো। যাদের ছেলেপুলেরা বড় হয়েছে তারা এখন রেডিমেড করে। বিত্রি(হলে হল না হলে নিজের মাল নিজের থাকল।

আমর ছেলেরা এখন লেডিস কাজ করে। বটতলা, রাজাবাগান, বদরতলা এসব জায়গায় লেডিস ফেন্সি আইটেমটা হয়। সন্তোষপুর, বাদামতলা এসব জায়গায় প্যান্ট-শার্ট, পাঞ্জাবী এসব পু(ষ আইটেম হয়। এমব্রয়ডারি সব জায়গাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ওয়াশ মেশিনও ফেলা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়।

UNRECORDED INTERVIEW

মহঃ জাকি(দ্দিন ফকির, আকড়া রোড, পেট্রোল পাম্পের পাশে কাপড়ের দোকানে। ১৩/৩/২০০৫। সন্ধ্যা ৭.০০টা।

আমাদের পূর্বপু(ষ আগে ছিল বদরতলায়, যেখানে বদরপীরের মাজার আছে। ফকিরপাড়ায়। তারা পীরের দরজার দেখাশুনা করতো। সাত পু(ষ আগে সায়ুম ফকির ও কায়ুম ফকির দুই ভাইয়ের মধ্যে পরিবারগত বিরোধ হওয়ায় কায়ুম ফকির চলে এলেন পদীরহীটিতে। কায়ুম ফকিররা গার্ডন তৈরি করতেন।

আমি দীর্ঘদিন টেলার্স ইউনিয়ন করেছি। জ্যোতি বসু ১৯৮৪ সালে রেডিমেড গার্মেন্টস কমপে-ক্স -এর শিলান্যাস করেছিলেন। উলুবেড়িয়া মৌরিগ্রামে হয়ে গেল, আমাদের এখানে হল না কেন? কারণ আমাদের এখানে কিছু বড়ো ব্যবসায়ী চায় না এখানকার দর্জিরা উন্নতি ক(ক। তারা নিজেরা ব্যবসা করছে, মার্কেট তৈরি করছে, স্টল তৈরি করছে, জমি কিনে পমোটারি করে পয়সা কামাচ্ছে। তারা এই শিল্পের উন্নতি চাইছে না। তারা উপরতলার নেতাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে না।

আমাদের বাবার আমলে ৬৮ সাল অবধি ব্যবসাটা একসঙ্গে ছিল। ওরা মারা যেতে যে যার আলাদা আলাদা। জয়নাল আবেদিন ফকির, কাসেম আলি ফকির, মহিউদ্দিন ফকির ছিল তিন ভাই। আলাউদ্দিন ফকির, আলমগীর ফকির। জাহাঙ্গীর ফকিরদের বাবা ছিল জয়নাল আবেদিন, আমার বড়ো জ্যাঠা। আমার বাবার অজন্তা টেলার্স বলে দোকান ছিল বড়বাজারে। যেখানে ... মার্কেট, যেখানে মেটিয়াব্রুজের ট্রাকগুলো দাঁড়ায়, ওখানে। ওখানে শার্ট প্যান্টের কাজ হত। বাবাই ডিজাইন আর

কাটিং করত। তারপর ওই দোকান বিক্রি(হয়ে যায়।

আমার কাপড়ের ট্রেডিং-এর ব্যবসা এখানে। মারোয়ারিদের কাছ থেকে কাপড় কিনে বিক্রি(করি। এদের কাছ থেকে ইম্পোর্ট-এক্সপোর্টের মাল এনে বিক্রি(করি। ইম্পোর্ট-এক্সপোর্ট বলতে কোরিয়া ও চীনের কাপড়, উজ্জ্বল রং, দামও কম। এছানা ম্যানুফ্যাকচারিং-এর কাজও করি। জিন্স, বারমুডার কাজ। কিছুটা বাড়িতে হয়। বাকিটা বাইরে। বাড়িতে লেডিস কারিগরও আছে। বাটা, বজবজ থেকে হিন্দু মেয়েরা আসে। খুব অভাব। ৫০-৬০ টাকা রোজে এসে কাজ করে। কেউ সংসার চালায়, কেউ ছেলেমেয়েদের টিউশনির টাকা জোগায় এই কাজ করে। বটতলার মেয়েরা কাজ করে না।

আমাদের এখানে এক্সপোর্টের কাজ হয় না। সামান্য কিছু বড় ওস্তাগাররা করছে। ওরা এখানকার ব্যবসা নিয়ে সন্তুষ্ট। ওতেই ওদের চলে যাচ্ছে। ওরা বিদেশ পর্যন্ত যাচ্ছে। এখানে মরছে সাধারণ ওস্তাগার আর দর্জিরা। ওইজন্য আমি টেলার্স ইউনিয়ন করতে গিয়েছিলাম। আমি কমিউনিস্ট। গরিব মানুষের উন্নতি আমি চাই। আমি চাই সকলের উন্নতি।

আমি একবার অস্ট্রেলিয়ার একটা অর্ডার পেয়েছিলাম। ত্রিশ-চল্লিশ হাজার প্যান্টের অর্ডার। কিন্তু পরে আর পেলাম না। নিয়মিত অর্ডার না পেলে সেট আপ তৈরি করতে অসুবিধা হয়।

আমাদের পদীরহাটির ওদিকে ৬৫-৬৮ সাল অবধি ধান, পাট চাষ হত। ৭২-এ সি. এম. ডি. এ. একোয়ার করে নিল। বন্ধ হয়ে গেল।

মারোয়ারিরা এখানে ট্রেডিংটা করছে। বড়ো ব্যবসায়ীরা বড়বাজার থেকেই কন্ট্রোল করে। ওরা এখানে আসে না। বিজনেস আমাদের আর ওদের ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি। আমাদের পুঁজি কম। যেবার হাওড়া হাট পুড়ে গেল, তার আগে পর্যন্ত ওরা এখানকার ওস্তাগরদের সাহায্য করেছে। এখনও ক্রে(ডিটে মাল দেয়। তবে এখন একশ্রেণীর ওস্তাগর ক্যাশে মাল কিনছে। তাতে ওদের সুবিধা হয়।

পুরো ব্যবসার ২৫ শতাংশ হচ্ছে হাওড়া হাট থেকে, ৭৫ ভাগ এখানকার হাট থেকে।

নতুন করে ৪/৫ খানা মেশিন নিয়ে ব্যবসা শু(করতে একজন ছেটো ওস্তাগরের ৫ লাখ টাকা লাগবে। মাইনরিটি ডেভেলপমেন্টের ২৫০০০ টাকার সরকারি লোন কোনও কাজে আসবে না।

RECORDED SPEECH

মুরসালিন মোল্লা। বটতলা মোসলিম লাইব্রেরি। মাটির কেল্লা উৎসব উপলে(প্রদত্ত তার ভাষণ। বিষয় দর্জি সমাজ ও সাহিত্য ভাবনা।

মাটির কেল্লাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তারা এরকম একটি বিষয়কে আলোচনার বিষয়বস্তু রেখেছে। দর্জি সমাজ ও সাহিত্য ভাবনা। আমরা যখন কোন সমাজের কথা বলি, সমাজ মানে মা, মাটি, মানুষ। অর্থাৎ দেশ যাকে আমরা বলি, দেশ মানেই তো মাটি। যখন সমাজকে সামনে আনতে হয় তখন ভূমিকে দেখতে হয়। তাই নিয়েই সমাজ। প্রকৃতি, বিত্তবাসী, দর্জি সমাজকে নিয়ে যখন দেখছি তখন আমাদের মাটি কি! এই মহেশতলা, আমরা যার নাম করেছি, আর এই মেটিয়াব্রুজ। এই মাটির মধ্যে শুধু দর্জি নয়, দর্জি একটা বিত্তশীল অংশ। তাদের পরিচর্যর সঙ্গে জীবিকার অঙ্গ হিসেবে বৃত্তি এসেছে। ....সেই জন্য এই সমাজের একটি নির্দিষ্ট বৃত্তিশীল অংশকে আমরা বলছি।

মহেশতলা, মেটিয়াব্রুজ অঞ্চলের বাসিন্দাদের যদি আমরা দেখি, তবে দেখবো—এখানে মেটিয়াব্রুজ ও দিকে গার্ডেনরীচ। যদি পশ্চাৎভূমি ধরি, তাহলে মেটিয়াব্রুজের পিছনে হচ্ছে গার্ডেনরীচগ। গার্ডেন ছিল, রীচও ছিল। রিচ নয় রীচ। আচ্ছা, পায়ে পায়ে এদিয়ে যাচ্ছি। মেটিয়াব্রুজ থেকে এগিয়ে গেলাম আকড়া ফটক। আকড়া ফটক থেকে নদী, নদীর পরে আকড়া, আকড়া থেকে চলে গেলাম মহেশতলা। এগুলোকে যদি বি(-ষণ করা যায়, শব্দগুলোকে ভাঙা যায় তবে দেখা যাবে, এর পিছনে, এই নামকরণের পিছনে ঐতিহাসিক, লৌকিক সাংস্কৃতিক ভাবনা প্রতিটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

গার্ডেনরীচের কথা আপনারা জানেন, ইংরেজ আগমনের পরে....১৯১১-এর আগের কথা বলছি, বৃটিশের দুর্গের চিপ জাস্টিস সুপ্রিমকোর্টের গার্ডেনরীচে তার আবাসস্থল ছিল। ...আমি শুধু ছুঁয়ে যাচ্ছি। ....তারপর নবাবি সময়। ....'বু(জ' মানেই নজরদারি ক(। উপরে নজরদার সৈনিক, তিনি দেখতেন শত্রু কোন পথে আসছেন। এই বু(জটা দাঁড়িয়েছিল মাটির উপর। পুরো প্রাকার বেষ্টিত ছিল। ..প্রাচীন যুগ থেকে। তা কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। তবে প্রধান ফটক ছিল এটাই। জঙ্গলাকীর্ণ জায়গা প্রধান ফটকটা ছিল এটাই। মোঘল ও সুলতান যুগে এই জলপথ তমলুক বিস্তৃত ছিল। .....এই অংশটা বৃহত্তর সুন্দরবনের অংশ ছিল। ডাঁয়-বাঁয়ে সবটাই। এখানে যেসব মানুষেরা সব শ্রমজীবি এবং কক মানুষেরা।

আর একটু গেলে ডানদিকে পড়বে কৃষ(নগর। ভারতীয় সংস্কৃতির চারহাজার বছরের দ্বন্দ্বটা খুব তীব্র তী(ভাবে উঠে

এসেছিল। তারফলে একদিকে ঠুঁটো জগন্নাথ ও অন্যদিকে প্রেমের সাগর, কৃষ(নগর। কৃষ(তত্ত্বের মূল তত্ত্বটাই ছিল রাধা সর্বশক্তি(মান, কৃষ(সর্বশক্তি(মান। এই প্রেমিক অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে কৃষে(র কৃষ(ভাবনা ভারতীয় দর্শনে, এই মাটির মধ্যে জনপদের মধ্যে উঠে এসেছে।

তারপর চলে যান মহেশতলায়। বাবা ভোলানাথ। আরো দূরে যদি এগিয়ে যান তবে দেখবেন চটা। এই বৃহত্তর সুন্দরবনের অংশ চারটে....চট্টো। এই 'চট্টো' শব্দটার বিন্যাস প্রকাশ করে যে সাধারণ ভারতীয় মানুষের মধ্যে তখন বঙ্গ বা বাঙালি অবস্থাটি বেরিয়ে আসেনি, তাদের মধ্যে যে দেবীর পূজোটা চলতো একটা লৌকিক দেবী, এখন কালী বলতে যা বোঝায় তা নয়, একটা লৌকিক দেবী, চট্টোকালী। তা থেকে চটা কালিকাপুর। আমি ইতিহাসের ছায়া ধরে ধরে হাঁটতে হাঁটতে এগুলোকে জোড় দেওয়ার চেষ্টা করেছি। একেবারে নিখুঁত ইতিহাস কিন্তু নেই। আমাদের মহেশতলার অনেক আগে স্বর্গীয় ... ভট্টাচার্য মহেশতলার ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেছিলেন, আমাদের সঙ্গে কিছু আলোচনা হয়েছিল, কিছু মতপার্থক্য ছিল। ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার বা যা কিছু লেখাপত্তর বেরিয়েছে তা দেখতে পারি। এটা একটা অন্য কারণে প্রয়োজন হয়েছিল। ...যে বিবর্তন সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে মাটিকে কেন্দ্র করে, সেটা কি রকম! আমি খুব বেশি দীর্ঘ করছি না, কারণ আমাকে দর্জি প্রসঙ্গে ফিরতে হবে।

.....একদিকে গার্ডেনরীচ মেটিয়াব্রুজ, তারপর আকড়া(আকড়া শব্দটার মধ্যে দিয়ে আকড়া, লাঠিয়াল, কুস্তি। ঠাঙারিদের সময়কাল, পূর্বতম যে দ্বাদশ শতাব্দীর পর বাংলার মানচিত্রে পাহারাদারদের বর্গীদের আত্র(মনের সময়কালে প্রতিরোধের যে ভূমিকা, এক একটা শিবির হিসেবে তখন এই অঞ্চল। মেটিয়াব্রুজকে ধরে একটা জনমতের আকার ধারণ করেছিল। হাজার হাজার বছর ধরে সভ্যতার বিকাশটা ঘটেছিল। .....তো এই সভ্যতার বিকাশটা যখন ঘটছে, তার সঙ্গে সঙ্গে তার আবরনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিবর্তন করেছে তাম্র, প্রস্তরযুগ, মধ্যযুগ অতিত্র(ম করে। তারপর চলে আসছে আধুনিক যুগ। আধুনিক দিক যখন চলে আসছে তখন আসছে কাপড় পরার দিকটা। .....মানুষকে বসন প। সেই কাপড় পরার ব্যপার, দর্জি তার অবস্থানটা এখানে প্রসারিত হয়।

.....এখন এটা তো মাটি। এই মাটিতে মাটির মানুষদের এই জনপদের মানুষদের যারা ভাগিয়ে দিয়েছিলেন তারা তো শুধু বর্গী ছিলেন তা তো নয়। কলু ছিলেন, কামার ছিলেন, ছুতোর ছিলেন। এই জনপদে শুধু দর্জি ছিলেন না। শিল্প বিপ-বের পর ইংরেজরা এলেন। অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষদের একটা বড় অংশ এর সঙ্গে যুক্ত(হয়ে গিয়েছিল।

অর্থাৎ এই ভারতীয় সমাজ। আমরা সবাই ভারতীয়, কি বলবো.....ভারতীয়তার উত্তরসূরী। ধর্মবিবর্তন, হিন্দু ধর্মের বিবর্তন, মুসলমান ধর্মান্তিকরণ যে যাই বলুন না কেন। আমরা এখানে যারা বসে আছি.....আমরা যদি উত্তরপ্রদেশের লখ্নৌতে চলে যাই.....শ্রমভিত্তিক বিভাজনের পরে কোন এক অর্থনৈতিক কারণে.....আমি সে ব্যাপারের মধে যাচ্ছি না। শ্রমের জন্য ভাগ্যরীতি, সাম্যবাদী সমাজে সবাই যুক্ত(, কেউ লাঠি নিয়ে যুক্ত(, কেউ পাথর ভাঙলো—যৌথ সমাজ। সেই সময় যখন ভাগ হয়ে গেল, কেউ বাড়ির কাঠামো তৈরি করবে, কেউ দর্জি হবে, এই ভাগ্যের জন্য শ্রম বিভাজিকা। .....যাক গে, যেটা বলতে চাইছিলাম, তার মানে আমাদের ইতিহাসটাকে বুঝতে হয়।

যতটুকু যতকাল তাকে সাহিত্য আশ্রয় করে বেঁচে থাকে। সেইজন্য কালিদাসের মহাকাব্যে ঢুকতে হয়, সেই জন্য রেখাকরণের সূত্রের মধ্যে দিয়ে তার জীবনের প্রকাশ যা আসছে তাকে নিংড়ে বের করে আনতে হয়। অনুসন্ধিৎসু গবেষক সেই কাজ করছেন এবং বের করে নিয়ে আসছেন।

মহেশতলা কলেজে একটা আলোচনা হয়েছিল। আমি গভর্নিং বডির মেম্বার ছিলাম। তা গবেষক, বি(বিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা বললেন। তো আমি প্র(করলাম, মৃদঙ্গ তো বাজে, মৃদঙ্গ থেকে যে তবলায় রূপান্তরিত হয়ে গেল এই কাল সময়টা কত। আর মৃদঙ্গের আওয়াজ সাহিত্যে কতটা প্রতিফলিত হয়েছে। তো ন্যায়রত্ন বললেন, তার অনেক ডিগ্রী,.....।

তা যাই হোক, আমি মনে করি এই বিবর্তন এই পরিবর্তনের ধারাটি যদি সাহিত্যে প্রতিফলিত না হয় তাহলে এই বিবর্তনের ধারা এই পরিবর্তনের ধারাটি বেঁচে থাকবে না। তাহলে দেশীয় অবস্থানটা কি? সেই সুন্দরবন থেকে শু(করে অষ্টম শতাব্দী হয়ে চলে আসছে সত্যপীড়। একটা লৌকিক অবস্থান। হিন্দু-মুসলমান সব মানুষের জন্য। একটা লৌকিক দ্বন্দ্বের জীবন চলে আসছে। এইটাকেই, সমাজের দর্জি অংশটাকে তুলে ধরতে চাইছি। বৃত্তিগত দিক থেকে একই জায়গায় অনেক মানুষের অবস্থান। যদি চ্যাটার্জি পাড়া, বোষ্টম পাড়া এরকম না দেখে যদি সমগ্র গার্ডেনরীচ, মেটিয়াব্রুজ, মহেশতলা অঞ্চল হিসাবে দেখি.....যদি সামগ্রিক জনসংখ্যার বিস্তারে দেখি তাহলে দেখবো, একটা জনগোষ্ঠী একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তার বৃত্তির সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। আমি সং(প্ত জায়গায় জায়গার মধ্যে দিয়ে আসছি। সব জায়গায় বিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে যে বিবর্তন তা দেখতে হবে।

প্রথমে মেটিয়াব্রুজ দিয়ে শু(করি। তার যে কৌমিক অবস্থান। ধোপাপাড়া(এই নামটা কোথা থেকে উঠে এসেছে? আপনারা কি মনে করেন, এরা ধোপা ছিল?.....কিন্তু ধাওয়া ছিল। এই জনবিন্যাসের নিম্নস্তরের অবস্থানের বিন্যাসে সামাজিক ভাবে একটা বড় অংশকে অচ্ছুত করে রাখা হয়েছে। ধোপা মানে একটা কাপড় কাচা অংশকে বলবেন না। একটা জনগোষ্ঠী।

.....আমি আবার মাটির কাছে চলে আসছি। .....অনেক রকম সংস্কৃতির অবস্থান। আমি একটা উদাহরণ দি। যেমন— আমাদের ভাঙ্গি পাড়া। ভাঙ্গিটা কি। এখনও আছে। সিডিউল কাস্ট। এখন আর সেখানে ভাঙ্গিরা থাকে না। এখন দর্জিরা থাকেন। তো আমরা সমাজটাকে ধরতে চেয়েছি। আমি বলেছি, তারপর আপনারা বলবেন। আমি আলোচনাটাকে একটু স্মুথ করতে চাইছি আরকি। তো এই সমাজটাকে আমরা ধরতে চাই। একটা বিবর্তন হচ্ছে। মেটিয়াব্রুজের সমাজটা যখন আমরা ধরছি দর্জি সমাজ। .....ভাঙ্গিরা সমাজে শ্রমজীবি অংশ। ভাঙ্গিরা ভাং এবং অন্যান্য নেশার দ্রব্য তৈরি করতেন ব্যাপকভাবে। নানা বিবর্তন হয়েছে।

এই যে দর্জি সমাজ মেটিয়াব্রুজ থেকে শু(করে তার যে যাত্রাপথ, তার ভিত ছিল। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পোশাকের বিকাশ হয়েছিল। এ এমন একটা শিল্প যে শিল্পের মৃত্যু নেই। পৃথিবীর বহু প্রয়োজনে নানা জিনিসের অবলুপ্তি ঘটে। আগে লোকে খড়ম পরতো, এখন পরে! আমি একটা জিনিস বলতে চাইছি পৃথিবীর সভ্যতার যে বিকাশ চলছে, আর চলছে বলেই তার নিজস্ব জীবন বোধের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। খড়মকে বাদ দেওয়া গেছে কিন্তু পোশাকরে বাদ দেওয়া যায়নি। তার বিকাশ হচ্ছে। এমন এক বৃত্তি বা শিল্পের সঙ্গে এই কারিগররা জড়িত যেটা ত্র(মবর্ধমান ও বিকাশশীল। আজ থেকে দুশো বছর আগে যে দর্জি সমাজ ছিল, সেখানেই কি দাঁড়িয়ে আছে আজ, না নেই। আমার খুব মনে আছে, বাঙালি বাজারের কাছে আমাদের এক আত্মীয় থাকতেন। বাবার সঙ্গে ছোটবেলায় আসতাম। আমার পিসিমা(বাবা নিয়ে আসতেন সঙ্গে করে, মার সঙ্গেও এসেছি। তো ওর বাড়িতে, আমার যে পিশেমশাই তার বাবা ছিলেন। গু(জন, দাদু ডাকতাম। তা বলতেন কিরে পড়াশোনা করছিস, দর্জি হবি?— তা মেমসাহেবের গাউন তৈরি করতো। তা মেমসাহেবের ঘাড়ে, বুকে হাত দিয়ে তো মাপ নেওয়া যায় না। তা মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলতেন, লিখে নে, ফুট এতো, ছাতি এতো। তা আমি বলতাম তুমি খুব বড় মাস্টার কাটার ছিলে। তা বললো এই সব শিখতে হয়(গু(বিদ্যে। এখন আর কেউ গু(বলে না।

তা আমি বলছি জীবনকে যদি ধরে রাখা যায় তবে আমরা গর্ব করতে পারি। একজন লাস্যময়ী সুন্দরী নারী দাঁড়িয়ে আছেন, আমার সেই বৃদ্ধ ঠাকুরদা তার দিকে তাকিয়ে তার শরীরের মাপ নিচ্ছেন, আমার গল্প বলেই মনে হয়।

তা সাহিত্য(শিল্পচাতুর্য। এই শিল্পচাতুর্যকে ধরে নিয়ে এগোনো। ইংরেজ যদি না আসতো, গাউন যদি তৈরি না হতো কিংবা সালোয়ারের (চি না আসতো.....কারণ শ্রী কৃষ(কীর্ত্তণের নতুন পুঁথি লিখলেন ওয়াজেদ আলি শা। জানেন কিনা জানিনা। ওয়াজিদ আলি শা শুধু নন। পার্শিয়ান সাহিত্যে যে অনুবাদ হয়েছে শ্রী কৃষ(কীর্ত্তণকে ঘিরে। .....লায়লা-মজনু হয়েছে পার্শিয়ান লিটারেচারকে ধরে। আমি আবার একটু সাহিত্যের ভাষার দিকে চলে যাচ্ছি।

তো ওয়াজিদ আলি শা-র কবর, ইমামবাড়ার ভিতর আছে। আপনারা নিশ্চয় সবাই দেখেছেন। দেখেছেন তো! যারা দেখেননি তারা গিয়ে দেখে আসুন। তাহলে সেই ওয়াজিদ আলি শা একটা মূল স্রোতধারার সঙ্গে একটা শাখা যুক্ত(করেছিলেন। তাহলে আপনারা বলবেন লখ্নৌ কি আলাদা ছিল দিল্লি থেকে? লখ্নৌ কি আলাদা ছিল হায়দ্রাবাদ থেকে। যদি বি(-ষণে যাই তাহলে দেখবো এই ধারাটা সম্পূর্ণভাবে চলে এসেছিলো ইরাণ থেকে, তেহেরাণ থেকে। পরে যদি সুযোগ পাই এ ব্যাপারে আলোচনা করা যাবে।

তাহলে আমি দর্জি সমাজের সাছে চলে আসছি, তাহলে আমার দর্জি যে গাউন তৈরি করছেন.....একটা নতুন ধারা মেয়েদের পোশাক তৈরির (ে ত্রে মেটিয়াব্রুজ থেকে বিকাশ হয়েছিল।

আমি উর্দু জানিনা, পার্শি জানি না, সেকালে কিছু উর্দু-পার্শির চর্চা এখানে হয়েছিল। আমি সম্পূর্ণভাবে ভেতো বাঙালি হিসেবে বলছি, এই শি(া হারিয়ে গেল। তারপর চলে আসছি.....এখন যদি মেটিয়াব্রুজের সঙ্গে তুলনা করি, নৃতত্ত্ব। আমি বলছি একেবারে বস্তুজীবন চর্চাকে। পোশাক যার চলমান স্রোত। কিন্তু অন্যরকম। তাকে নিয়েই এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু সেই এগিয়ে যাওয়ার সীমাবদ্ধতা। আমাদের সাহিত্যে সীমাবদ্ধতা থেকেই যাচ্ছে। আচ্ছা দর্জি সমাজ। একটা উদাহরণ বলি, একটা বাড়িতে ঢুকে দেখি একটা সুন্দর কাঠের সিন্দুক আছে। যদি ঠাকুমা বেঁচে থাকেন আমি বলতাম আপামা। তাদের একটা সুন্দর সিন্দুক ছিল। আমার ঠাকর্দা দর্জি ছিলেন। সিন্দুকটা কা(কার্য করা। বললাম, এটা কি আমাদের এখানকার? বলল, না(এটা সিঙ্গাপুর থেকে আনা হয়েছে। তো দেখুন সাহিত্যকে সুন্দর, দীপ্ত, চঞ্চল করে সাজানো হয় তখনই সেটা আমার বলে মনে হয়। তাহলে সিঙ্গাপুরের জীবন চলে আসছে। একটা বৈচিত্রপূর্ণ জীবন প্রকাশিত হয়ে আসছে।

যারা অদর্জি, তাদের বলছি, আমার ঠাকুরমা সাজতেন, আমার মাও সাজতেন। অর্থাৎ অলংকরন। প্রাচীন বাঙলার শ্রমজীবী মানুষের কুলো পেরেকে টাঙানো থাকতো। কুলঙ্গি—সবকিছু। তা আমি বলছি, এটা ঠিক কুলুঙ্গি নয়। কুলুঙ্গি তো আছে তার সঙ্গে কা(কার্যটা জড়িয়েছে। এটা যে মুসলমানরা রাখে তা নয়(আপনি যদি উত্তরপ্রদেশে যান ওখানে ব্রাহ্মণ ভাইরা হাত ধোওয়ার যে জল রাখে সেসব কিন্তু দেখার।

রোমান্টিকতা, সাহিত্যে.....আরও কিছু কাল যাবে। কারণ মুসলমান ধর্ম চলে আসছে। অর্থাৎ সমাজটা বদলাচ্ছে। অর্থাৎ জীবনের পরিত্র(মার সবকটা দিক, এটা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। আমি ছোট ছোট শব্দের মাধ্যমে যদি আকড়া ফটকের দিকে

যাই—'কখন আলে আ', কখন এলে বলবে না। ডাক্ত(ারের কাছে (গি এসেছে তো জিজ্ঞাসা করছে, কখন আলে আ তুমি, ল(্য করেছেন!

আমাদের চলতি জীবনে কোন কালে কিভাবে আমাদের সুখের জীবন বদলে যাচ্ছে। বাংলা দর্জি সমাজে জীবনচর্চার একটা অংশকে। কি! ভাষাতত্ত্বের আরো গভীরে গিয়ে এই নৃতত্ত্বের দিকটা....তাহলে দেখবেন যে এই জনপদ থেকে সরতে সরতে যখন ওয়াজিদ আলি শার আগমন ঘটছে তখন সাহিত্যে অপভ্রংশগুলি বাংলা ব্যকরণে যাকে বলে প্রত্যয় যুক্ত(হয়ে আসছে, তাকে বি(-ষণ করতে হবে। বাংলা ভাষার কথপোকথনে ভাষার মধ্যে ৩৪৭ টি উপভাষা আছে। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ট্রেনে যেতে যেতে একটি মেয়ের কথা শুনেছিলাম। দেখলাম সে বড় অসম্মানের সঙ্গে প্রতিউত্তর দিল। এটা তো একটা বঙ্গের ভাষা। ও হয়তো উপভাষায় বলছে। তার মানে তার সংস্কৃতির মূল মে(দন্ডীয় বাইরেটা চোখে পড়ার মতো। তা নয় কিন্তু(তার নিজস্ব ঐতিহ্য আছে, নিজস্ব ইতিহাস আছে, নিজস্ব সংযোজন আছে। দুটো ভাষার সংযোগ আছে। 'আমি' ছাড়া কখনও 'মুই' শব্দটা ব্যবহার করি না। কিংবা মোর কথাটা কবিতার (ে ত্রে প্রযোজ্য। 'মোদের গাঁয়ে'। এদের অসম্মান করবেন না। কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে, এই প্রে(াপটে 'মোদের' শব্দটা জীবনের অংশ হয়ে যাচ্ছে কিভাবে! বোঝাতে পারলাম কি!

সামনের দিকে যাচ্ছি না, ব্যাখ্যায় যাচ্ছি। একটা হচ্ছে তার পোশাক। মাটির উপর দাঁড়িয়ে। একেবারে প্রথমে যেখানে শু(করেছিলাম। মাটির উপর দাঁড়ানো মানুষ। তা সেই মানুষটা তো কাপড় পরে আছে। তার পোশাক কি, সেই মানুষটার মধ্যে তো কথা আছে, তাহলে তার ভাষাটা কি? সেই মানুষটার লৌকিক জীবনচর্চার মধ্যে দিয়ে যা ফুটে বের হচ্ছে তা ভারতীয় সংস্কৃতি লৌকিক সংস্কৃতির অংশ হয়েছে কিনা!

তো আমি আবার চলে আসছি দর্জি সমাজে। আমি মা-মাটি-মানুষের কথা বলছিলাম। তা আমি ফিরে আসছি দর্জি সমাজে। দর্জি সমাজ এখানে দাঁড়িয়ে আছে—তা তত্ত্বের কথা, সাহিত্যের তত্ত্ব।

তা যেটা বলছিলাম, আমি তো নিজে কমিউনিস্ট স্কোয়ারের লোক। তা জিনিসটা হয়ে গেল, শুধু বস্তুকে যদি বলা যায়, তার সাহিত্য করব, আবার বস্তুকে বাদ দিয়ে, যদি চাঁদের মুখ কে না বলে বলি শুকনো মাটি আর পাথর সেটা সাহিত্য হবে না। তো এই সাহিত্যকে জীবনকে ধরে রাখবার জন্য এখানকার দর্জি যে কথা বলে, গল্প লেখে, প্রবন্ধ লেখে.....আপনি যে শুধু দর্জি নিয়ে লিখবেন তা নয়, আর যেসব মানুষেরা আছে তাদের নিয়ে লিখবেন। দর্জি সমাজ যে যে নিখুঁত ভাবে দেখেছেন, সে সৃষ্টিশীল সাহিত্যে শ্রষ্টা তিনি যদি না লেখেন.....আমি সাহিত্যের তত্ত্বে এসেছি, আঞ্চলিক সাহিত্যে ভাষাগত দিকটা দেখতে হয়। অঞ্চল অবশ্যই থাকবে। আমি শুধু শুদ্ধ বাংলা আর ঢাকাই বাংলা....কবি যদি ঢাকাই বাংলা না লিখতেন তাহলে কি রস সাহিত্যে সৃষ্টি হতো। আমার কথা হল উপভাষাকে যুক্ত(করে নিয়ে।

তারাশঙ্কর আমাদের একটা নতুন জগৎকে চিনিয়ে দেয়। হাঁসুলি বাঁক একটা নতুন জগৎ। আমাদেরও প্রচেষ্টায় সেই মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের এখানে যে মূল জায়গাটা দাঁড়ালো, জীবনকে আমি কিভাবে সাহিত্যের মধ্যে টেনে তুলে আনছি, তা সেই দর্জি সমাজটাকে। একটি নির্দিষ্ট ধারাকে চিহ্নি(ত করতে সেটা দর্জি সমাজ....আমি তাত্ত্বিক আলোচনায় যাচ্ছি না। আমি একটা অন্য জায়গায় যাচ্ছি। তাহলে আমাদের কাজ হলো যে তত্ত্বটা আমাদের সামনে এলো, দর্জি সমাজ আমার চোখে ছোটবেলা থেকে যা ছিল এখন সেই দর্জি সমাজ বদলে গেছে।

যে দলিজ ছিল। একসঙ্গে ১০ টি মেশিন চলছে, একটা মেশিনম্যানের তিনজন সহায়ক কাজ করছেন, শ্রমিক। হাওড়া হাটে কাজ করতে যাচ্ছেন বাবা। ....খুব দ্রুত পট পরিবর্তন হয়ে গেল। এই গত দু-তিনটি বছরে বিরাট পরিবর্তন হলো। শ্রমসত্ত্বার পরিবর্তন হলো। এর আগে একজন শ্রমিক তার একজন বড় ব্যবসায়ী। এখন দেখুন না। হাটের দিনে মেটিয়াব্রুজ রাস্তায় চলা যায় না। কোথায় হাওড়া

হাট, চেতলা হাট। মেটিয়াব্রুজের হাট পরিপূর্ণ হাট। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আপনি দেখবেন, যে মানুষটা বিক্রি(করছে দু-ডজন ফ্রক নিয়ে, বাবাস্যুট নিয়ে সে তার ছেলে মেয়ের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করতে এসেছেন। তার মানে কি আগে শ্রমবিভাজনের একটা অংশ ছিল। দর্জি মানে তার একটা শুধু কাঁচি, একটা আর্ম থাকবে, হাতে লাগানো। কোন কোন দর্জির মেশিন। শুধু শ্রমিক, শুধু দর্জি শ্রমিক। আর একটা জিনিস ছিল—তার সব আছে, আর একটা জোয়ান ব্যাটা আছে। আমি ডাইরেক্ট বলছি, তার জোয়ান ব্যাটা আছে। তার সঙ্গে বসে বাড়িতে একটা মেশিন, তিনজন বসে কাজ করছেন, পেটি ওস্তাগার। আমি যদি একজন কৃষকের সঙ্গে মিলিয়ে বলি, একেবারে ভূমিহীন দিনমজুর। অন্য ওস্তাগারের দলিজে গিয়ে কাজ করছেন। আবার একেবারে ছোট চাষী, একটা মেশিন আছে, আবার ওয়ার্কিং হ্যান্ড আছে। শ্রমিক আছে। কিছু টাকা পেলে ও মেটিয়াব্রুজের হাটে ফুটে বসে বিক্রি(করে ওর ছিটে বেড়ার বাড়িটাকে পাকা করতে পারে।

দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। দেখুন না এই অঞ্চলের রাস্তার দুদিকে অনেক ছিটে বেড়ার বাড়ি ছিল। এখন আছে! তাহলে কি ওরা অনেক টাকা পয়সার মালিক হয়ে গেল। তাহলে এরপরে একটা অংশ আছে। যারা অনেকগুলি মেশিন নিয়ে, অনেক পুঁজি বিনিয়োগ করে বসে আছেন।

তাহলে আর্থিক বিন্যাসটা এইভাবে দাঁড়োচ্ছে, পুঁজিটা ভাঙছে। ছোট ওস্তাগার, ছোট পুঁজি বৃহদাকৃতি ভাবে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। (ুদ্রশিল্পের বিকাশ হচ্ছে। আমরা বামপন্থীরা এসেছি ৭২-এ। অনেক আন্দোলন হয়েছে। এই সমাজ এবং শিল্পটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। এখানে মুসলমানদের ব্যাপার নয়, এখানে দেখাচ্ছে ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমান বেশি। আমার হিন্দুভাই দর্জি আছে। মহেশতলায় আছে। বড় বড় ওস্তাগার আছে হিন্দুভাই। শ্যামবাজারে চলে যান, হালিশহরে চলে যান। আমাকে ইউনিয়ন করতে হয় বলে—আমার দর্জি ভাই। শ্রমজীবি দর্জিভাই। এই পরিচিতিটা এখনও রেখেছে।

আমি বলছি দ্রুত ভাবে পরিবর্তনটা হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা যিনি একদিন বড় ওস্তাগরের দর্জি ছিলেন, আজ তিনি (ুদ্র ব্যবসায়ী। এই পরিবর্তনটা হচ্ছে কেন? মানুষের ত্র(য় (মতা বাড়ছে। মানুষ যদি তার আকাঙ্খিত অবস্থানে পোঁছে যায় তবে তার চাহিদা বাড়বে।

আমাদের ওখানে একটা জায়গা আছে সেখানে যখন যেতাম তখন দেখতাম ওখানে একটাও রেডিমেড গার্মেন্ট দোকান নেই। আর আজ দেখি সেখানে জিন্সের প্যান্ট ঝুলছে। তো যখন বললাম কেমন হচ্ছে? বলে, দা(ণ হচ্ছে। তা বললাম দড়ি টানা প্যান্ট নেই। আপনারা পরেছেন? পাজামার দড়ি লাগানে যেমন হয়। এগুলোকে ইজের প্যান্ট বলা হয়। দড়ি লাগনো প্যান্ট। দড়ি লাগানোর জায়গায় যদি জিন্সের প্যান্টে উত্তরণ হয়—এটা বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিতে আলোচনা করা হচ্ছে।

কি কি কারণে ঘটতে পারে? যে তিনটাকা দিয়ে দড়ি লাগানো প্যান্ট কিনতো, এখন তিনশো টাকা দিয়ে জিন্স কিনছে। চাহিদাটা তৈরি হয়েছে। আগে বলা হত রিক্সাচালকের ছেলে তুই জিন্স কি করে পরবি! অর্থাৎ তার চাহিদাটা বেড়ে গেছে। সে ছেলে বাবার কাছে জিন্স চাইতো না কারণ সে স্কুলে যায়নি। এখন সে ছেলে স্কুলে যাচ্ছে, কলেজে যাচ্ছে, হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করছে। নতুন প্রজন্ম। চাহিদা বেড়েছে। (চি শি(ার সঙ্গে পরিবর্তন হয়ে গেছে। তার ফলে মেটিয়াব্রুজের স্কুল-কলেজের হার সমৃদ্ধ হয়েছে।

আমি বস্তুতান্ত্রিক আর্থিক দ্বন্দ্বগুলির যে পরিবর্তন ঘটেছে তা নিয়ে অনেক ব্যাখ্যা করেছিলাম। শুধু এজন্য বলা, যে রাষ্ট্রের একটা আর্থিক নীতির ফলে শ্রমজীবি মানুষের সহায়ক শক্তি(হয়ে দাঁড়াবে, তা নতুন বাজার সৃষ্টি হবে। যদি বাজার সৃষ্টি হয় সভ্যতা চোখের সামনে দেখতে পায়। একজন মাস্টারের ছেলে দেখতে পায়, হিন্দুর ছেলে দেখতে পায়, মুসলমানের ছেলে দেখতে পায়। দেখতে পায় তার আকঙ্খিত জীবনের স্বপ্নটা অন্যরকম হয়ে গেছে। সেই জন্য খুব দ্রুত হারে পরিবর্তটা হয়ে চলেছে। দর্জি সমাজের কি অবস্থা দাঁড়াবে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টারা দেখতে পায়, আমি বি(াসও করি না। তবে সম্পদটা কঠিন। এই মায়ায় রাখতে হবে। এই শ্রমজীবি মানুষেরা নিজের উদ্যোগে দাঁড়ানো যে স্তরটা চলে গেল, সেই দর্জি সমাজ তার তৈরি বাজারের উপর নির্ভর করে স্বচ্ছল হলো, স্বচ্ছল হওয়া মানে এই নয় যে বিরাট কিছু তা নয়, স্বচ্ছল মানে আগে খেতে পেতো না, দড়ির প্যান্ট পরতো, এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

তাহলে তার এই বাজার থাকবে, না থাকবে না? তার এই কৃতকৌশল, তার এই মুন্সিয়ানা, শিল্পের মুন্সিয়ানা থাকবে কি থাকবে না? তাহলে সম্পদটা চিহ্নি(ত করছি—তার শিল্পের মুন্সিয়ানা প্রতিযোগিতার বাজারে দাঁড়াবে কিনা। তার নিজস্ব আর্থিক বানিজ্যিক বিন্যাস সাজানো, যেটা সে চালিয়ে আসছে, সেটা থাকবে কি থাকবে না!

খুব দ্রুত হয়তো একদিকে ধস নেমে গেল। কারণ সমস্ত ইউরোপীয় বাণিজ্য শিল্পটাকে, (ুদ্র শিল্পটাকে ভেঙে বৃহত্তর বাণিজ্য বনেটে দাঁড় করাতে চাইছে। মূল আর্থিক কাঠামোটা যদি ঘুরে যায় সঙ্কটটা চলে আসবে। তখন এতগুলো একতন্ত্র বাজারে এই (ুদ্র শিল্পের দর্জির পসরা সেখানে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না। আপনি আমি যে জামাটা পরে আছি সেটা একটা মেশিনে সাতটা সেলাই হয়ে চলে আসবে, একসঙ্গে। একটা সুতোও উঠবে না, একটা মেশিনের মধ্যে দিয়ে টানটান করে সুন্দর ভাবে সব কিছু হয়ে যাবে।

তাহলে যে সঙ্কটটা তৈরি হচ্ছে, এখানে যে ৪৭ টি পত্র-পত্রিকা আছে তার লেখককে, সম্পাদককে, প্রবন্ধকারকে, ছোট গল্পকারকে এই সঙ্কটের আঁচ থেকে, ওম থেকে দূরে থাকলে চলবে না। আমার মনে হয়েছে এটা যদি বাঁচাতে হয় সমস্ত জীবনের সঙ্কট থেকে বাঁচতে হয়, শ্রমিকের সঙ্কটকে বাঁচানোর জন্য অনেক কিছু হচ্ছে, সেটা শ্রমজীবী মানুষের যে (ে ত্র সেখানে সেটা হচ্ছে। আমাদের এখানে দদি এটার বি(দ্ধে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা, আমি বুদ্ধিজীবীরাই বলছি, খুব গর্বের সঙ্গে বলছি, যারা লিখছেন, অনেক কষ্ট করে সাদা পাতায় ছোট ছোট অ(রগুলি সাজিয়ে....এই যে প্রতিচ্ছবি সাজিয়ে তুলছেন তাদের এই প্রচেষ্টাকে ছোট করে দেখার কোন কারণ নেই।

এখানে ক'জন থাকলো সেটা কোন ব্যাপার নয়। আমি ভেবেছিলাম দশ জনের কম থাকবে। কিন্তু এখানে মনে হয় দশ জনের বেশি আছে।

আমি সঙ্কটটা বললাম, মানুষটা বললাম, তাহলে এর ল(্যটা কি? কিভাবে আমরা এগোতে পারি। শুধু দর্জি সমাজ নয়, সব সমাজের জন্য শি(ার প্রসারটা ভীষণরকম প্রয়োজন। যদি শি(ার প্রসারটা ঘটে যায় তবে সমাজটি সিঁড়িটা পেয়ে যাবে। উত্তোরনের সিঁড়িটা। না, আয়োজন তার চাই।

আবার যদি দেখি এই লাইব্রেরিটা একটা অঙ্গ। এখানে আর একটা লাইব্রেরি আছে আকড়া লাইব্রেরি। তো এরা নিষ্ঠার সঙ্গে ভালোবাসায় একটু একটু করে লাইব্রেরিটা গড়ে তুলেছে। আমাদের শি(া বেড়েছে, আমাদের এলাকায় স্কুল বেড়েছে। হায়ার সেকেন্ডাকি স্কুল বেড়েছে, কলেজ বেড়েছে। সেখানে স্নাতক এবং সাম্মানিক স্নাতক স্তর যুক্ত(হয়েছে। তাহলে কি আমাদের ঐতিহ্য একেবারে শূণ্য নয়(এক। দুই যে আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে যে সমাজকে ধরবো। যাদের নিয়ে আয়োজন আমরা আহ্বান জানাবো, তাদের জন্য। কারণ তাদের টেনে আনবার কাজটা আমাদের করতে হবে। একরাশ লাল পিঁপড়ে কামড়ালে যেমন যন্ত্রনা হয়, দেখবেন একরাশ লাল পিঁপড়ে যখন এগিয়ে চলে কবিতার মতো তখন যেমন মিষ্টি গন্ধ বের হয় তেমনি কামড়ালে একটা যন্ত্রনাও হয়, চিনচিনে একটা যন্ত্রনা, সেই যন্ত্রনায় অস্থির সবাই। আমি তার ভাষাটা নিচ্ছি। আচ্ছা আমাদের এই সমাজকে ধরে যদি এগোতে হয়, তাহলে মেয়েদের দর্জি সমাজ, আমি আবার চলে আসছি। দর্জি সমাজের অংশ যে মেয়েরা আছে তাদের শি(া এগোচ্ছে, সভ্যতা এগোচ্ছে। অনেকে বোম্বে যাচ্ছে। কথায় বলে না ছেলেটা বোম্বেটে হয়েছে।

যেমন সংস্কৃতিকে ধরে সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে। কিন্তু আমেরিকানরা পারেনি। আমাদের এখানে তেমনি শি(ার প্রসার ঘটেছে কিন্তু সংস্কৃতির বিকাশটা খুব দরকার, দর্জি সমাজের সংস্কৃতির বিকাশ। যদি বামুনপাড়া না এগোয় তাহলে বামুনপাড়ার ছেলে এগোবে না। যদি ধোপা পাড়া না এগোয় তবে তার ছেলেকে কাপড় ধুয়ে যেতে হবে। সেই জন্য বলছি, এই নতুন উৎস মুখের সন্ধানটা করতে হবে। সাংস্কৃতির উত্তরনের কথা বলছি। সেটা শুধু লেখাপড়া জানার বিষয় নয়। বটতলা, বদরতলা সব স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে সাংস্কৃতিক উৎসবের জায়গায় দাঁড়িয়ে যাওয়া। এই উৎসবের সন্ধানটা আমাদের করে যেতে হবে।

তাই ৪৭ টি পত্রিকার কাছে আবার আমার প্রস্তাব, সব পত্রিকা প্রকাশিত হবার পরে তাদের সম্পাদকমন্ডলি বসে সব প্রত্রিকা পড়ার একটা আয়োজন করা। সব লেখা পড়া হোক। সবকটি সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক সবাইকে ডেকে আম রা আলোচন করি। কতটা ভালোহল! না, আমাদের প্রাতস্মরনীয় সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাদের মূল্যায়ন করা নয়। যারা লিখছে তারা নতুন, এমনি করেই তারা লিখবে।

কবিতার মানদন্ডে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের কাছাকাীছি কতটা গেল কতটা গেল না সেটা পরের কথা(যাই লিখুক, ওরা লিখছে। ওরা সৃষ্টিশীল ওরা স্রষ্টা।

তাই আমরা ৪৭টি পত্রিকার সব লেখা পড়ে একটা উৎসমুখের সন্ধানে যেতে পারবো। .....আমরা চাইছি যেটা, এখানে শি(ত ছেলেরা তারা শুধু মুসলমান নয়, ধর্মের দিক থেকে মুসলিম একটা বড় অংশ কিন্তু সব ছেলেরা যাতে এই ব্যবসায় এগিয়ে আসতে পারে। যেটা বলার, আমাদের এখান থেকে দঃ পূর্ব এশিয়া, ইউরোপে পোশাক শিল্প বাইরে যাবার কথা আছে। কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবার জন্য যে প্রোফেসনালিজম অর্থাৎ যে মুন্সিয়ানা, পেশাদারিত্বের দরকার, যদি আমরা তা গ্রহণ করতে না পারি, পেশাদারিত্বে উত্তীর্ণ হতে না পারি তবে আমরা ওদের সঙ্গে পেরে উঠবো না। তো নতুন গড়ে ওঠা তামিলনাড়ু, কর্ণাটক এবং এই জায়গাটা। এখানে যারা এই কাজ করতে আসছে তারা বি. এস. সি. পাশ করে ডিগ্রি কোর্স করতে আসছে।

আমি আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমার গর্ব ছিল দর্জি পরিবারের সন্তান বলে। আমি নিজের হতে কেটেছি, হাটে বসেছি। তো আমাদের সেত্রে(টারি আমাকে পাঠালেন টাটা সেন্টারে। তো আমি এখানকার মাষ্টার কাটারকে দিয়ে একটা কোট বানিয়ে নিয়ে গেলাম। তো ভদ্রমহিলা অল্পবয়েসী। তিনি ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ভালো করে দেখে বললেন যে, দেখুন, তো আমি দেখলাম কোটের সবকিছু, ঠিক আছে শুধু এক জায়গায় সুতোটা একটু উঠে আছে। মাঝে সুতোটা ওখানে ফুরিয়ে গিয়েছিল। তা আমি আবার দ্বিতীয়বার সেটা ঠিক করে নিয়ে গেলাম তখন আবার সেই গ্লাস দিয়ে দেখে বলল, দেখুন, এখন দেখলাম যে ওই জায়গায় চাপার ফলে শুধু বুড়ো আঙুলের একটা দাগ পড়ে। আমি শুধু তাকে বললাম সত্য, আপনি ঠিকই দেখেছেন। তা আমি যে সমাজের কথাটা বলতে চাইছিলাম আমার অহংকার ভেঙে গিয়ে মনে হয়েছিল, আমাদের নতুন প্রজন্মকে সঙ্কটের মোকাবিলায় এদের সঙ্গে দাঁড়াবার জন্য যোগ্য হতে হবে। ...

UNRECORDED INTERVIEW

মুস্তাফিজুর রহমান। ত(ণ উদ্যোগী। কথা হচ্ছিল তার সঙ্গে আয়রন গেটের তার শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ওয়ার্কশপে বসে। ২২/২/২০০৫। মঙ্গলবার, সকাল ৯.৪৫ নাগাদ। বিরাট এক বিদেশি মেশিন, চারিদিকে রঙীন সুতোর রিল। একধারে কম্পিউটার, সাদা উজ্জ্বল আলো সারা ঘরময়। কম্পিউটারের পর্দায় রঙিন নকশা। চা খেতে খেতে শু(হল কথোপকথন।

—আপনি মূলত কি ধরণের কাজ করেন?

—এমব্রয়ডারির কাজ।

—কিসের উপর এমব্রয়ডারি করেন?

—সবরকম। ছোট গেঞ্জি, জিনসের পোশাক, শাড়ি সবরকমই।

—সবটাই কি মেশিনে?

—সবটাই। হাতে করার দিন চলে গেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে হাতে করা জিনিসের আর তেমন বাজার নেই। এইই ধরণের মেশিনে সব কাজ হচ্ছে।(মেশিনের দিকে আঙুল দিয়ে)।

—এই মেশিনটা কি বিদেশি মেশিন?

—হ্যাঁ, জাপানি।

—এই মেশিন কি এই এলাকায় শুধু আপনারই আছে?

—না, আরো কয়েকজনের আছে। সব মিলিয়ে মেটিয়াব্রুজ অঞ্চলে ২০ টি এই ধরণের মেশিন আছে। তবে সারা কলকাতায় অনেক আছে। বর্তমানে যা বাজার তাতে, মানে আন্তর্জাতিক বাজার তাতে ২০ শতাংশ কাজ হচ্ছে হাতে, বাকি ৮০ শতাংশ হচ্ছে মেশিনে।

—এই মেশিনে কাজ করার জন্য কি বিশেষ কোন ট্রেনিং এর প্রয়োজন?

—আমার কিছুই নেই। আমি সবটাই নিজে শিখেছি। আমি পড়াশোনায় খুব ভাল ছিলাম না। বি. কম. গ্র্যাজুয়েট। কিন্তু বিভিন্ন রকম হাতের কাজে খুব আগ্রহ ছিল। একসময় দাদার কোম্পানিতে কাজ করতাম। ওয়েলডিং এর কাজ জানি। অনেকে এসে বলে কাজ শেখাবার জন্য। কিন্তু সে সময় নেই।

—আপনার দাদা কি ইঞ্জিনিয়ার?

—মেকানিক্যাল।

—এই যে কম্পিউটারে ডিজাইন করছেন, সেটা নিশ্চই শিখেছেন?

—না তাও না। সেটাও আমার নিজের।

—আপনার এখানে কজন কর্মী আছে?

—মোট চার জন। দু-শিফটে কাজ হয়।

—কবে বন্ধ থাকে?

—আমাদের কোন ছুটি নেই। যেদিন মনে হয় ছুটি দরকার, সেদিনকে নিয়েনি।

—এই মেশিনটার দাম কত?

—তিন ধরণের আছে?

—জার্মানির দাম ৪০ ল(, জাপানিটার দাম ৩২ ল(, চাইনিসটার দাম ১৪ ল(। আমারটা জাপানি, মোটামুটি ২৭ ল(দাম।

—এটার জন্য কি জাপানে যেতে হয়েছিল?

—না এখানে এজেন্ট আছে। দিল্লিতে, ওদের মাধ্যমেই কেনা যায়।

—কি নাম মেশিনটার?

—এটা হচ্ছে মাল্টি হেড এমব্রয়ডারি মেশিন। কোম্পানির নাম JAILUN.

—এর কেপাসিটি কেমন?

—এর বিভিন্ন কম্বিনেশন আছে। সবচাইতে বেশি ৪৪ রকমের।

—এটা ছাড়া আপনার আর কোন অফিস আছে?

—হ্যাঁ, ভবানীপুরে।

—আপনার টার্ন ওভার কেমন মাসিক? মোটামুটি একচা ফিগার আর কি.....

—সেটা তো পরিস্কার করে কোন ব্যবসায়ী বলবে না। ধ(ন ৬০০০০ প্রতিমাসে।

—সেলাইয়ের এই যে সুতো, এর খরচ তো আপনার?

—হ্যাঁ।

—কিরকম খরচ?

—মোটামুটি ১৫ শতাংশ টোটাল টার্ন ওভারের উপর।

—অন্যান্য যে বিভিন্ন খরচ, ব্যবসা চালাতে তা কিরকম?

—৩৫ শতাংশ টোটাল টার্ন ওভারের।

—আপনি যে মালটা সেলাই করেন(এমব্রয়ডারি) সে মালটা কোথায় বিত্রি(হয়?

—মূলত দুবাই।

—আপনি যার কাজ করেন তিনি কি মুসলিম ভাই?

—না, মারোয়ারি। বড়বাজারের। অন্যান্য কিছু ক্লাইন্টও আছে।

—মেটিয়াব্রুজে কারোর কাজ করেন না?

—শেষ তিনমাস আমি মেটিয়াব্রুজের কাজ করেছি। তবে এখানে কাজ করে সারা বছর খাওয়া যায় না। এখানে বাকি যারা আছে তাদের চলবে। কিন্তু আমাদের চলবে না। আমাদের তো কারখানা চালাতে হয়। এতোগুলো মানুষকে রেখে। তাছাড়া অন্যান্য কয়েকটা কনসার্নে আমি ডিজাইন দিই।

—সেখানে কি আপনি পার্টনার?

—না কমিশন বেসিস কাজ করি।

—আপনার এই শ্রম-প্রত্রি(য়াটা কিরকম? প্রথমে কি থান....তারপর?

—প্রথমে থান, তারপর থানটা কাটিং হয়, তারপর চলে আসে এমব্রয়ডারির জন্য। এমব্রয়ডারির পর স্টিচিং এবং সবশেষে প্যাকিং। যদি এমব্রয়ডারি না হয় তাহলে সরাসরি স্টিচিং এ চলে যাবে।

—এই শ্রম প্রত্রি(য়ার যে ব্যাপারটা এর আদান-প্রদানটা কিরকম? মানে আমি বলতে চাইছি এই যে এই যে থানটা কাটিং হচ্ছে তারপর এমব্রয়ডারি....এই যে এক জায়গা হতে আর একটা জায়গায় মালটা হাতবদল হচ্ছে এ দায়িত্ব কার?

—এটা যে মূল ব্যবসায়ী তার। আমি মালটা এমব্রয়ডারি করে তার ঘরে পাঠিয়ে দি, তারপর তিনি যা করেন।

—পাঠানোর খরচ কার?

—অবশ্যই আমার। তবে কিছু কিছু (ে ত্রে ওরাও কিছু দেয়।

—থানটা কতরকমের হয়?

—গেঞ্জি, জিনস, জর্জেট।

—এগুলো কোথায় তৈরি হয়?

—গেঞ্জি থান তৈরি হয় লুধিয়ানা, বোম্বে। জিনস সরাটে, জর্জেট মহারাষ্ট্রে, বোম্বের আশেপাশে।

—সুতো আপনারা কোথা থেকে কেনেন?

—সুতোটা আসে মূলত বোম্বে থেকে। তবে লোকালও আছে। তবে মান ভালো না।

—রং অনুযায়ী কি সুতোর দামের হেরফের হয়?

—না।

—সুতোর দাম কি রকম?

—৫০০ মিটার সুতো ১০ টাকা, আর লোকালটা ২০০০ মিটার ৩২ টাকা। কাঁচা সুতোয় আমাদের কোন কাজ হয়না।

—এই যে মালটা তৈরি হচ্ছে এর বেশির ভাগটাই দুবাই যাচ্ছে। ত্রে(তারা কি সবাই ওখানকার?

—অধিকাংশই। তবে সবাই নয়। কারণ দুবাই হচ্ছে মিডল ইষ্টের একটা কেন্দ্র। সেখান থেকে মাল যাচ্ছে সমগ্র আরব দুনিয়া, সাউথ আফ্রিকা, কেনিয়া বিভিন্ন দেশে।

—আপনি যে ডিজাইন করেন, কিসের ভিত্তিতে, মূল ডিজাইনটা কোথা থেকে আসছে?

—ডিজাইনের ব্যাপারে একটা গাইডলাইন ব্যবসায়ীরা দিয়ে দেয়। যেটা মূলত বাজার খায় তার ভিত্তিতে। (একটা ছোট গেঞ্জি দেখিয়ে) যেমন-এই গেঞ্জিটা খোদ আমেরিকার, ডিজনি কোম্পানির। ওখানে দাম মোটামুটি ৬০ ডলার। এখানকার ব্যবসায়ী ৬০ ডলার দিয়ে ওটা আনিয়েছে। এর উপর ভিত্তি করেই ডিজাইনটা হবে।

—শ্রম প্রত্রি(য়ার যে ব্যাপারটা থান, সেখান থেকে কাটিং—এমব্রয়ডারি—স্টিচিং এবং প্যাকিং—এই ব্যাপারটা কতদিন ধরে হয়?

—মূলত একমাস। তবে সেটা ব্যবসায়ির উপর এবং পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কেউ যদি অল্পমাল চায় তবে সেটা ১৫

দিনের মধ্যেও হতে পারে আবার এক সপ্তাহেও হতে পারে। মালের পরিমাণ বেশি হলে একমাসের বেশিও হতে পারে।

—এখানে যে মাল বিত্রি(তা কি হয় মান কি পূজো, ঈদ বা অন্য কোন পরবের সময় দাম ও মানের হেরফের হয়?

—দামের তেমন হেরফের হয় না। তবে ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং যে সব মাল সারা বছর বিত্রি(না হয়ে পড়ে থাকে তা পূজোর সময় বেরিয়ে যায়। ব্যবসায়িরা বলে, ভাই সাব তোমার পাশ যো মাল হ্যায় সব ভেজ দো।—ডিজাইনের যে ব্যাপারটা সেটা নিশ্চই রাজ্যের ভিত্তিতে, বলতে গেলে কমিউনিটির ভিত্তিতে নিশ্চয় হেরফের হয়। বাঙালি যে ডিজাইনটা পছন্দ করে গোয়ানিজরা নিশ্চয় সে ডিজাইনটা পছন্দ করবে না। কিংবা মরসুমের ব্যাপারটা, এখানে যেমন পূজোটা প্রধান উৎসব, কেরলে নিশ্চয় সেটা নয়, সেখানে ওনাম, সময়টাও বদলে যায়।

—একেবারেই ঠিক। রাজ্য অনুযায়ী ডিজাইন বদলে যায়। মরসুমও বটে। যেমন দ(ি ণে মইল উৎসব। মূলত পূজোর পরে সেই কাজটা শু(হয়। পূজোর সময় ওখানে তেমন কাজ থাকে না।

—কাটিং, স্টিচিং বা পুরো শ্রম প্রত্রি(য়া এইটা কি পুরোটাই মুসলিম ভাইদের দ্বারা হয়?

—মূলত। তবে অন্যরাও আছেন। হিন্দুরাও যথেষ্ট এই কাজের সঙ্গে যুত্ত(হয়েছেন।

—হিন্দুরা কোন অঞ্চলের?

—পাতিপুকুর, বারাসাত, মধ্যমগ্রাম। দা(ন কারিগর তারা।

—তারা কি সবাই হিন্দু?

—হ্যাঁ, ইষ্ট-বেঙ্গলের।

—আপনি একটু আগে বললেন, মেটিয়াব্রুজে কাজ করে সারা বছর চলে না, কেন?

—মেটিয়াব্রুজে ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ। আপনি জানেন এখানে একটা দর্জি পূজোর দু-আড়াই মাস কাজ করে ৩৫-৪০ হাজার টাকা আয় করে। কিন্তু পূজোর পর কাজে লাগতে ওদের আরো পাঁচ মাস সময় লাগে।

—কেন?

—ওই যে টাকাটা পেয়েছে ওটা বসে খাচ্ছে। যতদিন না ওটা ফুরোচ্ছে ততদিন চলুক। ওটা শেষ হলে যখন আর কিছু হাতে থাকেবে না তখন আসবে।

—এখন এখানে ব্যবসা কিরকম?

—অবস্থা খুব খারাপ। আগামী ৭-৮ বছরের মধ্যে মেটিয়াব্রুজে এই ব্যবসা একেবারে শেষ হয়ে যাবে।

—এর প্রধান কারণটা কি?

—এরা এখনও সেই অতীতেই পড়ে আছে। এরা যে ভাবে কাজ করছে ওই পা মেশিনে তা আর আন্তর্জাতিক বাজারে চলছে না। প্রতিযোগিতায় এরা কিছুতেই পারবে না।

—আমরা শুনছি আপনিও বললেন ইষ্ট-বেঙ্গলের কারিগররা ভালো কাজ করছেন। তাহলে কি ওরাই বাজারটা ধরে নিচ্ছে। এটা কি করে হল?

—ওরা একটা বড় অংশ ধরে নিয়েছে। এবং এর জন্য এরাই দায়ি। এরা এতো মান নামিয়ে ফেলেছিল যে ওরা কাজটা ধরে ফেললো।

—তাহলে কি এখানকার ব্যবসাটা অন্যদের হাতে চলে যাচ্ছে?

—অবশ্যই মারোয়ারিদের হাতে। এবং মারোয়ারিদের এরাই ডেকে এনেছে। আমার বাবা একবার বলেছিল যে এটা তোমরা ভুল করলে। তখন এরা শোনেনি। আপনি দেখুন একাজে যে সব মারোয়ারিরা হাটে বসছে তাদের প্রত্যেকের একটা করে দোকান আছে বড়বাজারে, প্রত্যেকের। একটা সময় এরা যেত বড়বাজারে কাজ করতে। তারপর এরাই ওদের বলে মেটিয়াব্রুজে দোকান দিতে। ওদের তো আর পয়সার অভাব নেই, ওরা বললো, চলো ভাই কহি বাদ নেহি। ব্যস ওরা এসে এখানে বসলো।

—এখানকার দর্জিদের এই যে ভুল স্টেপ আউট তার জন্য কি শি(টাই দায়ি। এই ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারেনি?

—অবশ্যই। এদের তো শি(া বলে কিছু নেই। নেবারও চেষ্টা করে না। এরা এতো বোকা। এদের কথা ভাবলে আমাদের নিজেদের লজ্জা লাগে। আপনি জানেন, এদের ব্যবসায় লেখা জোখার কোন ব্যাপার নেই। সব কাঁচা টাকার ব্যাপার।

—কাঁচা টাকার ব্যপারটা কিরকম?

—কোন লিখিত লেনদেন হয়না। মুখে মুখে লাখ লাখ টাকার ব্যবসা হচ্ছে। এদের না আছে ব্যবসায়িক কাগজপত্র না লাইসেন্স, না কোন ইন্সিওরেন্স। যতদিন বাবা কাজ করছে, সবাই খাচ্ছে-দাচ্ছে। বাবাও মরলো, ব্যবসাও উঠলো। দুটো বউ নটা বাচ্চা ভি(া করতে বের হল।

—কিন্তু এর মধ্যেও তো অনেকে বাড়ি গাড়ি করছে?

—করছে। যারা মহাজনের পয়সা মারতে পারছে। তারা পয়সা মেরে রাতারাতি বাড়ি করছে, গাড়ি কিনছে।

—পয়সা মারাটা কিরকম?

—মহাজনদের কাছ থেকে টাকা নিল, লেখাপড়া তো কিছু নেই। কাঁচা পয়সার ব্যাপার। তারপর আর দিল না। দিতে পারছি না....

—মহাজন কোন লিগ্যাল স্টেপ নেয় না?

—কি করে নেবে, সেও তো টাকা করছে ওই ভাবেই। তারও তো দু-নম্বরি আছে। জানাতে গেলে তা তারটাও বেরিয়ে যাবে।

তাছাড়া সেও জানে এদের ছাড়া তার ব্যবসা চলবে না। তাহলে আপনাকে একটা ঘটনা বলি, আমাদের স্কুলেই তার ছেলে পড়ে, বেলাল ওস্তাগর। সে তিন কোটি টাকা দিয়ে বাড়ি করেছে। রেললাইনের কাছে। তার যে জানলা কপাট করেছে সে আমার জানাশোনা, সে বললো ওই বাড়িতে শুধু দরজা আছে ৭২ টি। তারপর গাড়ি কিনেছে। কাঁচাটাকা যা পেয়েছিল সব ওই বাড়ি-গাড়িতেই লাগিয়েছে। এবার কোন এক জায়গায় বেশ অনেকটা মাল দেবার ছিল। এতো সব মাল বানিয়ে ফেলেছে। যখন দিতে গেল তখন ব্যবসায়ী বলছে অর্ডারটা বাতিল হয়ে গেছে। সব মাল এখন ওর বাড়িতে পড়ে আছে। এখন ওর এমন অবস্থা যে দু ছেলের স্কুলে মাইনে দিতে পারছে না। গাড়ি বেচে দিয়েছে। তিন কোটি টাকার বাড়িটা আছে।

—বাড়িটা বেচেনি?

—কি করে বেচবে, কে কিনবে ওত দামের বাড়ি। বাড়ি মানে তো সেই গলির ভেতর, মা(তি ৮০০ ছাড়া কিছুই সেখানে ঢুকবে না। পড়ে আছে।

—এই বেলাল ওই ব্যবসায়ীর উপর কোন লিগ্যাল স্টেপ নিতে পারছে না?

—কি করে নেবে। কোনও লিখিত চুক্তি(তো হয়নি। সে ফোনে বলেছে। এ সঙ্গে সঙ্গে মাল বানাতে শু(করে দিয়েছে। লেখা-জোখা তো কিছু নেই।

—এখানে একটা মেমবার অফ কমার্স আছে বলে শুনেছি। তারা কি এ শিল্পের উন্নতির জন্য কিছু করছে?

—খুব বড় সড় একটা গালভরা নাম আছে বটে, তাদের কাজ হলো কেউ যদি টাকা মেরে দেয় তবে তারা গিয়ে শালিসী করে ওই টাকাটা আদায় করার চেষ্টা করে। এর বেশি কিছু এরা করেনা।

—লেখাপড়া শেখার যে ব্যপারটা বললেন, দর্জি তো লেখাপড়া তেমন জানে না, মারোয়ারিরা যারা তারা কি জানে?

—তারাও জানে না, কিন্তু ব্যবসায়ের ব্যাপারে যে চুক্তি(বা কাগজপত্র রাখা সেটা তারা রাখে, বা জানে।

—আপনাদের তো একটা স্কুল আছে। দর্জি বাড়ির ছেলেরা সেখানে পড়তে আসে?

—খুব কম।

—তারা পড়াশুনোটা ছাড়ছে কোন সময়ে?

—ম্যাকসিমাম সেভেন বা এইট অবধি। তারপর তো ছেলে লায়েক হয়ে গেলো। বাবা বাইক কিনে দিল। মেটিয়াব্রুজে যে বাইক-স্কুটার চলে তার অধিকাংশই কোন লাইসেন্স নেই। বাবা রোজগার করে পয়সা করছে। ছেলেও তার পাশে পাশে বাবাকে সাহায্য করছে। সপ্তাহের শেষে মঙ্গলবার বাবা সবাইকে টাকা দিচ্ছে। ছেলেকেও দুহাজার টাকা দিল। তারপর আর বাবা খোঁজও নিল না ছেলে কোথায় কি ভাবে সে টাকা খরচ করছে। ছেলে যেখানে যেখানে সে টাকা খরচ করা যায় করে চলে আসছে। এই হচ্ছে অবস্থা।

—দর্জিরা তো ছেলেমেয়েদের তেমন শি(া দিচ্ছে না, কিন্তু মারোয়ারিরা কি তাদের ছেলেমেয়েদের তৈরি করছে?

—অবশ্যই। আপনি দেখুন না, তাদের ছেলেমেয়েরা কেউ সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ছে, কেউ জয়পুরিয়ায়। সি. এ. করছে, কস্টিং পড়ছে। মুসলিম মেয়েদের কথা তো জানেন, ১৪-১৫ মানেই সে বিয়ের উপযুক্ত(। তবে নেকস্ট জেনারেশন, মানে আমাদের যে জেনারেশন তার কিছুটা চেষ্টা করছে তাদের ছেলেমেয়েদের। তবে মারোয়ারিদের ছেলেমেয়েরা ভীষণ স্মার্ট, তাদের কাছে এরা দাঁড়াতে পারবে না।

—অবাঙালিরা বলতে শুধু মারোয়ারিরাই এ ব্যবসাটা করছে?

—না সিন্ধীরাও ভীষণ রকম এগিয়ে আসছে। ওরাও ভালো ব্যবসা করছে।

—এখানে অনেকে নাকি এই দর্জি ব্যবসায় অনেক টাকা পয়সা করে এখন অন্য ব্যবসায় টাকা লাগাচ্ছে। কেউ কেউ নাকি দুবাই তে হোটেল খুলছে?

—আপনি যাদের কথা বলছেন বুঝতে পেরেছি। আলমগীর ফকিররা দুবাইতে হোটেল খুলেছে সেটা আমার পুরোপুরি সত্যি কিন জানা নেই। তবে ওদের আসল ব্যবসা ছিল রিয়েল এস্টেটের। ওই অঞ্চলের বহু জমি ওরা কেনা বেচা করেছে, তাতেই ওরা মূল টাকাটা বানিয়েছে। তবে আজ ওরা অনেক দূর চলে গেছে। রাজনৈতিক (মতাও আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

—ওরা কি ওই অঞ্চলেরই লোক?

—হ্যাঁ ওখানকারই।

—মেটিয়াব্রুজ অঞ্চলে পুরোনো জামাকাপড়ের একটা ব্যবসা আছে। মানে যেটাকে কেটে নতুন জিনিস তৈরি। অর্থাৎ র মেটেরিয়াল হিসাবে ওই পুরোনো গেঞ্জি বা জামাটা ব্যবহৃত হয়, এটা আমি শুনেছি?

—একেবারেই ঠিক শুনেছেন। আমি আপনাকে বলছি—এটাও করতো ওই আলমগীর ফকিররা। মল্লিকবাজারের পিছনে যান, দেখবেন স্তুপাকার করা পুরোনো জামাকাপড় বিক্রি(হচ্ছে। আসলে এই জামাকাপড়গুলো আসে বিদেশ থেকে, বিভিন্ন এন. জি. ও. গুলোতে পাঠাতে হয়। সেখান থেকেই এগুলো বিলি না করে সরিয়ে নেওয়া হয়। এক ধরণের মানুষ এর পিছনে থাকে। আপনি দেখবেন রাস্তায় যে বারমূডাগুলো বিক্রি(হ্য ওগুলো সব ফুল প্যান্টকে কেটে হাফ করা হয়।

—একটা সময় তো মেটিয়াব্রুজের দর্জিদের খুবই নাম ডাক ছিল?

—ভীষণরকম ছিল। এরকম দর্জিও ছিল মেয়েদের দিকে শুধু তাকিয়ে তার পোশাক বানিয়ে দিত। যা হত একেবারে নিখুঁত। এমন ডিজাইন ছিল এখানে যারা বোম্বে নিয়ে বা ভারতের অন্যান্য জায়গায় গিয়ে শুধু ডিজাইন দিয়ে হাজার হাজার টাকা কামিয়েছে।

—এখনও কি তারা আছেন?

—দু একজন থাকলেও থাকতে পারে। তবে তারা আর কাজে করেন না। অনেক বয়স হয়ে গেছে। অধিকাংশ মারা গেছেন। আসলে মেটিয়াব্রুজের দর্জি শিল্পটা এলো কিভাবে—সেই নবাবের যুগ থেকে। তখন এখানে ইংরেজদের কোট গাউন, নাইট ড্রেস তৈরি হত।

—আর একটা প্র(করি। আপনি একটু আগে বললেন ভারতবর্ষের মধ্যে কমিউনিটি অনুযায়ী ডিজাইন বদলায়। আন্তর্জাতিক বাজারে, মানে দুবাই কেন্দ্রিক যে আন্তর্জাতিক বাজার সেখানে কি ডিজাইনের তেমন ব্যাপার আছে। মানে দুবাইতে যে ডিজাইন চলছে সেটা সাউথ আফ্রিকাতে চলবে না। অথবা সাউথ আফ্রিকায় যেটা চলবে সেটা দুবাইতে চালানো যাবে না!

—ব্যাপারটা সেরকম কিছু না। তবে দুবাই বা আরব দেশগুলোতে, অর্থাৎ মুসলমান দেশগুলোতে পোশাকে লালা আর কালো রং ব্যবহার করা যায় না ডিজাইনে, আর কোন পশুর ফিগার রাখা যাবে না। তবে অন্যান্য দেশ গুলোতে সে রকম কোন ব্যাপার নেই।

—এটা কেন হয়?

—এটা ঠিক আমার জানা নেই।

—বাংলাদেশে এই শিল্পের অবস্থা কেমন?

—বাংলাদেশের সাথে আমাদের কোন তুলনা হয় না। ওরা অনেক এগিয়ে। ওদের এই ব্যবসাটা ভীষণ রকম আন্তর্জাতিক। ওরা পরবর্তী চার চার বছরের প্ল্যান-প্রোগ্রাম ঠিক করে রাখা। আমার জামাতো ভাইরা এই ব্যবসা করে, ওরা ড্রিল করে এডিডাস, নাইকের মতো কোম্পানির সঙ্গে। আর ওদের যেটা ব্যাপার সেটা হল মালটা তৈরির ব্যাপারে যে চুক্তি(হবে তার একটা কমও তৈরি হবে না একটা বেশিও হবে না।

—মেটিয়াব্রুজের ব্যবসায়ীরা কি এই ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না?

—কিছু নতুন ব্যবসায়ী আস্তে আস্তে নিজেকে তৈরি করছে। তবে খুব কম। যেমন—এখানে আছে হ্যাপি ড্রেসেস। ওরা ভালো ব্যবসা করছে। তবে মারোয়ারিদের বিজনেস আলাদা রকমের। আপনি রামু আগরওয়ালের বিশাল গার্মেন্টের কথা ভাবুন। রামু আগরওাল ছিল হ্যান্ডিকেপ্ট । নিজাম প্যালেসের নিচে বসে ভিডিও গেম খেলতো। তারপর হঠাৎ একসময় কিছু গার্মেন্টের খোঁজ পেল। যার বেশ কিছু রিজেকটেড। গেঞ্জি এসব আর কি। চদ্দো লাখ পিস। দাম পড়রো চদ্দো লাখ টাকা। তার মানে পার পিস এক টাকা। তখন হয়তো আমরা স্কুলে পড়ি, খেয়াল করে দেখুন সারা কলকাতা গেঞ্জিতে ছেয়ে গেল। ধর্মতলার ফুটে গেঞ্জি বিকোতে লাগল। সে গুলো সব ছিল রামু আগরওয়ালের। ও ডিস্ট্রিবিউট করলো ১০ টাকা পিসে, যারা বিক্রে(তা তারা বিক্রি(করলো ১৫ টাকায়। তার মানে রামু এক টাকার গেঞ্জিটা ১০ টাকায় বিক্রি(করে লাভ করলো ৯ টাকা। তারপর থেকে ওকে আর ধরা গেল না।

—মেটিয়াব্রুজে যেটা ছিল দলিজে বসে কাজ.....।

—দলিজের ব্যাপার ভুলে যান। দলিজের কাজ করে আর আন্তর্জাতিক বাজারে টিকতে হবে না। একটা ঘরে বসে চারটে মেশিনে বাবা,ছেলে, কাকা কাজ করছে। এখন আর আপনি তা দেখতে পাবেন না।

—এটা কি পরিবার তন্ত্রের ব্যাপার? হিন্দু পরিবারগুলো যে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। এক ভায়ের সাথে অন্য ভায়ের কথা নেই। মুসলিমদের মধ্যে তো ব্যাপার এতোটা ছিল না।

—ঠিকই। তবে এখন মুসলিমদের মধ্যেও এই ব্যাপারটা আসছে। হয়তো উপরে দেখবেন ভাইয়ে ভাইয়ে খুব মিল। কিন্তু

ভিতরে সি রকম নয়। একটা সময়ে মুসলিম সমাজে কি ছিল, বাবা বাড়ির কর্তা। সে যা বলবে সবাই তা শুনবে। এখন কি আর সে রকম। আমার বাবা যদি আমাকে কোন হুকুম করে আমি তা শুনবো!.....আমরা এই অঞ্চলের দর্জিদের অনেক কিছুই জানি। যদিও আমরা সবাই কনভেন্টে পড়াশোনা করেছি। কিন্তু ছোট থেকেই তো ব্যবসাটা দেখেছি। আমার মাও দর্জি পরিবারের।

—তার মানে শি(টাই এদের ডোবালো.....!

—এদের মতো এতো বোকা বোধহয় কেউ হয় না। এরা দেখলো দিনে কাজ করে পকেটে দুশো টাকা চলে এলো, ব্যস, আর কিছু চাই না। এর যে কি ভবিষ্যৎ তা নিয়ে ওরা ভাবে না। এখানে হাটে একটা প্রথা আছে 'দেওয়ালি' দেওয়া। যে টাকার মাল বিক্রি(হবে তার একটা পারসেন্টেজ কেটে নেওয়া।

—'ব্যাজ' বলে।

—হ্যাঁ। ব্যাপারটা দেখুন, ওরা বাইরে থেকে ব্যবসা করতে আসছে। এসে এদের টাকা নিয়ে যাচ্ছে। ধ(ন একবারে ৩০০০০ টাকার মাল কিনলো ওরা, ১৫০০০ টাকা দিল বাকি টাকাটা পরে দেব বললো। পরের বার এসে বাকি ১৫০০০ দিলো। তারপর যখন মাল নিয়ে টাকা দিতে গেল তখন এরা বললো টাকাটা একেবারে দিলেই হবে। একেবারে পেলে সুবিধা হবে। তারপর আরও হয়ত ২০ বার মাল নিলো ৩০০০০ টাকা করে, তাহলে থোক হল ৬ লাখ টাকা। যখন দেওয়ালির সময় এরা টাকা আনতে গেল (ওরা টাকা দিয়ে দেব, টাকা মারবে না) তখন ওরা বলল আমাদের ১০ শতাংশ দেওয়ালি দাও অর্থাৎ ৬০০০০ টাকা কেটে নিল। ভেবে দেখুন এতদিনের সুদ

খেলো তার উপর এতোগুলো টাকা নিল। যা সবটাই এদের। এরা এত বোকা কিছুই বোঝে না।

—আমি একজনকে জানি, সে শি(ত দর্জি সে বলল আমি 'ব্যাজ' দিই না।

—ঠিকই বলেছে। সে শি(ত বলেই বলেছে। আমাকে যদি দেওয়ালি দেবার কথা বলে আমি তো প্রথমেই বলবো আগে চুক্তি(কর তারপর।

—উর্দুভাষীরা কি এখানে এই ব্যবসা করছে?

—না, ওরা এদের কাজ করে। নিজেরা সে ভাবে ব্যবসা করে না।

—এই ব্যাপারটা হচ্ছে কেন?

—ইউনিটি নেই দর্জিদের মধ্যে। বাবা ছেলেকে মারার জন্য ব্যস্ত। সেই সুযোগটাই ওরা নিচ্ছে। তাই একটাই কথা বলছি মেটিয়াব্রুজে ব্যবসা শেষ। এদের নিয়ে লেখার কিছু নেই।

—ঠিক আছে। ধন্যবাদ।

UNRECORDED INTERVIEW

প্রদীপ জানা। বয়স ৩৭ বছর। কথা হচ্ছিল তার আলমপুরের ঘরে বসে। বেলা ১১.৩০ নাগাদ। ১৪/২/২০০৫

—প্রদীপদা আপনার আদি বাড়ি কি এখানেই?

—না, আমি মেদিনীপুরের ছেলে। গ্রাম ইচ্ছাবাড়ি। বেশ বড় গ্রাম। বেড় উন্নত। বিদ্যুৎ সংযোগ আমাদের বাড়িতে না এলেও মোটামুটি অন্যান্য সুবিধা আছে। টেলিফোন সুবিধাও এসেছে। আমার বাবারা দু-ভাই। জ্যাঠামশাই আর আমার বাবা। আমরা চার ভাই, দু বোন। ছোটবেলা থেকেই আমি পড়াশোনায় খুব মনোযোগী ছিলাম না। বরং খেলাধূলা, পায়রা, গিনিপিগ পোষা এসবেই আমার আগ্রহ ছিল। সেভেনে পড়ার সময় পরী(য় ফেল করলাম। পড়াশোনায় মন বসলো না। এইভাবে কিছুদিন কাটার পর চলে এলাম বারাসাতের নাজিরগঞ্জে। ইটভাটায় কাজ করতে। ....কাজ বলতে একজন ম্যানেজার ছিল, তার রান্না করা। মোট তিনজনের রান্না করা। আমি, ম্যানেজার আর ম্যানেজারের একজন সহকারি ছিল। পাশাপাশি খোলার কিছু কাজ করতে হত। যদিও সেটা করা আমার দায়িত্বের মধ্যে ছিল না।

—তারপরে কি পোদ্দারে কাজ করতে এলেন?

—ইঁট ভাটায় কাজ করার সময় একদিন আমাদের গ্রামের এক জামাই, সে আমাদের বাড়ি যায়। গ্রামের দিকে নতুন জামাইরা বাড়ি বাড়ি ঘোরার একটা প্রচলন আছে। ঠিক শহরের মতো তো নয়। সেই জামাই পোদ্দারে কাজ করত। বাবা তাকে বলে যে আমার ছেলেটা বারাসতে ইঁট ভাঁটায় কাজ করছে। সে তখন বলে যে আমাকে পোদ্দারে লাগিয়ে দেবে। ঢুকলেই আট নশ টাকা মাসে। আমি মূর্খ ছেলে অত টাকার কথা শুনে তো বিরাট ভাবছি। তখন সে সময় প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারের মাইনে ছিল বোধহয় আটশ টাকার মত। ...যাইহোক চাকরি ঠিক হবার পর আমি বারাসতের কাজ ছেড়ে চলে এলাম কলকাতায়। উঠলাম জিনজিরা বাজারের কাছে। যে এয়ারপোর্টটা আছে ওর কাছাকাছি। যে চাকরি দেবে বলেছিল তার কাছে। সে সময় আমার কোন রোজগার

নেই, এদিকে চাকরিটাও হচ্ছেনা পোদ্দারে। সে সময় মায়ের একটা গয়না বন্ধক দিয়ে বাবা আমাকে টাকা পাঠাতে শু(করলো। কারণ জমা টাকা আমাদের তেমন একটা ছিল না। .....প্রায় একবছর পর আমার চাকরি হয়। ৮৫-তে যতদূর সম্ভব। আমি তখন জিনজিরা বাজারেই আছি। এদিকে আমাকে চাকরি দেবার পর যে আমাকে চাকরি দিয়েছিল সে আরো কয়েকজনকে চাকরি দেবার নামে টাকা নিয়েছিল। কিন্তু চাকরি আর হয় না। একবছর দেড়বছর হয়ে যায়। ছেলেগুলি ওদের পাড়ার ছেলেদের কথায় কথায় ব্যাপারটা চলে। একদিন রাতে পাড়ার ছেলেরা মাল-টাল খেয়ে ওকে ধাক্কা-ধাক্কি দেয়। আমি তখন পোদ্দারে ক্যাজুয়েল হিসাবে কাজ করছি। ধাক্কাধাক্কির ব্যাপার আমি কিছুই জানি না। জেনেছিলাম পনেরো দিন পরে। অথচ ওই লোকটির ধারণা হয় আমিই তাকে মার খাইয়েছি। সে তখন আমাকে মারবার জন্য ফন্দি আঁটতে থাকে। আমি ভাবলাম যে এখানে থাকা ঠিক হবে না। তখন একদিন ঘরে তালা দিয়ে বাড়িওয়ালাকে বললাম আমি আর থাকবো না, চাবিটা ওকে দিয়ে দেবেন। এই বলে ব্যাগ-ট্যাগ নিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফতেপুর দিনু মিস্ত্রীর বাড়িতে চলে এলাম। একটি ছেলে সে হিন্দুস্থানী, পোদ্দারেই কাজ করতো ওর ওখানে। ওর ওখানে বেশ কিছুদিন থাকার পর আমার শালার সঙ্গে এখানে ভাড়া এলাম। তখন অবশ্য শালা হয়নি। এখানে আসার পর ওর বোনের সঙ্গে আমার ভালোবাসা হয়। ও পোদ্দারে কাজ করতো। ইতিমধ্যে ৮৭ তে পোদ্দার লক আউট হয়। আমি তখন ক্যাজুয়েল। সাত মাস পরে খুলল। ৮৯ তে আমি পারমানেন্ট হলাম। ৯১ তে আবার লক আউট হল। সেবার ১৪ মাস। তার মাঝখানেও বেশ কয়েকবার অল্প সময়ের জন্য হয়েছে। তারপর ৯৭ থেকে লাগাতার।

—এই যে মাঝে মাঝে লক আউট হয়েছে তখন আপনি কি কাজ করেছেন?

—কিছু কিছু সময় চা গুদানে কাজ করেছি। সে সময় ওই কাজে ভালো পয়সা ছিল। কিন্তু সে কাজ পুরো সময়ের জন্য ছিল না।

—এই দর্জির কাজ কবে থেকে করছেন?

—এখানে আসার পর থেকেই এই কাজ করছি। প্রথমে আমার শালারা করতো। আমি সেখানে গিয়ে বসে হাতে হাতে এটা সেটা করতাম। সেটা টাকার জন্য নয়। শুধু সময় কাটানো। আর বিড়ি খৈনি এগুলো সব পাওয়া যেত। এই করতে করতেই একদিন মেশিনে বসলাম। একটা ছোট মেয়ে আমাকে মেশিনের টুকিটাকি শিখিয়ে দিয়েছিল। ৮৬ তে বিয়ে করে মেশিন কিনলাম। ৭০০ টাকা দিয়ে মেরিট মেশিন, আমতলা থেকে। তারপর স্ত্রীও কাজ শিখলো। .....তারপর কারখান খুললেও আমি একাজ চালিয়ে গেছি। আসলে কারখানায় আমাকে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হতো। কিন্তু বাড়িতে এসে মেশিনে বসতাম। অত(ন দাঁড়িয়ে থাকার পর বসতে ভালোই লাগতো। কাজে ক্লান্তি আসতো না।

আমার বিয়েতে সে এক ঘটনা!

—কিরকম?

—এখানে এসে প্রেম করার পর কিছুদিন হয়ে গেছে। বাড়িতে গেছি। কিন্তু বাবা মাকে তো বলতে পারছি না। শেষে এক বোনকে ব্যাপারটা বললাম। পিসতুতো বোন। তাকে সব ব্যাপারটা বললাম। আমাদের বাড়িতে জ্যাঠামশাই সবার উপরে। তিনি তিনটে পথ বললেন, এক—সবকিছু ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে এসো। দুই—শুধু চাকরি করো আর কিছু না। তিন—নিজের মতো চল যা ভালো বোঝ। .....শেষ পর্যন্ত অবশ্য জ্যাঠামশাইকে একজন বুঝিয়েছিল যে ওর ব্যাপার, ভালো মন্দ সবই তো ওই বুঝবে। আমরা আর কদিন। মাঝখান থেকে বাঁধা হয়ে লাভ কি! শেষে একদিন জ্যাঠা জ্যাঠিমা এলো এবং কালিঘাটে বিয়ে করলাম।

—কাজগুলো কোথা থেকে আনতেন?

—বিশ্বাসপাড়া থেকে আনতাম। ছোট মেশিনে কাজ করতাম প্রথমে। কিন্তু ছোট মেশিনে পরিশ্রমও বেশি, কাজও বেশি হয় না। তাই পরে বড় মেশিন কিনলাম। প্রথমে বাচ্চাদের প্যান্ট করতাম।

—প্রথমে কেমন রেট পেতেন?

—প্রথমে ছোট প্যান্ট ৩.৫০ ডজন। কাটা প্যান্ট নিয়ে এসে টোটাল করতাম।

—এখন কি করেন?

—এখন বাচ্চাদের গেঞ্জি করি, সঙ্গে প্যান্ট।

—এখন রেট কেমন?

—০ সাইজ—১ পিস ৮ টাকা(প্যান্ট সমেত) হোলসেলারের কাছে বিক্রি(। ২২ টাকা ডজন দর্জি পাচ্ছে। দর্জির খরচ ২.৫০ টাকা ডজনে। ২০-৩৪ সাইজ—১ পিস ১৪ টাকা (প্যান্ট সমেত) হোলসেলারের কাছে বিক্রি(। ২৪ টাকা ডজন দর্জি পাচ্ছে। দর্জির খরচ ২.৫০ টাকা ডজনে। যদি ডিজাইন হয় ১৮-২০ টাকা হোলসেলারের কাছে বিক্রি(। সে(ত্রে দর্জি পাবে ৩০ টাকা। খরচ সবটাই সুতোর।

—এই দুরকম সাইজ?

—এর পর একটা হয় সেটা ফ্রি সাইজ। সেটা আমি করি না। .....আমার ওস্তাগারও ওই কাজ করে না।

—দর্জির কাজ কি আপনি ও আপনার স্ত্রী দুজনে মিলে করেন? নাকি অন্য কারোর সাহায্য নেন।

—মূল কাজটা আমি ও আমার স্ত্রী দুজনে মিলে করি, তবে আমার ছেলেমেয়েরাও কিছু সাহায্য করে।

—কি রকম সাহায্য করে।

—ওই সুতোগুলো কেটে দিল। মালগুলো গুছিয়ে দিল।

—এই ধরণের কাজ বাইরের লোককে দিয়ে করালে কি রকম টাকা দিতে হত? এদের কি কোন নাম আছে?

—বাইরের লোককে দিয়ে এরকমের কাজ করালে সপ্তাহে ১০০ টাকা দিতে হত। এদের তেমন কোন নাম নেই। তবে ওস্তাগাররা বলে 'ছুটকিলে'।

—এনায়েৎ আলি এই মালগুলো আপনাদের কাছ থেকে নিয়ে কোথায় বিত্রি(করে?

—ওর বিভিন্ন জায়গায় গদি আছে। কারবালা, জব্বার, এ. বি. এম. এ।

—সেখানে যেসব কাস্টমার আসে তারা সব কোথা থেকে আসে?

—মহারাষ্ট্র, দিল্লি, বিহার বিভিন্ন জায়গা থেকে।

—মালগুলো ওস্তাগাররা কিভাবে সাজায়?

—০ সাইজটা তিন পিসে ১ বান্ডিল। ২০-৩৪ সাইজটা ২ পিসে ১ বান্ডিল।

—আপনার তো কাটা মালটা নিয়ে এসে সেলাই করেন। কিন্তু যারা কাটিং করে তারা কেমন রেট পায়?

—১২ টাকা প্রতি ডজন। তা সে যে মাপই হোক না কেন। ০ থেকে ২০-৩৪।

—এনয়েৎ আলি কি এখানকারই লোক ? এর বয়স কি রকম?

—এনায়েৎ আলির বয়স ৪২ বছর। ও এখানকার লোক নয়। ছোটবেলায় ওর অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। আরামবাগে ও বারোমাসিয়া থাকতো। ....বারোমাসিয়া হলো থাকা খাওয়া পেতো। আর গ(বাছুর দেখাশোনা করত। আরো বিভিন্ন বাড়ির কাজ করতো। তারপর ও চলে আসে কলকাতায়। নিজে কাজ শিখে তা রপর ব্যবসা শু(করে। .....ওর এক ভাই আছে, সে ছুতোরের কাজ করে।

—সে ছুতোরের কাজ নিল কেন?

—দু ভাই, যে যেমন কাজ শিখেছে। সে এখানে থাকে না। যখন যেখানে কাজ পায় সেখানেই থাকে।

—এনায়েৎ আর কি কি কাজ করত? কত দর্জি আছে ওর?

—প্যান্ট, গেঞ্জি, বাবাস্যুট এসবই ও করে। মোটামুটি ৫-৬ জন দর্জি আছে। আগে বাইরে থেকে দর্জি এসে কাজ করতো। কিন্তু এখন আর নেই। কারণ খরচের একটা ব্যপার আছে।

—বাইরে থেকে মানে কোথা থেকে দর্জি আসতো?

—মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম। মেটিয়াব্রুজে যা দর্জি আসে বাইরে থেকে তার সবটাই বলা যায় নন্দীগ্রাম থেকে।

—এনায়েৎ নিজে কি কাজ করে? কতদিন ওস্তাগরি করছে?

—ও নিজে কাটিং করে। প্রায় ২০ বছর ওস্তাগরি করছে।

—প্রদীপদা আপনার খরচ হল সুতোর খরচ। তাই তো।

—হ্যাঁ, আমার খরচ হল সুতোর খরচ। তবে বছরে মেশিনের পিছনে একটা খরচ আছে বটে তবে সেটাকে ধরা যায় না।

—সুতোর দাম কি রকম?

—হোলসেলারের কাছ থেকে দোকানদার কেনে ২৫ টাকা ডজন। আমরা কিনি পিস হিসাবে। ২.৫০ টাকা পিস (রিল) যে কোন পলিয়েস্টার সুতো। পলিয়েস্টার সুতোটা টেকসই হয় বেশি। তবে সুতি সুতোর দাম বেশি। আমরা সুতি সুতো নিইনা। কারণ যে সব কাজ সেলাই এর পর প্রিন্ট হয় সে গুলো সুতি সুতোয় হয়। সুতি সুতো সব সময় হবে সাদা। তার উপর প্রিন্ট করতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমরা যেহেতু প্রিন্ট করা মাল সেলাই করি তাই আমাদের সুতি সুতোর প্রয়োজন হয় না। আমি সামনের দোকান থেকেই সুতো নিয়েনি।

—এক রিল সুতো দিয়ে কতটা কাজ হয়?

—একরিল সুতো দিয়ে ১ ডজন কাজ হয়। ১ ডজনের কিছু বেশি বলা যায়।

—এনায়েতের অবস্থা কিরকম?

—এনায়েতের অবস্থা ভালোই। নিজের বাড়ি। এছাড়া ভাড়া বাড়িও আছে। এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। ওর খুব ইচ্ছা ছিল ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা শিখাবে। কিন্তু একটারও হল না। একটা ছেলে কাজ শিখছে। আর ছোটটা তো ছোটই। .....তবে পড়াশোনার পরিবেশও ওদের ঘরে নেই। কথায় কথায় বিচ্ছিরি গালাগালি দিচ্ছে। এভাবে কি আর হয়। ওদের ছেলেরা কি

করে—বাবা কাজ করছে বাবা যেই থাকলো না তখনি একটু মেশিন নাড়াচোড়া করল। কিছু ভুলভাল হলে বাবা এসে দু-চার ঘা দিল। কিন্তু কাজে হাত পাকায় এই ভাবেই। ....আর একটা জিনিস ল(্য করবেন প্রত্যেক দর্জি বাড়িতে টেপ বক্স আছে। তার কারণ গানের তালে কাজ করে চলে ওরা। তা না হলে মন বসানো অসুবিধা।

—এই যে ব্যাজের ব্যাপারটা, আপনার কি মনে হয় ব্যাজ দেবার ফলে ওস্তাগারদের যে টাকাটা বেরিয়ে যায় সেটি আপনাদের কাছ থেকে তুলে নেয়?

—আসলে আমি তো প্রথম থেকেই এখানে কাজ করছি। একটা অন্য রকম সম্পর্ক হয়ে গেছে। তাছাড়া আমাকে দূর থেকে মাল আনতে হচ্ছে না। যখন তখন যেতে আসতে পারছি। কোন ভাড়া নেই। তবে এটা ঠিক এখানে যা দাম পাচ্ছি বড় তলায় কাজ করলে এর চাইতে অনেক বেশি পেতাম।

—যদি কখনও কোন আর্থিক অসুবিধায় পড়েন তবে ওস্তাগরকি আপনাকে কোন সাহায্য করে?

—হ্যাঁ করে, তবে সব ওস্তাগর নয়। এনায়েতের সঙ্গে আমার অন্য সম্পর্ক। অনেক সময় আমিও ওকে টাকা দিয়েছি। আসলে এই কাজে তো কোন স্থিরতা নেই। যেমন ঈদের পরেই একটা মন্দা আসবে।

—আপনি কি এখানেই থেকে যাবেন নাকি দেশে চলে যাবেন?

—দেশেই চলে যাবো। কারণ ভাইরা যে জমি জায়গা কেনে তাতে আমারও ভাগ আছে। তবে ছেলে মেয়েরা এখানে থাকতে চাইলে থাকবে। এখন যা আয় করি তাতে সংসার চলে যায়। তবে ছেলে মেয়ের পড়াশোনার জন্য মাসে প্রায় ৯০০ টাকা খরচ। একটা নাইনে একটা সেভেনে। তারপর ছোটখাটো অসুখবিসুখও আছে। তবে মাঝে মধ্যে ভীষণ চিন্তা আসে, কি হবে ছেলে মেয়েদের। ওদের নিয়েই যত চিন্তা।

RECORDED INTERVIEW

শেখ রফিক আহমেদ, শেখ জাহাঙ্গির আহমেদ, শেখ আকবর হোসেন
তিনজনের সঙ্গে একত্রে কথা কিলখানার কাছে, রাত ৮.৩০টায় ১৭.৮.২০০৪।

আমার নাম শেখ আকবর হোসেন(৭০)। ১৯৯২ এ আমি ৫৮ বছর বয়েসে আমি রিটায়ার করি। সেই অনুযায়ী এখন আমার বয়স প্রায় ৭০। রাস্তার ধারেই টি-৬৫৩/৫ আকড়া রোডে আমাদের বাড়ি। আমার ঠাকুরদার আমল থেকেই আমরা এখানে আছি। বাবারা চার ভাই। সবার ছেলেপুলেই এখানে আছে। কেউ কোথয় চলে যায়নি। বিরাট বাড়ি। প্রায় ৪ বিঘা হবে। অন্তত্ত আরো একটি প্রজন্ম অনায়াসে থাকতে পারবে। সব মিলিয়ে প্রায় দুশো লোক। যদিও হাড়ি প্রায় ২৫-৩০, বিয়ে টিয়েতে খাওয়া-দাওয়া একসাথেই হয়। তার জন্য আলাদা কোন জায়গা নেই। কিছুটা ফাঁকা জায়গা, উঠান, ছাদ, এর ঘর ওর ঘর করে স্থান সংকুলান হয়ে যায়। ১৯৬০ থেকে ১৯৯২ অবধি আমি চাকরি করেছি। তার আগে আমি ৪ বছর ক্যাসুয়াল হিসাবে ছিলাম। ৬০ এ পার্মানেন্ট হই। একটু বেশি বয়েসেই ঢুকেছি। প্রায় ৩০ হবে। তখন আমি বিবাহিত। ছেলেপুলের বাবা। তার আগে এদিক ওদিক করে সার্ভিস করতাম। ১৯৪২ এ আমার প্রথম সার্ভিস। অর্ডন্যান্স ফ্যাকটরি.....,কোলকাতাতে। ১৯৪৫ এ CSNC(Calcutta Steam Navigation Company) তে যোগ দিই। খুব পুরাতন কোম্পানি। ইংলিশ কোম্পানি। এর ম্যানেজিং এজেন্ট ছিল হর্মিলার এন্ড কোম্পানি। এখন যেখানে দ্বিতীয় হুগলী সেতু সেখানেই ছিল এদের লোক পারাপারের সার্ভিস। রাজগঞ্জ থেকে চাঁদপাল ঘাট পর্যন্ত ছিল এদের সার্ভিস। মেটিয়াব্রুজ, রাজাবাগান, শিবপুরেও এদের সার্ভিস ছিল। এরা শুধু লোক পারাপারই করত। মালপত্র পারাপার করত না।

আমার আগে আমার বাবাও দর্জির কাজ করতেন। ওস্তাগর বলা যাবে না। উনি অন্যের কাজ শ্রমিক হিসাবেই কাজ করতেন। ঠিক কার কাছে করতেন জানা নেই। তবে স্থানীয় কারো কাছেই করতেন। কাজের জন্য বাইরেও গেছেন। রেঙ্গুন, পেনাঙ , সিঙ্গাপুর, বার্মা ইত্যাদি। সেসব অনেক আগে। তার বিয়েরও আগে। ভারতীয় দর্জিদের তখন সুনাম ছিল। যোগাযোগ বলতে রেফারেন্সই মূল। পুরোটাই ব্রিটিশ এম্পায়ার ছিল। পাসপোর্ট-ভিসার কোন ব্যাপার ছিল না। যাওয়া সহজ ছিল।

ওখান থেকে ফেরার পর বাবা স্থানীয় কারো কাছেই দর্জি হিসাবে কাজ করতেন। বাবা মারা যাওয়ায় অনেক কষ্টে আমরা মানুষ হই। জায়গা-টায়গা তখনও ছিল কারণ ওগুলো আমার ঠাকুরদার আমলের। ফাঁকাই পড়ে থাকতো। কদু(লাউ) গাছ, কুমড়ো গাছ, কলাবাগান এসব ছিল। এ জমি প্রথম ছিল বিপিন বিহারী দাসের। ইনি ছিলেন নুটবিহারী দাসের ঠাকুরদা। জমিটি প্রথমে খাজনায় ছিল। পরে আমার ঠাকুরদারা তা কিনে নেন। তেমনই সেলডিড আছে। এখন দলিল পত্র সবই আছে। আমরা খাজন-ট্যাক্স সবই দিই।

জাহাঙ্গির আহমেদ (৫৯)। আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদারা হিন্দুই ছিলেন। দলিল দস্তাবেজ অনুযায়ী তাদের নাম দেখলে তেমনই মনে হয়। আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার নাম ছিল ফাজিল। তার বাবার নাম ছিল শীতল। এসব হিন্দু নাম। অথচ সবার নামের আগে সেখ আছে। ব্যাপারটা বিভ্রান্তিকর। তবে খুব সম্ভবত আমরা কনভারটেড্ই। আমার নাম শেখ জাহাঙ্গির আহমেদ। আমার বাবার নাম শেখ শামসুল হক। তার আগে(বড়ভাই) সেখ মহিউদ্দিন। ইনি সেখ আভবার হোসেনের বড় কাকা। তার বাবার নাম আবদুস সামাদ। তার বাবার নাম শীতল শেখ। পরে সবার নামের শেষে শেখ জোড়া হয়েছে। তার আগের কোন রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত শীতল শেখ থেকেই কনভারসান শু(হয়েছে। রাণী ভিক্টোরিয়ার আমল থেকে দলিল পত্র দেখে এগুলো আমরা পেয়েছি। আসলে আমার বাবাই এগুলো উদ্ধার করেছেন। আমাদের 'ফারায়েজ' (কারিয়তি সম্পত্তি বন্টন ব্যবস্থা) অনুযায়ী সম্পত্তি বন্টন করতে গিয়েই এগুলো আমরা পেয়েছি। শীতল শেখের স্ত্রীর নাম পাওয়া যায়নি। আসলে তখন স্ত্রীদের গু(ত্ব অতটা ছিল না। আমার ঠাকুরদার নাম অনেক কষ্ট করে আমরা বলতে পারলেও অনেকেই এখনো তা বলতে পারে না। যদিও আমরা আমার যে ঠাকুরমার নাম জানি তিনি আমার বাবার সৎ মা। আমরা আসল মায়ের নাম জানিনা। তিনি আমার বাবার চার বছর আগে মারা যান।

আমার বাবা কাটিং, সেলাই সবই জানতেন। কিন্তু নিজে ব্যবসা করেননি মূলত পূঁজির জন্য। অনেক পুঁজি সংগ্রহের জন্য বাইরেও যেতেন। ওখানে ইন্ডিয়া যারা ব্যবসা করতেন তারা এখান থেকে দর্জি নিয়ে যেতেন। সেখানে কামাই বেশি ছিল। আমার বাবাও গেছেন। পুঁজি করেছেন। কিন্তু একবার গিয়ে আর যাননি। ব্যবসা করে উঠতে পারেননি।

আমার বড় জ্যাঠা, সেখ মনসর হোসেন, জাহাজের টিকিট পাশ করানোর কাজ করতেন। এটা আমার ঠাকুরদার পেশা ছিল। আমার বাবারা তখন ছোট। তিন চার বছরের মাও নেই। ঠাকুরদা দেড় পয়সা দিতেন মুড়ি কিনে খাওয়ার জন্য। তারা সারাদিন ঐ মুড়ি খেয়েই থাকতেন। ঠাকুরদা রাত্রে এসে নিজে বাঁধতেন।

রেডিমেড সিস্টেম তখন ছিলনা। দর্জিরা সাধারণত স্থানীয় বড়লোক বা মধ্যবিত্তের কাছেই কাজ করত। বিশেষ করে ইংরেজদের অর্ডার সাপ-াই -এর কাজ করত। কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ইংরেজরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। পার্কস্ট্রীট, মিডলটন, পার্ক সার্কাস, চৌরঙ্গি ইত্যাদি এলাকায় তারা ছিল। তাদের বাড়ি থেকে গিয়ে কাজ আনত। এক আরেকজনের পরিচিতর কাছে তাদের পাঠাতো। ইংরেজরা যেহেতু পোশাকের ব্যাপারে শৌখিন ছিল, ভালে দর্জির সমাদর ছিল। কখনও তারা নিজেরা ভাল কাপড় কিনে দিত। অনেক সময় কিনে নিতেও বলত। যথেষ্ট পারশ্রমিক তারা দিত। একটা গাউনের জন্য তখনকার সময়ে এক দেড়শো টাকায় তারা দিত যা ২-৩ মাসেও খেয়ে ফুরোত না।

ইংরেজরা সাধারণত কোট, প্যান্ট, শার্ট, গাউন এসবের অর্ডার দিত। দেশী বড়লোকেরা ব্লাউজ-টলাউজের অর্ডারও দিত। তবে 'টাই' বোধহয় তখন এরা করত না। আন্ডার গার্মেন্টসও করত না। এখন এখানকার হিন্দু সম্প্রদায় এসব কাজ করলেও দর্জি সম্প্রদায় এগুলো কখনই সেভাবে করেনি।

ঠিক কিভাবে রেডিমেড গার্মেন্টস শিল্প এখানে এল সঠিক বলতে পারলেও ওয়াসেল মোল্লা, হাফিজুদ্দিন মোল্লা, সুবিদ আলি মোল্লারাই সম্ভবত এর জনক। আবদুল লতিফ মোল্লা ছিলেন। তবে ইনি উলের ব্যবসায়ী ছিলেন। এবং ইনি হাওড়া জেলার। নিউ মার্কেট এলাকা তখন প্রধানত সুবিদ আলি মোল্লা, ওয়াসেম মোল্লা, হাফিজুদ্দিন মোল্লা এদের দখলে ছিল। প্রথমে হাট বসে চাঁদ পাশ ঘাটের এপারে যেখানে স্টিমার আসে ওখানে। পরে সরে যায় নিমানি মঙ্গলা হাটে। বার্ন কোম্পানির পশ্চিমদিকে। ওখানে চালা-টালা করে নতুনভাবে শু(হয়। ১৯৮০-৮২ নাগাদ হাট পুড়ে যাওয়া পর্যন্ত ওখানেই হাট বসত। যে কোন সময়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারত এরকম অবস্থাতেই এতদিন চলত। ৫০-৬০ বছর এভাবেই চলেছে।

এর আগের প্রজন্ম চাষ-বাষই করত। ১৯৬২ সালেও আমি দেখেছি পুরো রবীন্দ্রনগর কাটাই ছিল। পুরোটাই ধানজমি। এখনও কিছু আছে। এখনও কিছু আছে। মালিরা ছাড়াও কানখুলির কয়েকজনের জমি ছিল। কিছুদিন আগেই হাফিজুদ্দিন মোল্লার ওয়ারিশরা ৩০-৪০ কাঠা জমি বিক্রি(করেন। এখন ঘর বাড়ি হচ্ছে। ৬৪ সালের দাঙ্গায় বিধানচন্দ্রের দাঙ্গায় বিধানচন্দের আমলে উদ্বাস্তুরা এখানে আসা শু(করে। পরে সরকারি ভাবে তা বাস্তুজমি হয়। কেঠো পোলের কাছাকাছি খালের একটা উঁচু পাড়ে উঠে আমি ছোটবেলা দেখেছি পুরো ফাঁকা ধানজমি। আমার জামাইবাবুর বাবা আমাকে দেখিয়েছিলেন। এগুলো তাদের ছিল। মালিদেরও প্রচুর জমি ছিল। কিছুদিন আগেও মন্দির সংলগ্ন কিছু জমি মালিরা বিক্রি(করল। পুরোটাই ধানজমি ছিল। হাজীরতন দরগার কাছে আমার ভায়রাভাইদের কিছুদিন আগেও ধানের গোলা ছিল। এখন ওরা রেডিমেডের বিজনেস করে। গার্ডেনরীচ থেকে চাষবাসের পাট ২০-২৫ বছর আগে উটলেও খালধারী সংলগ্ন আয়ুব নগর এলাকায় ২-৩ বছর আগেও ধানচাষ হত। এখনও হয়ত কিছু আছে।

আমার ঠাকুরদারা মাছের ব্যবসা করতেন। তিনি পুকুর ইজারা নিতেন। জেলে ভাড়া করে সেগুলো ধরাতেন। এখন জেলেরা আর নেই। জেলে পাড়ার কিছু লোক এখন নেচার পার্কে সমবায় ভিত্তিতে মাছ চাষ করেন। বদরতলা এলাকায় কিছু জেলেরা

এখনো মাছ ধরে। ওরা খুব সস্তায় এখনও নিজেরা ধরে নিজেরাই বিত্রি(করে। ফটকেও বিত্রি(করে। আমাপ ঠাকুরদা ঠিক জেলে ছিল না। মাছের ব্যবসা বলতে পারেন। ডিম থেকে চারা তৈরি করে বিত্রি(করতেন। জেলে পাড়া থেকে জেলে ভাড়া করে সেগুলো ধরতেন।

আমাপ ঠাকুরদার বাবা সম্ভবত দর্জি ছিলেন। কারণ উনি আই. টি. সি কোম্পানি মালিকের বাড়িতে কাজ করতেন। ওরা ইহুদী ছিলেন। তার মেয়ের সঙ্গে আমার ঠাকুরদার প্রেম হয়। বিয়েও হয়। অবশ্য উনি দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন। ওনার প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর তিনি এনাকে বিয়ে করেন। তার কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। আমার ঠাকুরদারা প্রায় সবারই দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। তবে সবগুলোই প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর। তখন এগুলো প্রায় ঘটতো। অশি(া, অজ্ঞতা ও সচেতনতার অভাবে প্রসবের সময়ে প্রায়শই স্ত্রীরা মারা যেতেন। অশি(া ও সুব্যবস্থার অভাবই এর কারণ ছিল। হিন্দু-মুসলমান সবার মধ্যেই এটা ছিল। ফলে অনেক সময় তাদের দ্বিতীয় স্ত্রী অপরিপাটি হয়ে পড়ত। আমার ঠাকুরদাও তাই। প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর জোর করে সবাই ওনার বিয়ে দেন। তখন ছোট। ফলে তাকে আবার বিয়ে করতে হয়।

আমাগের পাড়াকে জেলে পাড়া বলে এখনও অনেকে জানেন। কিন্তু লিখিতভাবে কোনজায়গাতে তা নেই। জেলে পাড়ার কোন প্রামান্যও নেই। একটা ছিল বটে। আগে মাছ চাষও হত। এখন মজে গিয়ে ছোট হয়ে গেছে। আকবার হোসেনের বাবা প্রায় ৮০ বছর বয়েসে মারা যান। সে সময় তিনি দর্জির কাজ করতেন। আমি দর্জির কাজে আসিনি। তখন আমরা বুঝিওনি যে দর্জির কাজ এতটা অগ্রসর হবে। আমাদের বাড়িতে দর্জির কাজের প্রচলন অতটা নেই। জাহাঙ্গির আহমেদের কাকা ভাল দর্জি ছিলেন। কিন্তু তিনি পাসপোর্ট বানানো ইত্যাদি কাজই করতেন। দর্জির কাজের থেকে আয় বেশি ছিল বলেই তিনি এরকম পেশা নিয়েছিলেন। কিছুদিন প্রথমদিকে অবশ্য দর্জির কাজ করেছেন। বাইরেও গেছেন।

আমি শেখ আকবর হোসেন জাহাঙ্গির আহমেদের কাকার ছেলে। এখন চাকরি করছি। কখনো দর্জির কাজ করিনি, স্কুল জীবন ছেড়ে দিয়ে মাস ছয়েক টাইপ শিখি। মেটিয়াব্রুজ হাইস্কুলে পড়তাম। সেটা ১৯৫৫ সাল। ক্লাস সেভেনে উঠে ছেড়ে দিই। টাইপ শিখতে শিখতে বাবা বল্লেন 'এভাবে বসে খেলে তো চলবে না'। আমাকে এমব্রয়ডারি কাজ শিখতে পাঠালেন। অন্যের কাছে। সপ্তাহে ৬ দিন কাজ। ১২ ঘন্টার ডিউটি। ১ ঘন্টা টিফিন। বাড়িতে খেতে আসতাম। প্রায় ৬ মাস কাজ করি। পরে বাবা জাহাঙ্গীর আহমেদের বাবাকে বল্লেন 'ছেলেকে এভাবে বসিয়ে খাওয়াতে পারছিনা। বাজারের পরিস্থিতি খুব খারাপ। এর একটা চাকরি বাকরির চেষ্টা করো। তিনি অ্যাপ্লি-কেশন করতে বল্লেন। তিনি তিনটি অ্যাপ্লি-কেশন করলেন। Caltex, ELMI & Metalbox-এ। তখন কারোও থ্রু দিয়ে দিয়ে সরাসরি কোম্পানিতে এন্ট্রি পাওয়া যেত। তিনি এল. মির ফোরম্যান ছিলেন। আমার অ্যাপিলিকেশনে তিনজনের রেকমেনডেশন ছিল। সাহেব ওনাকে বল্লেন 'ভাইয়ের ছেলে যখন এত রেকমেনডেশনের কি দরকার ছিল। শুধু আপনার রেকমেনডেশনই যথেষ্ঠ ছিল। আমি ঢোকার পরপরই হলার সাহেব রিটায়ার হয়। তারপর একজন সাহেব আসেন। ৫ বছর। এইভাবে আস্তে আস্তে বাঙালী সাহেব আসেন। স্বাধীনতার পরও সাহেবরা ছিল। ওরা বাঙলা বলতে পারত না। আমরা ভাঙা ইংরাজি হিন্দি মিশিয়ে কথা বলতাম। আমার কাকা ভাল ইংরাজি বলতে পারতেন। তিনি সে যুগের ম্যাট্রিকুলেশন ছিলেন। মেটিয়াব্রুজ হাই স্কুল থেকে পাশ করেছিলেন। এটা তখন ইংলিশ হাই স্কুল ছিল। স্থানীয় মানুষের অনুদানে স্কুলটি তৈরি হয়েছিল। ওয়াদেল মোল্লা সে সময় এককালীন ৫০ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছিলেন। কাকা সামসুল হক ও বটকৃষ(কুন্ডু ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিলেন। সারা গার্ডেনরীচময় তাদের ফুলের মালা দিয়ে ঘোরান হয়েছিল। ম্যাট্রিক পাশ করেই তিনি এল. মির জেনারেন ফোরম্যান হয়েছিলেন। সেটা ১৯৪০ কিছু আগে। তিনি প্রথমে স্কুল মাস্টার ছিলেন। ২০ টাকা মাইনে ছিল। প্রথম থেকেই আমাদের বাড়ির লোকজন চাকরি-বাকরির অবস্থা ভাল থাকলেও আমাদের পরিবারের লোকজন দর্জির কাজর দিকে ঝুঁকত না। তারা চাকরি-বাকরিই করতো।

হেস্টিংস থেকে বজবজ অবধি তখন অনেক কলকারখানা ছিল। IGNR,CIWTC, Clive Jute Mill, Hoogly Jute Mill, Espahani ইত্যাদি। স্থানীয় হিন্দুরা সাধারণত এসব কলকারখানাতে চাকরি করতো। তারা শি(িত ছিল। শ্রমিকের কাজে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এইসব রাজ্যের লোকেরাও কাজ করত। স্থানীয় মুসলিমরা চাকরি বাকরির দিকে ঝঁকত না। পরের গোলামতি না করারও একটা কমপ্লে-ক্সও ছিল। স্থানীয় মুসলিমদের মত হিন্দুরা তখন দর্জির কাজের মত তেমন পরিবেশ বা সুযোগ পায়নি। একটা দর্জিদের কাজ ছেলে তার পরিবেশ বা সুযোগ পায়নি। একটা দর্জির ছেলে তার পরিবেশে দর্জির কাজ দেখতে দেখতেই অনেকটা শিখে ফেলে। এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। কিন্তু হিন্দুরা সে সুযোগটা পায়নি। পেশা হিসাবে তার পারিবারিক পকৃতি বা ট্রাডিশন অনেকটা প্রভাব থাকে। যেমন কসাইয়ের কাজ অনেক সহজ ও লাভ জনক হলেও আমরা বেছে নিতে পারব না। কারণ আমাদের পরিবারের লোক এমন কাজ কখনও ভাবেনি ও করেনি। হিন্দুরা এখন দর্জির কাজের দিকে ঝুঁকেছে বটে। কিন্তু সেটা নি(পায় হয়ে। তখন ওরা নি(পায় হয়নি। এখনও কলকারখানাগুলোতে মূলত হিন্দুরাই কাজ করে। মুসলিমরা তখন সুযোগ পেলেও কাজ করতে চাইত না। পালিয়ে আসত। হিন্দুরা এখনও ১০০০ টাকা

মাইনের চাকরির জন্য ১০০০০ টাকা ঘুষ দিতে রাজি। কিন্তু দর্জি মুসলিমরা এখন অবধি তা করবে না। মেটিয়াব্রুজ হাইস্কুলে তখন বাঙালী হিন্দু ছাত্রই বেশি ছিল। মুসলিম প্রধান এলাকা সত্ত্বে হিন্দু ছাত্র ছিল ৮০ শতাংশ। সে সময় প্রধান শি(ক ছিলেন উপেনবাবু। খুব ভাল লোক ছিলেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দিকে তার কড়া নজর ছিল। শুনেছি এক হিন্দু ছাত্র এক মুসলিম ছাত্রের হাতে মিষ্টি নিতে অস্বীকার করায় তিনি বেত দিয়ে পিটিয়েছিলেন। সে সময় হিন্দু-মুললিম দা(ণ হৃদ্যতা ছিল। ৪৬ এর দাঙ্গার পর তা একটু করে কমেছে বটে তবে আমি কখনও দাঙ্গা দেখিনি। এখানে ও ওখানে হতে শুনেছি। ৪৬ এও দেখিনি। তবে সে সময় টালিগঞ্জ-বালিগঞ্জ এসব হিন্দু প্রধান এলাকায় হয়ত যাইনি ভয়েতে। তখন অবশ্য আমার এরকম টুপি দাড়ি ছিল না। এখন কোন ভয়ের কারণ নেই। আমি তো এখন টুপি দাড়ি নিয়েই রাত ১১টায় হাজরারর মতো হিন্দু এলাকায় যাই। কোন অসুবিধা হয়নি।

বিপীন বিহারী দাসের কাছে আমাদের জমি কেনা। ইনি নুটবিহারী দাসের বাবা। জমিদার ছিলেন। নুটবিহারী দাস বয়েজ ও গার্লস স্কুলের জমি ওনার অনুদান। মুদিয়ালি ফার্স্ট লেনে ওর বাড়ি ছিল। ওর নাতি টুডু আমাদের বাড়ি আসে। ওর থেকে আরো ডিটেলস জানতে পারবেন।

ব্রুকলিন এর কাছে যে ঝিল আছে ওখানে সোনাই বলে একটা অঞ্চল ছিল। বস্তি এলাকা। আমি পড়াশোনা করে যা জেনেছি দর্জিদে একটা গোত্র ওখানে ছিল। বাঙালী মুসলমান নদীর ধার পর্যন্ত বসতি ছিল। কোন কারখানা ওই এলাকা ইজারা নেওয়ার পর গভমেন্ট ও বসতি তুলে দিয়েছে। এখনও কিছু মানুষ ওখানে আছে। তবে তারা বিহারী। আমার নানারা ঐ এলাকায় ছিলেন। (জি-রোজগারের জন্য সন্ধানেই তারা এই এলাকায় চলে আসেন।

সে সময় বড় লোক বলতে ছিলেন বারিক মোল্লা(মোল্লা পাড়া), ওহিদ মোল্লা(মোল্লা পাড়া), সইদুল হক গাজী(গাজী পাড়া) , তৈয়ব হাজী(ডাক্ত(ার পাড়া), ডাক্ত(ার মোহব্বত খান। তবে ওয়াছেন মোল্লার সময়কার ছিল ইলিয়াস মিস্ত্রী। ইনি অবশ্য বিহারী ছিলেন। জি. আর. এস. ই.-এর কন্ট্রাকট্র ছিলেন। খাতুনমহল সিনেমা এনার। মিস্ত্রী ছিলেন। নু(ল হক মালী, হাসেম মোল্লা, হাফিজুদ্দিন মোল্লা, ওয়াছেন মোল্লা, সুবিদ আলি মোল্লা, শাখওয়াত থানদার সে যুগের বড়লোক ছিলেন। এই অঞ্চলেও তারা অনেক সম্পত্তি করেছে। এখন সেভাবে নেই। কিছুদিন আগেও শাখওয়াত থানদারদের (সন্তোষপুর) একটা জায়গা মেটিয়াব্রুজ হাই স্কুল কিনে নিল। কেশোরামের বিহারীরা জায়গাটা বেদখল করে রেখে ছিল। ১২ এ বাস স্ট্যান্ডও ওদের ছিল। মহিত মোল্লাও ছিলেন। টেন্ডারের কাজ ছিল এদের। বাস-টাসেরও ছিল.।।

RECORDED INTERVIEW

মমতাজ বেগম(১৪০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার), রজব আলি মোল্লা এবং অন্যান্যরা
সাতঘরায় ২৯.৩.২০০৫।

১৪০ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটার লিস্ট অনুযায়ী স্থানীয়, অস্থানীয়, পু(ষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ নিয়ে প্রায় ৭০-৭৫ হাজার লোকের বাস। এদের মধ্যে ৪০ হাজার স্থানীয় বাকিটা বাইরের যারা এই শিল্পের সঙ্গে প্রত্য(ও পরো(ভাবে জড়িত। শুধু ১৪০ নয় ১৩৭-১৪১ এই পাঁচটা ওয়ার্ডের লোকেরা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে জড়িত। এদের মধ্যে অনেক বাঙালী হিন্দুও আছে যারা চাকরি বাকরি বা মুদিখানা, স্টেশনারী ইত্যাদি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এদের ছেলেরা এখন অনেকে এমব্রয়ডারি ও অনান্য কাজকর্মে আসছে। অনেকে পড়াশোনাও করছে। দর্জিদের ছেলেরাও এখন দর্জি ব্যবসার দিকে নজর দিচ্ছে না। তারা অন্যান্য পেশার দিকে ঝঁকছে।

আগে যারা দর্জি ছিল তারা এখন ওস্তাগর হচ্ছে এই ব্যাপারটা সত্যি। আমরা ছেলেবেলায় দর্জি ছিলাম, এখন ওস্তাগার। সেদিক দিয়ে দেখলে এই শিল্পের কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান অবস্থা খুবই খারাপ।

আগে এখানে কাপড়ের দোকান ছিল না, কাপড় আনতে হত বড়বাজার থেকে। কিন্তু এখন কাপড়ের দোকান, হাট হয়ে গেছে ঘরের কাছেই। ফলে যে কেউ তিন চার হাজার টাকার পুঁজি নিয়ে ব্যবসায় নামতে পারে। এতে সে স্বাধীনভাবে সপ্তাহে চার-পাঁচশো টাকা রোজগার করতে পারে। অন্যের কাছে কাজ না করে নিজে স্বাধীনভাবে কাজ করে এই টাকাটা রোজগার হয়ে যায় মাত্র। এটাকে ঠিক ওস্তাগারী বলা যায় না। আসলে ব্যবসার পরিস্থিতি মোটেই ভাল নয়।

এই ওয়ার্ডে ৪০ হাজার লোকের মধ্যে ওস্তাগর হবে ৫ হাজার। ৫ জনের পরিবার ধরলে মোট পরিবার হবে প্রায় ৮ হাজার। এদের মধ্যে ছোট, বড়, পেটি ওস্তাগর মিলিয়ে মোটামুটি প্রকৃত ওস্তাগার হবে বড়জোর পাঁচশো। বড় ওস্তাগর গোটা দশ।

এখানে মূলত হয় ছেলে ও মেয়েদের জিরো সাইজ, ১৬ X ১৮ X ২০ বাচ্চাদের বাবাস্যুট। ২০-৩০ ফ্রক, ফ্রি সাইজ সালোয়ার কামিজ ও টু-পার্ট। শার্ট ও প্যান্ট তৈরি হয় চটা ও সন্তোষপুরের দিকে। রাজাবাগান এলাকায় ফ্রক ও বড়তলা এলাকায় বাবাস্যুট

বেশি তৈরি হয়।

হাওড়া হাটের সময় ব্যবসার অবস্থা মোটামুটি ভাল ছিল। তখন ওস্তাগর কম ছিল। কাপড় কিনতে হত বড় বাজার থেকে। কোন ওস্তাগার যে মাল বানাত সেটা অন্য কেউ বানাতে পারতো না। যখন থেকে এখানেই কাপড় পাওয়া যেতে লাগলো, জব্বার -জনতা হাট হয়ে গেল, ব্যবসার অবস্থা খারাপ হতে শু(করলো। এখন যে কেউ অল্প পুঁজি নিয়ে অনায়াসে যে কোন বড় ওস্তাগারের মাল ডুপি-কেট করে বাজারে ছাড়তে পারে। ফলে কম্পিটিশন অনেক বেড়ে গেছে। ওস্তাগরদের পিঠ ঠেকে গেছে। এখানকার ওস্তাগরদের অবস্থা শোচনীয়। দর্জিদের এক টাইম ভাত হয়, এক টাইম হয় না। পূজো আর ঈদে একটু কাজ হয়। সারা বছর কাজ থাকে না। তার উপরে ভ্যাটের জন্য কাঁচা মালের দাম বাড়বে। দর্জিদের পারিশ্রমিক আরো কমবে। দিনে ৫০-৬০ টাকা উপার্জনও মুশকিল হয়ে যাবে। একবেলা যে খাওয়া হচ্ছে তাও হবে না। ছোট ওস্তাগাররা কিভাবে ট্যাক্স দেবে? তারা তো কোন রকমে অল্প পুঁজি নিয়ে , অন্য কোন ওস্তাগারের স্টলে একটু বসকার ব্যবস্থা করে কোন রকমে ব্যবসা চালাচ্ছে। ২ শতাংশ বড় ওস্তাগার আছে। তারা ট্যাক্স দেয়। ভ্যাটের জন্য তারা আরো বড়লোক হবে। অন্যদিকে প্রশানের হেনস্থার শিকার হয়ে ছোট ওস্তাগারদের অবস্থা আরো খারাপ হবে। প্রশানের লোকেরা অথবা সেল ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স, ভ্যাট এইসব কাগজপত্র দেখতে চেয়ে রাস্তায় মাল আটকে দেবে। তারপর ভয়-টয় দেখিয়ে ২০০-৫০০-১০০০ নিয়ে নিজেদের পেট ভরাবে। বাঙলা রেডিমেড গার্মেন্টস চেম্বার অফ কমার্স বড় ওস্তাগারদের জন্য তৈরি হয়েছে। বড় ওস্তাগর আর নেতারা বসে একসঙ্গে চা খাচ্ছে।

এখানকার মানুষরা বাইক কিনছে ঠিকই। নতুন গাড়ী বার হলে তাও এখানে সর্বপ্রথম আসে। সাধারণ মানুষ যার মোবাইলের প্রয়োজন নেই সেও স্টাইলের জন্য মোবাইল ব্যবহার করছে। ওরা বলছে তবে ওস্তাগররা ভ্যাট দিতে পারবেন না কেন? কিন্তু কিভাবে করছে, সরকার তাতো জানে না। কিস্তিতে গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে। ওস্তাগররা কোনরকমে এর টুপি ওর মাথায়, ওর টুপি এর মাথায় দিয়ে তা করছে । আমরা মধ্যবিত্তরা ট্যাক্স দেওয়ার প(কিন্তু তার তো একটা নিয়ম থাকতে হবে। হঠাৎ করে তো কোন কিছু সম্ভব নয়।

ট্রেড লাইসেন্স আগে ৬৫-৭০ টাকায় পাওয়া যেত। এখন তার পিছনে যত রকমের ফ্যাকড়া লাগাবার লাগিয়ে দিয়েছে। এখন তার দাম ৫৫০ থেকে ৬০০ টাকা হয়ে গেছে। তার উপর বিভিন্ন রকম অনিয়ম। আমি ট্রেড লাইসেন্সের টাকা জমা দিয়ে বিল নিলাম অথচ কর্পোরেশন বলল সে টাকা তাদের খাতায় ওঠেনি। হেড অফিসে গেলাম, তারাও বলল টাকা খাতায় ওঠেনি। ট্রেড লাইসেন্স আমাদের করতেই হয়। তা নাহলে কর্পোরেশন এসে ঝামেলা করবে। ১৯৭০ সালে হাওড়া হাটে বছরের শেষে ওরা টোকেন নিয়ে এসে টাকা আদায় করত। এখন তা আর নেই। ভ্যাটে একটা মালের উপর বিভিন্ন স্টেজে সবাইকে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে ফলে ৮০ টাকার একটা মালের দাম পড়ে যাচ্ছে ১৫০ টাকা।

আমরা দর্জিরা লেখাপড়ার অভাবে একজায়গায় দাঁড়াতে পারিনি। ছোট ছোট অন্য শিল্পের মানুষরেও একটা ইউনিয়ন আছে। কিন্তু আমাদের শিল্প এত বড় হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কোন ইউনিয়ন নেই। ৪০ হাজার মানুষের মধ্যে ৪০ জনকেও এক জায়গায় পাওয়া যাবে না। আমরা শুধু মালটা তৈরি করে কখন কিভাবে বেচব শুধু এইটা নিয়েই ভাবি। আমরা অন্য ভাইয়ের কি হল না হল এ নিয়ে কিছু

ভাবিনা। অবশ্য এখনকার ছেলেরা লেখাপড়া শিখছে তবুও তারা বাকি লোকের সঙ্গে পেরে উঠছে না। আমরা একসঙ্গে দাঁড়াতে পারছি না।

চেম্বার অফ কমার্স শুধু বড় ওস্তাগরদের জন্য তৈরি হয়েছে। তারা ছোট ওস্তাগরদের আসতে বললেও তাদের কোনরকম গ্রাহ্য করেনা। আগে নিয়ম ছিল কাস্টমার মাল নিয়ে পয়সা দিয়ে যেত। মাঝে মাঝে অনুরোধ করত মালটা একটু অমুক জায়গায় দিয়ে আসতে। কিন্তু এখন নিয়ম হয়ে গেছে কাস্টমার মাল পছন্দ করে বলল অমুক জায়গায় পৌঁছে দিতে। পৌঁছনোর পর বলল টাকার জন্য অমুক সময়ে আসতে। তারপর সেই সময় টাকা আনতে গিয়ে টাকা আনল চার ঘন্টা পর। কেন এমন হবে? কিছু ওস্তাগার অবশ্য এখনও আছে যাদের এসবে পড়তে হয় না। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কম। বড়জোর ১ শতাংশ।

গদিওয়ালারা একটু বেশি মাল নেয়। মাল নেওয়ার পর ক্যাশ দেওয়ার সময় আগে তারা ৩-৪ শতাংশ কেটে নিত। কিন্তু সেটা বাড়তে বাড়তে এখন ১৩-১৪ শতাংশে পৌঁছে গেছে। তাও ক্যাস নয়। একটা কাগজে লিখে দেয় যাকে (ক্কা বলে। দুমাস পরে সেটা ক্যাস হবে। আবার বলে দিচ্ছে যদি ক্যাস লাগে তবে আমার ঐ ভাইয়ের কাছে যাও সে ৩ শতাংশ নিয়ে ক্যাস করে দেবে। এইভাবে একটা মালের উপর মিডল ম্যানদের হাতে ১৫ শতাংশ চলে গেল। এইভাবে মালটা যখন কাস্টমারের হাতে পৌঁছাচ্ছে তখন মালটার দাম অনেক বেড়ে যাচ্ছে। ফলে সারা ভারতবর্ষে মেটিয়াব্রুজের মালের সস্তা হিসাবে যে সুনাম ছিল তা নষ্ট হচ্ছে। ব্যাজ দেওয়ার এই রীতি আমাদেরই দুর্বলতার জন্য চালু রয়েছে। বড় ওস্তাগাররাই চালু করেছে। আমরা ছোটরা না দিলে আমাদের মাল বিত্রি(হবে না। আমরা এখনও (খে দাঁড়ালে এসব বন্ধ হতে পারে। চেম্বার অফ কমার্স এর প্রতিবাদ করতে পারে। কিন্তু করেনা।

এই ব্যবসাতে এই এলাকায় সরকারী কোন লোন বা অনুদানের ব্যবস্থা নেই। WBMDFC এর লোন কিছু মানুষ পেয়েছে তবে যারা পার্টি-পলিটিক্সের সঙ্গে যুক্ত(আছে বা নেতার ছেলেরা তারা পেয়েছে। সাধারণ মানুষ তা পায় না। যারা ব্যাঙ্কের লোন নিয়েছে তারা নিজের সম্পত্তি মর্ডগেজ দিয়ে লোন নিয়েছে। মাইনরিটির লোনের একটা প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে গারান্টির সরকারি বা আধাসরকারি শি(কের সই লাগে গ্যারেন্টার হিসাবে। এখানে তেমন লোক কোথায়? ভালোভাবে ব্যবসা করতে গেলে অন্তত ৪০-৪৫ হাজার টাকার প্রয়োজন। ওদের উইদআউট গ্যারেন্টারে ২৫ হাজার টাকার ক্লাস্টার লোনের ব্যবস্থা আছে তাতে কিছু হয়না। বড় লোন বড় নেতার ছেলেরাই পেয়েছে যাদের দরকার নেই। কাজ জানে অথচ পুঁজির অভাবে করতে পারছে না এমন কোন ছেলে সে লোন পায়নি। ওরা যে বিজ্ঞাপন দেয় তা নেহাতই লোক দেখানো। বাইরের লোক এখানে প্রথম থেকেই আছে। ৭৮-৮০ এর পরে অনেক বেশি এসেছে। কিন্তু ৯৫-২০০০ এর পর থেকে তারা আর সেভাবে আসছে না। এখন পল্লীগ্রামে একটা হাওয়া উঠে গেছে যে দর্জির কাজ করলে আর বিয়ে হবে না। ব্যবসাটা এখন এতো খারাপের দিকে চলে গেছে। আগে ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়া ছেলেরা এখানে আসতো। আমি ৪০-৫০ টা ছেলেকে এভাবে মানুষ করেছি। কিন্তু গত ১০ বছরে আমি কাউকে রাখতে পারিনি। এখানে এখন তিন-চার মাস কাজ হয়। পূজোর কাজের চাপ আগে ছিল। এখন আর নেই।

মিডিলম্যানেরা এখান থেকে মাল নিয়ে দেশের বাইরে পাঠাচ্ছে। এখানকার ছেলেরাও এখন লেখাপড়া শিখছে। সরকার যদি মালগুলো এখানকার ছেলেদের মাধ্যমে সরাসরি বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে তবে ভাল হয়। হাওড়া হাটে যাওয়ার জন্য যে বাস সার্ভিস আছে তা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। সরকার সে(ত্রেও কিছু ভূমিকা নিতে পারে। এতে চটা, বাটা, রায়পুর সহ সমস্ত মানুষ যারা এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত আছে তারা উপকৃত হবে। আমরা যে স্যাম্পেল আনি তা বোম্বে থেকে। তারা আবার অনেক সময় সে সব ডিজাইন পায় বাইরে থেকে। এসব আধুনিক ডিজাইনের জন্য চাই আধুনিক মেশিনপত্র। সেগুলো অনেক দামি। সরকার সে(ত্রেও কিছু লোনের ব্যবস্থা করতে পারে। এতে কর্মসংস্থান আরো বাড়তো।

এখানে কমপে-ক্স হওয়ার যে কথা ছিল সেটা শেষ অবধি হয়নি। হলে কি সুবিধা অসুবিধা হতো তা বলা যাচ্ছে না। তবে নিয়ন্ত্রণ নিশ্চয়ই পুরোপুরি সরকার ও রাজনৈতিক দলের হাতেই থাকত। কোটা সিস্টেম উঠে যাওয়ায় যে এক্সপোর্ট অর্ডার ইন্ডিয়ার হাতে আসবে সেগুলো নিশ্চয়ই মাড়োয়ারী, গুজরাটি। সিন্ধীদের হাতে চলে যাবে। সরকার এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ভাল হয়। এক্সপোর্টের সাব কন্টাকের কাজ এখানে ৫-৭ বছরের আগে কয়েকজনের ছিল। এখন আর কারো নেই। এতে পেমেন্ট, রিজেকশন এসবের অনেক সমস্যা আছে।

উর্দুভাষীরা এখন এমব্রয়ডারীর কাজে এসছে। তারা অনেকে লেখাপড়া শিখছে, অন্য কোন পেশার খোঁজ করতে করতেই এমব্রয়ডারী পেশায় এসে গেছে। বাঙালীরা যে করছে না তা নয়, করছে তবে আগের থেকে কম। আগে সপ্তায় এক বা দুই দিন হাট হতো। কিন্তু এখন প্রায় রোজ দোকানদারির ব্যাপার চলে এসেছে। ফলে কোন ছেলেকে ঐ কাজে লাগানোর মতে সময় আর নেই।

পরিবার ভেঙে যাওয়ার ফলে ব্যবসার (তি হয়েছে। বিশ হছর আগে গার্ডেনরীচের দর্জিশিল্পের যে উন্নতি ছিল তা পারিবারিক বন্ধনের ফলে। আগে একই লেবেলের মাল ছয়ভাই একই দামে বিক্রি(করতে পারত। এখন আলাদা হয়ে যাওয়ায় ছয়ভাইয়ের মধ্যে কমপিটিশন এসে গেছে। তাছাড়া এতে পরিবারের খরচাও বেড়েছে। বাইরের লোকের সাহায্য নিতে হচ্ছে ফলে ঘরের পয়সা বাইরে চলে যাচ্ছে। বিলাসিতাও বেড়ে গেছে। দর্জি শিল্পের অবনতির এটাও একটা কারণ।

UNRECORDED INTERVIEW

সুতো ব্যবসায়ী রাজীব দাস। তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল ১৮/২/২০০৫ শুক্র(বার বেলা ১১.০০টা নাগাদ। রাজীব দাস একজন শি(ত যুবক। ব্যবসা করে তার ভাইয়ের সঙ্গে।

—কিভাবে এ ব্যবসায় এলে?

—আগে থেকে কোন পরিকল্পনা ছিল না। চাকরির বাজার খারাপ হওয়ায় ভাই এ ব্যবসাটা শু(করে। আমিও এর সঙ্গে আছি।

—কতদিন ব্যবসা করছো?

—মোটামুটি ১ বছর।

—দোকান কি তোমাদের নিজস্ব নাকি ভাড়া?

—ভাড়া, মাসে লাইট ফ্যান নিয়ে ৪৫০ টাকার মতো।

—দোকানটা কোথায়?
—রামদাসহাটি অঞ্চলে।
—মোটামুটি কত রকমের সুতো আছে?
—৫-৬ রকম। এমব্রয়ডারি সুতো, ইন্টারলক সুতো, স্টিচিং সুতো, লাইৰন সুতো, কাচের সুতো।
—এই সুতোগুলোর কি কোন প্রকারভেদ আছে?
—হ্যাঁ, কাঁচাসুতো, পাকাসুতো। কাঁচাসুতোর রং উঠে, কিন্তু পাকাসুতোর রং উঠবে না।
—এই ধরণের সুতোগুলো কি এইখানেই তৈরি হয়?
—হ্যাঁ, এইখানেই তৈরি হয়। তবে বাইরেও নিশ্চয় হয়।
—এখানে কোথায় হয়?
—যেমন 'পারফিপ' বলে একটা কোম্পানি আছে, ওরা রঙ ব্যবসায়ী। হাজীপাড়া, সিমপুকুর লেনের দিকে। 'সনি' একটা কোম্পানি, ধান(তির দিকে এছাড়া আরো কিছু সুতো প্রস্তুতকারক আছে, তবে তারা ছোট।
—তোমরা কি রকম রেটে সুতো কেনো?
—আমরা পাইকারি রেটে মাল কিনি। যেমন—এমব্রয়ডারি সুতোটা(পাকা) আমরা কিনি ২৮ টাকা ত, কাঁচাটা কিনি ১৮-২০ টাকা ত। ইন্টারলক সুতোটা পাইকারি কিনি ১৮-৩৬ টাকা(গ্রাম হিসাবে)। ২০০-৫০০ গ্রাম অভধি হয়। এর কোন কাঁচাপাকা নেই। স্টিচিং সুতোটা কিনি ৩০ টাকা ডজন। এমেটো/পাওয়ার (কোম্পানি) সুতো ৪ টাকা থেকে ২ টাকা পিস(রিল), লাইলন সুতোটা কিলো হিসাবে, মোটামুটি ১০০ টাকা স(/মোটা অনুযায়ী। এচেট সুতোটা আমরা বেচি না। ওটা আমি বলতে পারবো না।
—কি রকম লাভ থাকে?
—যা কিনি তার উপর মোটামুটি ১০ শতাংশ। কেউ কেউ ১৫-২০ শতাংশ লাভও রাখতে পারে।
—যারা কেনে তারা কি বড় ব্যবসায়ী।
—বড় ব্যবসায়ী হচ্ছে ওস্তাগাররা। তারা কিন্তু সুতোটা কেনেনা। সুতো কেনে দর্জি। যাকে খাটাচ্ছে ওস্তাগার। আর আমাদের এই অঞ্চলে বলতে গেলে সব দর্জি সমান। বড় দর্জি আর কোথায়।
—তারা মালটা কিভাবে কেনে?
—অধিকংশই নেয় ধারে-বাকিতে। কিছু দিল, বেশ কিছু বাকি রাখলো। অনেক সময় টাকা চোটও করে দেয়। তারা যেহেতু নিয়মিত মাল নিচ্ছে, অসুবিধা হলেও আমরা মালটা দিয়েছি।
—তোমরা যে পাইকারি মালটা কেন, কিভাবে কেন?
—আমরা ক্যাশ দিয়ে কিনি। তবে অনেকে ধারেও নেয়।
—দর্জিরা কি নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল নিয়মিত কেনে?
—যখন যেমন দরকার হয়। রং মেলবার একটা ব্যপার থাকে।
—সুতোর যেসব কোম্পানি, যেখানে সুতো তৈরি হয়, সেগুলোকি সব হিন্দুদের নাকি মুসলমানদের?
—সবই মুসলমানদের।
—যারা এই সুতোর কারবার করে তারা কি সব মুসলমান নাকি হিন্দু।
—অধিকাংশ মুসলমান। আমাকে নিয়ে বোধহয় দু-তিন জন এই যোগাড়ে কারবার করে।
—কি কারবার বললে?
—যোগাড়ে। এই ধরণের সুতোর কারবারকে এ অঞ্চলে চলতি কথায় 'যোগাড়ে' কারবার বলা হয়।
—এই ধরণের ব্যবসা যারা করছে তারা কি শি(ত সম্প্রদায়ভূত?
—একেবারেই নয়। আমি যাদের সঙ্গে ব্যবসা করি তারা কেউই সেরকম লেখপড়া জানা নয়।
—হাটে যে সব ত্রে(তারা বাইরে থেকে মাল নিতে আসে তারা কিন্তু তৈরি মালটা অর্থাৎ রেডিমেড মালটা নেয়। তাদের সুতোর প্রয়োজন হয় না। হাটে একটাও সুতোর দোকান নেই। হাটের কাছাকাছি থাকতে পারে, হাটে নেই।
—হাটে যারা মাল নিতে আসে তারা তো বাইরে থেকে আসে, তারা থাকে কোথায়?
—অধিকাংশই দিনের দিন মাল নিয়ে ট্রেনে উঠে পড়ে। আর যারা থেকে যায় তারা বটতলা অঞ্চলে বেশ কিছু লজ হয়েছে, সেখানে থাকে।
—এই ব্যবসা(যোগাড়ে ব্যবসা) করতে কত পুঁজির দরকার হয়?
—এটা ব্যবসায়ীর উপর নির্ভর করে। তবে যদি সবকিছুর ব্যবসা করে অর্থাৎ বোতাম,চেন,পকেটের থান তবে লাখ দুই-

আড়াই লাগবে। আর যদি শুধু সুতোর ব্যবসা করে তবে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা নিয়েও নামা যেতে পারে।
—এই ব্যবসায়ে তোমাদের লাভ কিরকম হয়?
—এটা বলা খুব মুশকিল। প্রথমত এই ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ। অধিকাংশ দর্জি কোন রকমে চলে, ফলে ধারে মাল দিতে হয় প্রচুর। তার ফলে লাভ সে ভাহে চোখে দেখাই মুশকিল। ওই ব্যবসাটাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় আরকি। তবে বড় ব্যবসায়ীদের কথা আলাদা। তবে তারা সংখ্যায় খুব কম।
—তুমি কি শুধু সুতোর ব্যবসাই করো?
—না, বোতাম, পকেট এসবও রাখি।
—কি রকম দামে কেনো?
—বোতামের প্যাকেট ২০ টাকা থেকে শু(করে ২০০/২৫০ টাকা কোয়ালিটি অনুযায়ী। পকেট বলতে থান। ৫ টাকা থেকে ২০-২৫ টাকা মিটার।
—পকেটের কি কোন রং আছে?
—মূলত সাদা/কালো।
—এইসব মাল কোথা থেকে কেনো?
—বটতলা থেকে, বড় বাজার থেকে।
—বোতাম কি এখানে তৈরি হয়?
—খুব বেশি নয়। দু-একটা জায়গায় হয় হলে শুনেছি। আমরা যে বোতাম কিনি সেগুলি বোম্বে প্রোডাকশন। তবে বোতামের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা কম।
—এই ব্যাপারে ভবিষ্যৎ কেমন?
—যার উপর নির্ভর করে এই ব্যবসা সেটার অবস্থা ভীষণ খারাপ। কাজেই আমাদের এই ব্যবসার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষ কিছু ভাবা যায় না।
—এই ব্যবসার জন্য কি বিশেষ কিছুর ট্রেনিং দরকার?
—না। কিছুই না।
—ধন্যবাদ।

UNRECORDED INTERVIEW

সাজিদ আহমেদ। বাবা সুলতান আহমেদ। কথা হচ্ছিল সাজিদের ঘরে বসে ১০/১/২০০৫। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টা নাগাদ।

—আপনি তো দর্জি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত।
—হ্যাঁ। আমি ব্যবসাই করি।
—আপনি কতদূর পড়াশুনো করেছেন?
—বি. এসসি., বেহালা কলেজে, ১৯৯৩ তে স্নাতক হই।
—দর্জি শিল্পে তো একজন ব্যতিত্র(ম। এরকম শি(ত দর্জি তো সচরাচর দেখ যায় না।
—হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। তবে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বেশ কিছু আছে।
—আপনি কতদিন এই ব্যবসায় আছেন?
—প্রায় পাঁচ বছর।
—আপনার বাড়ির লোক আপনাকে সাহায্য করেন?
—হ্যাঁ, আর্থিক সাহায্যটা বাবা-ই করেছেন।
—না, আমাদের পরিবারে তো এই ব্যবসার চল ছিল না। তাহলে আপনি এলেন কিভাবে?
—না, আমাদের পরিবারে এই ব্যবসার কোন চল ছিল না। আমি ১৯৯৩ তে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বের হবার পর দেখলাম চাকরি বাকরির অবস্থা খুব খারাপ। এপাশ ওপাশ চেষ্টা করেও দেখলাম কিছু হল না, তখন পাশের বাড়ির অনেক ছেলেই এই কাজ করতো তারপর দেখলাম কাজটা খারাপ নয়। তারপর আমিও শু(করলাম।
—আপনি কি তৈরি করেন?

—মেয়েদের চুড়িদার।
—সবটাই কি আপনি করেন?
—না, ভাগ ভাগ কাজ আছে।
—কি রকম।
—প্রথমে কাপড়টা আনা হয়।
—কাপড়টা কোথা থেকে কেনেন?
—বড় বাজার থেকে বা বটতলায় থেকে।
—তারপর?
—কাটিং করি আমি নিজেই। তবে অনেক সময় বাইরে থেকে করাতে হয়।
—বাইরে বলতে কি এই অঞ্চলে? তাদের কি রকম রেট দেন?
—সবই এই অঞ্চলে। ২ টাকা পিস।
—তারপর?
—এরপর এমব্রয়ডারি।
—সেটা কোথায় করান। কি রকম রেট?
—এই অঞ্চলেই হয়। ৩০-৩৫ টাকা পিস। সুতোর খরচ তাদের।
—সুতোর কি রকম দাম?
—পাকা সুতো ৩২-৩৫ টাকা কোন। কাঁচা ১৫-২০ টাকা কোন।
—কাঁচা সুতো, পাকা সুতো মধ্যে তফাৎটা কি?
—কাঁচা সুতো রং উঠবে, পাকা সুতোর তা হবে না।
—এমব্রয়ডারির পর কি হয়?
—তারপর সেলাই।
—কে করে?
—আমি নিজেই করি। তবে অনেক সময় বাইরে থেকেও করাই।
—কি রকম রেট দেন?
—প্রতি পিস ১০-১২ টাকা। ডিজাইনের উপর নির্ভর করে।
—তারপর?
—তারপরেই প্যাকিং। একটা বাক্সে একটা প্যান্ট সমেত। তবে যেটার কোয়ালিটি ভালো। অথবা একটা বাক্সে ৬টি, যেটার কোয়ালিটি তুলনামূলক লো।
—প্যাকিং কি আপনারাই করেন?
—হ্যাঁ। বাইরে থেকে লোক আনতে হয় যদি খুব বেশি মাল থাকে। সে(ত্রে ১০০ টাকা সপ্তাহে দিতে হয়।
—প্যাকিং এর এই বাক্সটি আপনারা কোথা থেকে কেনেন? কি রকম দাম?
—এই অঞ্চলেই তৈরি হয়। ৫-৬ টাকা পিস।
—এটা কি মুসলিম ভাইরাই তৈরি করে?
—না। হিন্দুরাও কিছু কিছু করে।
—মালটা প্যাকিং এর পর কোথায় বিত্রি(করেন?
—জব্বার হাটে।—আপনার কি নিজের গদি আছে?
—না।
—জব্বার হাটে কি রেটে বিত্রি(করেন?
—যেটা ১ টা বাক্সে একটা থাকে সেটা ২০০ টাকা, প্যান্ট ওড়না নিয়ে। আর যেটা ৬ টা থাকে একটা বাক্সে, সেটা পুরো বাক্স ৯০০ টাকা। মোটামুটি ১ টা ১৫০ টাকা।
—এই দামের কি কোন হেরফের হয়?
—সাধারণত পূজো বা ঈদের সময় সবরকম মালেরই কমবেশি হেরফের হয়।
—সাইজের ব্যাপার কি রকম এই সব মালের?
—৩২,৩৪,৩৬ এরকম আরকি।

—মোটামুটি ১০ ডজন মাল তৈরি করতে কত সময় লাগে?
—১ সপ্তাহ।
—১ টা থানে কতটা কাপড় থাকে?
—মোটামুটি ৯০-১০০ মিটার।
—কিরকম দাম?
—২৫-৩৫ টাকা প্রতি মিটার। তবে পূজো বা ঈদের সময় দাম বাড়ে। ৩৫-৪০ এর মতো হয়।
—এই থান তৈরি হয় কোথায়?
—আমেদাবাদ, গুজরাট, সুরাট।
—আপনার মালের ত্রে(তারা কোথা থেকে আসেন?
—চেন্নাই,বিহার, দিল্লি—সবই বাইরের।
—এখানকার ত্রে(তারা নেন না?
—না।
—কারণ কি?
—চলে না।
—কিন্তু এখানকার মেয়েরাও তো দেখি চুরিদার, ওরনা ব্যবহার করছে। তারা কোথা থেকে কিনছে?
—এখান থেকেই নিচ্ছে। কিন্তু সে মাল আমরা তৈরি করিনা। কারণ আমাদের মালটা একটু লো কেটাগরির। এখানে ভালো ভালো ত্রে(তারা নেয় না। গড়িয়াহাট, দ(ণাপনে যে মাল যায় তার কিছু মাল এখানে তৈরি হয় বটে তবে সবটা নয়। মূলত বড় ব্যবসায়ীরাই ওই মাল তৈরি করে।
—দিল্লি, বিহার, চেন্নাই থেকে যেসব ত্রে(তারা আসছে তারা মালগুলো কি এখান থেকে নিয়ে গিয়ে দিল্লি বা বিহারের শহরাঞ্চলে বিত্রি(করছে না গ্রামাঞ্চলে?
—মূলত গ্রামাঞ্চলে। যেখানে মানুষ কিছুটা অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে।
—আপনার কি লাইসেন্স আছে? কারণ এখানে অনেকেরই লাইসেন্স নেই বলে শুনেছি।
—আমার লাইসেন্স আছে। তবে এখানে ব্যবসা পড়ে গেছে। বছরে একটা সময় কাজ থাকেই না, তারফলে লাইসেন্স করে আর কি করবে।
—আমি শুনেছি ঘুড়ি শিল্পে অধিকাংশ ব্যবসায়ীরই লাইসেন্স আছে।
—হতে পারে। তবে ঘুড়ি শিল্পও পড়ে গেছে আগের থেকে।
—শোনা যাচ্ছে, শ্যামনগর বা বোনগাঁর দিকে এই দর্জি শিল্পটা বেশ প্রসার লাভ করেছে।
—হ্যাঁ, ওরা অনেকটা হাজার ধরেছে।
—সেই বাজারটাতো আপনাদেরই ছিলো ওরা কি করে ধরলো?
—ওরা অনেক সস্তায় মাল দিতে পারে। তাছাড়া মানও খুব খারাপ। আমরা অতো সস্তায় মাল দিতে পারি না। তার ফলে প্রতিযোগিতায় আমরা পারছি না।
—আপনি তো একজন ওস্তাগর। আপনি কি মনে করেন এ ব্যবসার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে?
—এ ব্যবসার তেমন ভবিষ্যতের কথা বলা যাচ্ছে না। সরকারের কোন পরিকল্পনা নেই। আমাদের মধ্যেও তেমন পরিকল্পনা নেই। ত্রে(তারা যতটা সম্ভব কমে মাল চায়। আমরাও তাই করবার চেষ্টা করি। তার ফলে মানের দিকটা ঠিক থাকে না। প্রচুর লোক একাজে আসছে। তার ফলে প্রতিযোগি বাড়ছে। উপযুক্ত(লাভ চোখে পড়ছে না।
—এখানে 'ব্যাজ' ব্যবস্থা বলে একটা চালু ব্যাপার চালু আছে। এ ব্যাপারে কিছু বলুন।—ত্রে(তারা দামের উপর একটা অংশ কাটার চেষ্টা করে। যেটা আগে ১-২ শতাংশ ছিল। এখন বেড়েছে। ৫-১০ শতাংশ, ১২ শতাংশ পর্যন্ত হয়। তবে সবটাই ত্রে(তা ও বিত্রে(তার উপর নির্ভর করে। যেমন—আমি কোন ব্যাজ দিই না। প্রথমেই বলে দি 'ব্যাজ' দেব না। মাল নিতে হলে নাও, না নিলে না নাও।
—এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনারা কি কখনও মুখ খুলেছেন?
—না। আমাদের এখানে একেবারেই একতা নেই।
—সরকারী কোন ঋণ বা কিছু পেয়েছেন?
—না। কিছু পাইনি।
—এই ফ্যাশান টেকনোলজির ব্যাপারে কিছু ট্রেনিং....। মহেশতলায় এরকম একটা কি হয়েছে!

—হয়েছে শুনেছি। ওটা সরকারি কিনা বলতে পারবো না।
—আপনি তো যথেষ্ট শি(ত দর্জি। আধুনিক ফ্যাশানের ব্যাপারে কিছু ভাবছেন?
—চেষ্টা করছি। টিভি সিরিয়াল বা সিনেমায় যে রকম ডিজাইন দেখি সেগুলো কিছু নেবার চেষ্টা করি।
—এই পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন পেশায় গিছে এরকম কি আপনার জানা আছে?
—হ্যাঁ, এরকম হয়েছে বৈকি।
—এই দর্জি পেশায় যারা আছে তাদের শি(ার মান কি বাড়ছে?
—আগে তো তেমন কিছু ছিল না, এখন সে তুলনায় কিছু বেড়েছে।
—এই রকম পরিবারে থেকে উচ্চশি(ত হয়েছে এরকম আপনার জানা আছে?
—হ্যাঁ, ডাক্ত(ার হয়েছে, ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। বটতলার দিকে, এদিকে নয়।
—এদিকে যারা জেলে সম্প্রদায় আছে তাদের মধ্যে কি মুসলমান আছে?
—কিছু আছে।
—তারা কি এই পেশার সঙ্গে জড়িত?
—কিছু জড়িত। তবে সেসব (ে ত্রে মাছের ব্যবসাচা তাদের কাছে শখের বলতে হবে। কিছুটা সাইড ইনকাম।
—আপনি বলেছিলেন এই ব্যবসাটা পড়ে আছে। তাহলে প্রতিযোগির সংখ্যা বাড়ছে কেন, নতুনরা কেন আসছে?
—অধিকাংশটাই তো পারিবারিক ভিত্তিতে। বাবা করছে, ছেলেও আস্তে আস্তে কাজ করছে। পরপর চলে আসছেন এই পেশায়। অন্য কোন কাজ জানেনা। লেখাপড়াও শেখা নেই যে অন্যান্য কাজ করবে।
—আপনারা অন্যান্য ভাই কি কাজ করে?
—একজন এন. বি. সি. এস পেয়ে গেছে। আর এক ভাইও পাব্লিক সার্ভিস কমিশন পরী(া দিয়ে চাকরি পেয়েছে।
—সবাই অবিবাহিত?
—সবাই।
—আপনার কি মনে হয় আপনার অন্যান্য বন্ধুরা যারা ছোটখাটো চাকরি করছে। মোটামুটি তিন, সাড়ে তিন হাজার টাকায় তার চাইতে আপনি ভালো আছেন?
—হ্যাঁ, এক এক সময় তো তাই মনে হয়।
—ব্যবসা পড়ে যাবার কথা যেটা বললেন, কিন্তু মানুষ তো আর বস্ত্র ছাড়া বাঁচবে না তাহলে ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা কেন?
—আসলে প্রচুর লোক আসছে। লাভের অনুপাত কমছে। পুরনো ধ্যান ধারনাতেই চলছে। কোন পরিকল্পনা নেই। এরকম তো তলতে পারে না।
—আধুনিক ফেব্রিক ডিজাইনটা চলছে.....
—আমি চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু তার প্রোডাকশন কোস্ট বেশি হবার জন্য মালের দাম বাড়ে। সেই দামে মানুষ এই মাল কিনবে না। তাছাড়া একার প(কোন পরিকল্পনা নেওয়াই সম্ভব নয়। সবাই মিলে মিশে একরকম। বড় ব্যবসায়ীরা একা কোন পরিকল্পনা নিতে পারে। কিন্তু আমরা পারি না। আমাদের অত টাকা নেই।
—মধ্যপ্রাচ্যে কি এখানকার মাল যাচ্ছে।
—খুব কম। মুলত মুম্বাই এর মালই বেশি যায়।
—ঠিক আছে। ধন্যবাদ আপনাকে।

RECORDED INTERVIEW

মইনুদ্দিন পুরকাইত(সাহায্যকারী ছেলে সামসুদ্দিন পুরকাইত)
হাজিরতনের বাড়িতে ৯.৮.২০০৪

বটতলায় এখন এতো কাপড়ের দোকান মারোয়ারিদের। এটা আগে ছিলো না। যা ছিলো বড়বাজারে। বাবার সঙ্গে একটা মাড়োয়ারি পরিবারের বন্ধুত্ব ছিলো। বাছোয়াত ব্রাদার্স। বটতলা পেট্রোল পাম্পের কাছে ক্যাপ্টেনদের ডাক্ত(ারখানা। বড়বাজারের পচা গলি—নুরমল লোহিয়া লেনে ওদের ডাক্ত(ারখানা ছিল। ভায়ে ভায়ে ভাগ হয়ে গেল। ভমরাওমল লালজী বাছোয়াত। ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল কাপড় কেনার সূত্রে। ও প্রথম এখানে দোকান করল। ওমরাওমল বাছোয়াত। এর আগে কোন মাড়োয়ারি আসেনি। ১৯৬৫-৬৬ সালে প্রথম দোকান হল। কিছুদিন চালিয়ে বন্ধ হয়ে গেল। ঠিকমতো দোকান হচ্ছে না, লোকে

ঠিকমতো পয়সা দেয় না। একবছর মতো চলল। তিন ভাই ছিল। ওরা নেই, ওদের জ্ঞাতিরা আছে। ওরা বড়বাজারেই থাকে। বাছোয়াতদের সঙ্গে হাওড়া হাটে আলাপ হয়েছিল। ওরা টাকা আনতে যেত হাটে। ওরা থান বিত্রি(করত। দর্জি পাড়ায় মাল সব মাড়োয়ারিদের কাছ থেকেই আসে। স্থানীয় লোক যারা কাপড়ের দোকান এখন করছে, তারা ওদের কাছ থেকে নিয়েই ব্যবসা করছে। কেউ ডাইরেক্ট আনতে পারে না। একটা দুটো ওস্তাগার আছে, তারা হযতো বম্বে থেকে নিয়ে আসে। মিল থেকে আনে। সুতো এখানেই পাওয়া যায়, বড়বাজার থেকে নিয়ে এসে এখানে বিত্রি(করে, লাইটহাউস কোম্পানী। অনেকে বড়বাজার থেকে কিনে রং করে নিজেদের ব্র্যান্ড-নেমে বিত্রি(করে।

পরিচিত না হলে মাড়োয়ারিরা ধারে মাল দেয় না। ব্যবসা করতে করতে পরিচিত হয়। দু-চার সপ্তাহ দেখে বি(্বাসের ওপর ছেড়ে দেয়। ওমরাওমল কালী পূজোর সময় গিফ্ট দিত। আমাদের এলিজাবেথ কোম্পানীর টেপ রেকর্ডার দিয়েছিল। ওসব দিন আর নেই।

(মইনুদ্দিন পুরকাইত) আমার বাবারা তিনভাই ছিল। আহমদ আর মহম্মদ পুরকাইত। ওসিম পুরকাইতের ছেলে ছিল আহমদ আর মহম্মদ।

আমাদের ছোটবেলায় ফটকে ধান বিত্রি(হতো। কানখুলি স্কুলের পিছনে চাষ আমরাও(সামসুদ্দিন) দেখেছি। বদরতলার দিকেও হত। খালধারীর খালে নৌকা চলতো। নৌকায় আসত গোলপাতা, মাছ। ঘর ছাওয়া হতো গোলপাতা দিয়ে। ফটকে মিলিটারিরা ক্যাম্প করেছিল, ওই জন্য ফটক নাম। যখন দেশ স্বাধীন হয়েছিল, রায়ট হল, সেই সময়। ছাউনিতে ঢোকার রাস্তায় গেট ছিল। এখন যেখানে হাউসিং, দত্তবাগান, ওখানে ছাউনি ছিল।

আমাদের(সামসুদ্দিন) প্রাইভেট পড়াতো খ্রীষ্টান মাষ্টার। তার মেয়েও এসে পড়তো। দত্তবাগানের ওখানে ওরা থাকতো। একটা ছোট চার্চও আছে। ওরা ছিল 'বি(্বাস'।

এখানে হাজিরতনে দরগা আছে। দরগাটা খুব জীর্ণ ছিল। ৬২-৬৩ সালে দরগা বলতে একটা বটগাছ ছিল, ছোট একটা গম্বুজ ছিল। মাটি থেকে পাঁচ-ফুট ওপরে। তারপর ২০-২২ বছর হল, ওখানে পয়সাওলা লোকেরা ওটাকে ভেঙে ফেলে বড়ো করে তৈরি করলো। যেমন সত্যপীরের ওই জায়গায় আগে যখন গেছি, কিছুই ছিল না, সাপের আড্ডা। দড়ি বাঁধা নৌকা করে যেতে হত। গাঁজা খাওয়া, লুকোনোর জায়গা। এখন সেটাকে বিরাট করা হয়েছে, চাঁদা তুলে। হাজিরতনে উ(স হয় না। সত্যপীরেও হয় না।

আমাদের ছোটবেলায়(মইনুদ্দিন) ছোটবেলায় বেশি জামাকাপড় পরতো না লোকে, দু-চারটে নিজেরাই তৈরি করতো। পাঞ্জাবী, শার্ট, তারও আগে ফতুয়া। গেঁজে হল, যাতে ব্যবসায়ীরা পয়সা গুঁজে রাখে। শীতকালে জুটের কাপড়ে জামা পরতো বাচ্চারা। মেয়েদের একরকম কোট হতো, খাদির কাপড়। জুট বা সুতির। ছোটবেলা থেকে লুঙ্গি পরা দেখেছি, পায়জামা চলত না। ধুতি পরতো বড়রা। হিন্দুরা, মারোয়ারিরা বরাবরই ধুতি পরতো।

মেয়েরা হাতে সূঁচ দিয়ে কাজ করতো। বেনি টানা—কুচি দিয়ে কাজ। তারপর ফ্রকে বসানো হত, দর্জিরা করত। মেয়েরা একগজ, দুগজ হিসাবে কাজ করতো। আগে মেয়েরা মেশিনে বসতো না। হুক লাগানো, বোতাম বসানোর কাজ করতো। এখন মেয়েরা মেশিনেও বসেছে। পাশের বাড়িতেই আছে। সব বাড়িতে করে না। আগে মেয়েরা কাজ করতো শখে, এখন মেয়েরা কাজ করে পেটের দায়ে।

বটতলা স্কুল বাবা-কাকা(সামসুদ্দিনের)-দের হাতে তৈরি। নু(দ্দিন মুন্সি, আমার ছোট কাকা আরো সব মিলে ৭০-এর দশকে বটতলা গার্লস স্কুল তৈরি করল। আগে ছিল ঝাউতলা স্কুল।

যখন দেশভাগ হল, হিন্দু-মুসলমান বায়ট হল, রায়ট থামাতে গান্ধীজি এসেছিল। কেশোরাম কটন মিলের ওখানে। গান্ধীর নামেই ওই ময়দানের নাম হল গান্ধীজি ময়দান। ভারত-চীন যুদ্ধের সময় এসেছিল প্রফুল্ল চন্দ্র সেন আর পদ্মাজা নাইডু। চাদর পেতে পয়সা তুলত ওই গান্ধী ময়দানে।

৬৪'র দাঙ্গা হয়েছিল আকড়া, ফতেপুর, বাটা, নুঙ্গীতে।

এখানে রবীন্দ্রনগর অঞ্চলে বরজাহান মালী। যারা শাক-সব্জি ফলায়, তাদের মালী বলে। এখানে হত ধান, আনাজ পাতি। ওখানে আলু চাষ হতো। সুপুরি, নারকেল।

ব্লাউজের কাজ বাড়িতে হত। স্থানীয়রা কেটে দিত, সেলাই করতো যারা, তারা হাওড়া জেলার বেশিরভাগ। উলুবেড়িয়া, বাগনান। ওরা নিজেরাই কাজের খোঁজে আসতো। এরা চাষের কাজও করে বাড়িতে, আবার দর্জির কাজ করে। চাষের সময় চলে যেত। ফুরনেকাজ হত। ডিজাইন দেখিয়ে দিতে হত। ৬ টা-৮ টা মেশিনে কাজও হত। উইলসন মেশিন। বড়ো সূঁচ। এক একটা মেশিনে সারা দিনে ২-৩ ডজন কাজ সেলাই হতো। সেলাইয়ের পর চুকাইয়ের কাজ। কাজঘর, যেমন হুক বসানো ইত্যাদি বাড়ির মেয়েরা করতো। আশেপাশের বাড়িতে যাদের রান্নাবান্না বাড়ির কাজ কম, তাদের দিয়ে আসা হতো। চুকাই মানে ফিনিসিং-এর কাজ। তাহলে দুটো দলে কাজ করে, ভাঁজ করে রাখা হতো, বারোটা করে, ৬ টা করে বাঁধা হতো। এছাড়া হতো

ব্লাউজের এমব্রয়ডারির কাজ। ষাট দশকের আগে পায়ে চালানো মেশিন ছিল, পরে মোটরে চলত।

এখন তো হিন্দু স্থানীয়রাও এমব্রয়ডারির কাজ করে। ওরা আগে চালাতো হাড়িমেশিন। এক সুতোর মেশিনের কাজটা বরাবরই ওরা করতো। মেটিয়াব্রুজ অঞ্চলে, ঘ্যাট-ঘ্যাট করে আওয়াজ হয়। শাড়ির কাজ, বদরতলার দিকে হয়। যখন এমব্রয়ডারির কাজটা খুব বেশি এসে গেল, আগে ফ্রকে ব্লাউজে হত। তারপর প্রত্যেক জিনিসে, শার্টে এমনকী প্যান্টেও এমব্রয়ডারি শু(হলো। এত ডিমান্ড হয়ে গেল, আমাদের কাছে লোক শিখতে আসতো। হিন্দুস্থানীয়রা দেখল এই লাইনটায় ভাল রোজগার, শিখতেও বেশি সময় লাগে না। ওরা মেশিন বিত্রি(করতো। মেশিন সারাই করতো মুসলমান বাঙালিরা।

আগে ছিল সিঙ্গার, উষা, পরে দিল্লী মোরাদাবাদের কত ব্র্যান্ড এল। আগে জার্মান মেশিন পার্ক আসতো সিঙ্গাপুর হয়ে। সিঙ্গাপুরে যারা যেত, আসবার সময় দুটো-তিনটে মেশিন নিয়ে চলে আসতো। নতুন, পুরোনো। তার আগে মাডলাস নামে ব্রিটিশ মেশিন ছিল। বাঙালিরা একটু কুঁড়ে টাইপ। হিন্দস্থানীরা পরিশ্রমী। বাঙালীরা ধরে ছেড়ে দিয়েছে। হিন্দুস্থানীরা কমপিটিশনে চলে এসেছে। তারপর কমপিউটার চলে এসেছে।

হাতের এমব্রয়ডারি একচেটিয়া প্রত্যেক বাড়িতে রয়েছে হাওড়ার পাঁচলায়। এটা হয় বেশি শাড়িতে। বম্বে রোড থেকে গেলে প্রত্যেক মুসলিম বাড়িতে দেখতে পাবেন। হিন্দুরাও করে। সালোয়ার, গারারাতেও হয়। এটা মেটিয়াব্রুজে নেই। বজবজের দিকেও হয়।

যুদ্ধের পরে সিঙ্গাপুরে বোমা-টোমা পড়েছিল। লেবার একেবারে শেষ। ব্রিটিশরা খিদিরপুর ডক থেকে জাহাজে নিয়ে যেত। ১৮৮০-৮৫ ওখানে বসতি করার জন্য প্রচুর লোক নিয়ে যায়। এখনও হয়েছে বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে খিদিরপুরে গিয়ে জাহাজে উঠে পড়েছে। দর্জির কাজ করার জন্য যেত। যারা যেত তাদের শিল্পী বলা যায়, পিছনের মল্লিকপাড়া থেকে গেছে। প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে ওখানে। এখনও প্রচুর আছে। কেউ ফিরে এসেছে, ওখানকার মেয়ে বিয়ে করে এখানে নিয়ে এসেছে। আমাদের বাড়িতেই আছে, আমার সেজো ভাইয়ের বৌয়ের মা তো এখানকার নয়, মালয়ী। ব্লাউজের লাইনটা কেউ ধরে রাখতে পারেনি। পনেরো ডজন, বিশ ডজন মাল একদিনে কাটতে হতো। ১২-২৪ পিস একসঙ্গে কাটে। 'অনাথ আশ্রম', 'দীপ জ্বেলে যাই' সিনেমা থেকে ডিজাইন কপি করা হয়েছিল, আন্দাজে। যারা করে চোখে দেখে করে দেয়। অর্ডারের কাজ যারা করতো,তারা ফিতে ফেলে মাপতো।

প্যান্ট থেকে শু(করে ইজের পর্যন্ত তখন বাড়ি গিয়ে অর্ডার নিত। একটা বাড়িতে কাজ করে একটা বড়ো ফ্যামিলিকে ম্যানেজ করে নেওয়া যেত তখন।

ফুলের কাজ হাতেও হয়, তবে অনেক সময় লাগে। নিজের আইডিয়া থেকে করে, বই দেখেও করে।

উলুবেড়িয়া, মেদিনীপুরের অনেককে দেখেছি, এখানে হয়তো প্রথমে নিজে কাজ করতো। তারপর এখন এখানেই ব্যবসা করছে। জায়গা-জমি করে নিয়েছে। দেশ থেকে ৮-১০ জন নিয়ে এসে ওস্তাগারী করছে। বহু মানুষ আছে, এখানকার লোক নয়, স্থানীয় বাসিন্দা হয়ে গেছে। কেউ হাওড়া জেলার লোক, কেউ মর্শিদাবাদের, এখন আরামসে ব্যবসা করছে।

আমরা এখানকার মেয়েদের খুব দূরে বিয়ে দিতে চাই না। ব্যবসায়িক কারণ নয়। নিজেদের দেখাশুনা, আত্মীয়তা বজায় থাকে না অনেক দূরে দিলে। বাইরে খুব কম, বড়জোর হাওড়া, ডায়মন্ডহারবার, আমতলা। ওদিকে লোকে লেবার হিসাবে কাজ করে। ব্যবসার জায়গা মেটিয়াব্রুজ। হাওড়া জেলায় কিছু আছে। ওরা হাওড়া হাটে যায়। এদিকেও আসে। হাওড়ায় বাঁকড়া, ধুলাগড়ি, মুন্সিডাঙ্গা, মুন্সীর হাট, তারপর আন্দুল। বেশি মাঝারি ওস্তাগরী, বড়ো ওস্তাগর কম। রাজগঞ্জের দিকে। কিছু লোকের গদী, দোকানপত্র ভালই আছে। মেটিয়াব্রুজের লোকের তো ব্যবসার হিসাব নেই। সেইজন্য এক পু(ষের বেশি টেকে না।

আগে দলিজ ছিল খোলামেলা। দর্জিরা সকালবেলায় এসে মেশিনপত্র নিয়ে আসতো, আবার কাজের পর রেখে আসতো বাড়ির ভিতর। বড়ো বড়ো বাঁশের কলবওয়া লাঠি ছিল, দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে মেশিন নিয়ে আসতো।

এখানে দর্জিদের মধ্যে নানারকম শব্দ আছে, যেটা এরাই বোঝে। 'দলিজ', 'ছুটলে'—ছোট ছোট ছেলে চা বয়ে দিচ্ছে, সুতো কেটে দিচ্ছে। 'ছোঁড়া'—বাচ্চা, পরিবারের ছেলেও হতে পারে। ফাইফরাসের কাজ। যে মেশিন চালায় কলওয়ালা। 'ম্যাটজি' কাম কাটে। ম্যাটও বলে। 'জী' সম্বোধন, সেলাই যারা করে তাদের থেকে কার্টারের সম্মান বেশি। মেজেতে বিছিয়ে কাটে, সেইজন্য হয়তো ম্যাট। জোগাড়ে—যারা জোগাড় দেয়। 'চুগুই'—যারা কাজটা ফিনিশ করে। মেয়েরা চুগুয়ের কাজ করে। 'কামসেলাই', 'বোতাম টাঁকা'—বিভিন্ন কাজ। এগুলো কেউ আলাদা আলাদা ভাবে করে। সকলে সেখানে কাজ দিয়ে যাচ্ছে। টাইম দিয়ে সময় মতো নিয়ে যাবে। 'গঁটরি'—বাঁধা। এখন হয়েছে প্যাকিংম্যান। সাইজ দেখে রং দেখে প্যাকিং হয়। বড়ো ওস্তাগরদের প্যাকিংম্যান। অন্যদের বাঁধাইয়ের কাজ নিজেরাও করে।

নিজেদের ঘরে আরো কিছু কথা চলে। যেমন, পানচিনি। মানে বিয়ের পাকা দেখা। পান চিনি, হয়ত কোনসময় মিষ্টিপান দিয়েছিল, সেখান থেকে এখন অন্য জায়গায় এসেছে। পানচিনি মানে এখন খাওয়াদাওয়া, হৈ-হুল্লোড়, গিফ্‌ট দেওয়া। আগে ছিল কোন একটা গয়না দিয়ে বিয়ের পাকা করতো। এখন তো ১৫০-২০০ লোকের খাওয়াদাওয়া। আর একটা আছে (ীরপিঠে।

বিয়ের আগের দিন রাত্রে হয়। শ্বশুর বাড়ি থেকে মেয়েকে যে কাপড় দিয়ে যাবে, সেটা পরে গায়ে হলুদ হয়। চালের পিঠে, ীর, তার সঙ্গে পরটাও ইত্যাদি হয়। আগে দাদী-নানীরা নানা রকম ব্যঙ্গ-গান গাইতো। নানা রকম রগড় করতো। বিয়ের অনুষ্ঠান তিনদিনের। মেয়েরা একসঙ্গে খায় 'ছেনিতে', বড়ো থালা। তখনকার চীজ আর নেই।

RECORDED INTERVIEW

সামসুন্নেহার বিবি
আকড়া রোড পাঁচপাড়ায় ৫.৮.২০০৪।

আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন গান্ধীজি। নেড়া গান্ধী, এখন টাকায় যেটা রয়েছে। ওনাকে দেখেছি, তখন উনি খদ্দরের কাপড় চোপড় পরতেন। খদ্দরের কাপড়ের সম্বন্ধেও একবার উনি একটা আন্দোলন করেছিল। ঘরেতে চরকা এনে করতে হবে, একটা আন্দোলনও করেছিল। আমার বাপের বাড়িতে, হাসেম মোল্লা, ফজলে আজিম। এম. এল. এ. ফজলে আজিম। ওটা আমার দাদা। ওই বাড়িতে আমার বাপ ছিল বিরাট একটা লোক। জুরিতে বসত, সাত গ্রামের মোল্লা ছিল উনি। জুরিতে মানে আইন-আদালত। কোনও একটা বড়ো কেস-টেস পড়লে বাবাকে ডাকত। হাসেম মোল্লা এমনি বাংলাতে, ওনাকে এম. এইচ. মোল্লা বলে সব জায়গায় জানত।

একটা কেস পড়েছিল, পাকুড়ের রাজা....বাবা ওই কেসটায় ছিল, ডাক হয়েছিল। রাজাটার দুটো পরিবারে দুই ছেলে, এক পরিবারে এক ছেলে, তার মা মারা যায়। সেই ছেলেকে মামার, খালা, তিনিরও একটা রাজত্ব ছিল। সেই ছেলে খালার কাছে চলে গিয়েছিল, মা মারা গেছে, খালার রাজত্ব পাবে। বড়ো ভাই যে, তার খুব চিন্তা। বাবার রাজত্ব পাবে, আবার খালারও পেয়ে যাবে। হিংসাতে সে কী করে, ট্রেনে উঠে, একটা ডাক্ত(ারকে সঙ্গে করে নিয়ে এয়েছে, নিয়ে ট্রেনে উঠেছে। সেই ছেলেটা সেই ট্রেনে ছিল। সে কী করেছে, একটা ইনজেক্শন, ইনজেক্শনটা দিতেই উফ্ করে উঠেছে। উফ্ করে উঠে দেখে, ডাক্ত(ারটা সরে গিয়েছে। সামনে দেখে বড়ো দাদা। দাদা আমার এখানটায় কী কামড়াল। দাদা ভাল করে ম্যাসেজ করে দিয়েছে। দিতেই ছেলেটা ঢলকে যাচ্ছে। ঢলকে যাচ্ছে, গাড়ি থামবারও টাইম হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি করে গিয়ে খালার ওখানে খবর দিয়েছে। ছেলেটা মারা গেল। এইবার খালা কেস করেছে। আমার বাবার হাতে যেন সেই কেসটা পড়ল। বাবা সেই কেসেতে থাকে। কেসেতে বিচার করে ছেলেটার ফাঁসির অর্ডার হল। সে বড়ো ভাইটার ফাঁসির অর্ডার দিল। ওখান থেকে কী করল, ট্যানেসফোর করে আবার কেটে দিল। ফাঁসি না হয়ে দিল্লীতে চলে গেল, সেখান থেকে কেসেতে যাবজ্জীবন যেন পায়। ফাঁসি হল না।

বাবা ওইসব কাজই করতেন, বিচার-আচার সমস্ত আর উনি বিরাট লোক ছিল। বাবার গাড়ি, বাড়ি অনেক কিছু ছিল।

উনি আকও করত। ওটা যেমন হঠাৎ একটা কেস পড়ল। উনি বড়ো একটা কারবারি ছিল, চাঁদনিতে দুটো দোকান ছিল। উনি ওস্তাগার ছিল। তারপর আপনার ওই বর্ষাতির কাজ, মুশারির কাজ, ওসব বড়ো বড়ো টেন্ডার এনে দোকানে কাজ-কারবার করত। অনেক কিছু আমার বাবা কাজ করেছেন। ওখান থেকে উনি আনতেন, তারা সমস্ত কাটাকুটি করে আমার বাবা পৌঁছে দিতেন। আর আমার বাবা দোকানে থাকতেন। এখানে চোদ্দখানা বাস ছিল বাবার, দুটো প্রাইভেট ছিল, ঘোড়ার গাড়ি, টমটম, চড়ার ঘোড়া, অনেক কিছু আমার বাবার ছিল। অটারপ্রফের কাজ করত। মোল্লা পাড়া। উনি বিজনেস করতেন।

মসজিদে মসজিদে, বিচার-আচার সব উনি করতেন। সাতটা গ্রাম বলতে আমার এই একটা পাড়া, ওই একটা পাড়া। ছোটো মসজিদ, তারপর পাঁচপাড়ার একটা মসজিদ আছে। এরকম বদরতলা। মানে ওনাকে অনেক অনেক জায়গা থেকে ডাক হত। উনি বড়ো বড়ো কাজ করে গিয়েছেন।

বাবারা চার ভাই ছিল। আমরা হচ্ছি, আমার দুই মা। আমার মায়ের দুই ছেলে চার মেয়ে। আর ছোটো মা'র দুই মেয়ে চার ছেলে। বাবা বারোটা ছেলে রেখে মারা গিয়েছে। এইটা বড়ো বোনের বাড়ি। আমার আকড়ায় বাড়ি। বড়ো বুনেরও আকড়ায় ছিল। উনি আকড়ায় থেকে, আকড়ায় এখনও আছে উপস্থিত, এইখানে এসে বাস করেন। আকড়ায় মাগুড়া ডাক্ত(ারপাড়া।

বাবার বাবা ছিল জইনুদ্দিন সরকার। উনি সরকারি কাজ করত। নামকরা লোক ছিল। আবার ওনার বাবা ছিল.....। বড়ো বংশ হয়ে আসছে। উনি চাকরি করতেন। তারপর জমিজমা মাপজোক করেতেন। খিদিরপুরে চাকরি করতেন। তখন তো এইসব বাস-টাস ছিল না। নৌকায় করে যাতায়াত করতেন। বিচালীঘাট থেকে উনি যেতেন। তখন তো সুবিধা, এক পয়সা করে.....।

বাবা পড়তেন, সেই সময় ওনার বাবা মারা গিয়েছেন। সংসারটা, আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। বাবার আবার চারভাই, দুই বোন ছিল সংসারে। বাবা অনেক কিছু মেহনত করে, মানে ইস্কুল-কলেজে পড়েছে। বাবা এইসব আনাজ-তরকারি এদিক-সেদিক নিয়ে বসে বিত্রি(পর্যন্ত করেছে। করে সংসারটা মেইনটেইন করেছে। তারপর বাবা এইবেলা যখন ররর হয়ে গেল, নিজের কাজ করতে শিখে গেল। বাবা তখন ওই কাজ করত। আমার বাবার যখন বিয়ে হয়...

বাবা পর্‌থম কাজ করতেন অর্ডার নিয়ে। মানে কাপড়ে মশলা দিয়ে এমন তৈরি করত, সেই কাপড়ে পানি লাগবে না। অটারপ্রুফ। ওনার পর্‌থম বিয়ে হয়েছিল সন্তোষপুরে। ওখান থেকে উনি মারা গেলেন। তারপর আমার মায়ের সঙ্গে বিয়ে হল। রাজার বাগান। রাজার বাগানে ওখানে আমার যে নানাজি ছিল, নানাজির অর্ডারের কাজ ছিল, ওই কাজ আমার নানার ছিল। নানার থেকেই যেন বাবা পেল। ওখান থেকে উনি কাজ আরম্ভ করল। তারপর আস্তে আস্তে আমার এইসব চাচাগুলো বড়ো হয়ে গেল। কাজের লায়েক হলেন। বাবা অর্ডার এনে দিতেন, আর চাচারা কাজ কেটেকুটে মানে দর্জিপত্র দিয়ে তৈরি করত।

আমাদের একটা বিরাট কারখানা আছে। এইখান থেকে একেবারে দূরে.....কারখানাটা উৎপন্নি হল আমি যেদিন জন্ম হলাম। তার আগে ছিল মাটির-টাটির। বিরাট কারখানা, দেখার মতো। এক-একটা থাম আছে, দুজন মিলে ধরতে হবে, এই আধখানা গ্রাম জুড়ে আরকি। বাড়ি পিছনে, কারখানাটা সামনে। এখন সব পির্‌থক হয়ে গেছে।

ওয়াছেন মোল্লা আমার বাপের ডান হাত বাঁ হাত বলতে হবে। হাফিজুদ্দিন মোল্লা....। ওয়াছেন মোল্লার বৌ হয়েছিল আমার ছোটো চাচার একটা ছোটো শালী ছিল.....এই সম্বন্ধে। বাবাও ওয়াছেন মোল্লার দোকানে অনেক কিছু ম্যানেজ করে দিয়েছে। ওয়াদেন মোল্লাও কিছুদিন দোকানে সব সাজগোছ করিয়ে নিল বাবাকে দিয়ে। রিয়াসুত জেহাজি ছিল ধোবাপাড়া, পানিকল....

উনি কাপড় কিনে নিতেন, সব ওযুদ ছিল, মিশিয়ে মিশিয়ে, কাপড়টা ভিজিয়ে রাখত, রেখে আবার শুকো-টুকো ওর থেকে কাপড় তৈরি হত। গায়ের জামা, মানে গায়ে দিলে পানি লাগবে না। আর বিছানায় যেটা পাতে, অয়েল ক্লথ, এটা অয়েল ক্লথের কারখানা ছিল, ওটা বাবার আন্ডারে ছিল। ওটা কোনও কাকার হাতে যায়নি।

গাড়ি বাড়ি যবে থেকে হল। এই যে সামনে বাড়ি আছে, ওখানে গাড়ির গ্যারেজ ছিল। চোদ্দটা বাস ছিল, থাকত বটতলায়। বাবার অবস্থা ফিরেছে আমার জন্মের আগে। আমি তো ছোটো, এনার (ফা(কের) দাদী তো বড়ো ছিলেন। বড়দাদা ছিল।

তখনকার বেশি। বৃটিশ আমলে, স্থানীয় লোক পরত, ইংরেজরাও পরত, লেডিজ কাপড়জামা হত। অর্ডারী জিনিস হত। বাবা করতেন, ওয়াদেন মোল্লারাও করতেন। বাড়িতে করতেন। সুবিদ মোল্লা, হাফিজুদ্দিন মোল্লা অর্ডারী কাজ করতেন। কাটিঙের কাজটা করত ম্যাট। আমার বাবার যেটা ম্যাট ছিল। ওটা আমার মামা, আমার মায়ের ফুফুতো ভাই। আমার মেজকাকা, উনিও কাটার ছিলেন। বাবা আনা-নেওয়া করতেন। তখন গওন বলে। গওনের কাজ হত। মেয়েদের জন্য। বাবা আনতেন, অন্য লোক দিয়ে তৈরি করতেন। যারা লেডিজ কাজ জানে, গওনের কাজটা আমাদের দলিজে হত না। বাবা যেন অন্যন্য লোককে দিয়ে দিতেন।

সাহেব-মেম সব আসত আমাদের বাড়িতে। বৃটিশ একজন বাড়িতে থাকত, চৌকি দেবার জন্য। সাহেব জাতীয় লোক, উনি আমাদের গার্ড দিত। বন্দুক আমার বাবারই ছিল। গার্ড দেবার জন্য আরও লোক ছিল, মুসলিম।

নেড়া গান্ধী এসে চরকার কথা বললেন। উনি এসে মিছিল বের করে সমস্ত গ্রামে ...চরকা চালাতে হবে...দেশের মেয়েরা গরিব-গুর্বো। আব্বা গান্ধীর সঙ্গে বেরিয়ে গ্রামে গ্রামে মিছিল বের করল।

গান্ধীজি তো বেশিরভাগ (আমাদের ওখানে) থাকত, কাকা-কাকা করতাম। আমার মনে হয় বড়দাদার হাতে-খড়ি হয়েছিল গান্ধীর কাছে।

একবার খেলতে গিয়েছিলাম, একসপোর্টসের প্রাইজ দেওয়া হয়েছিল। গান্ধীজি ছিলেন, বাবাও ছিলেন। আমি খেলতাম, ড্রয়িং-এর সব করতাম। ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, হাতের সেলাই, গান্ধীজি আমাকে নিজে হাতে প্রাইজ দিলেন। প্রাইজগুলো দিয়েছিল এবং আমাকে জিজ্ঞেস করল সিংহের গলাটা কে করেছে? আমি। আমার মাথায় যেন হাত রাখল। রেখে প্রাইজ দিল। বাবাকে বললো, হোসেন, এটা কি তোর মেয়ে নাকি? বলে, আচ্ছা মেয়ে তো। ড্রয়িং, সেলাই, যত যত কাজ দেখছি, ভাল কাজ। আমার মেয়ে স্কুলে ফাস্ট হয়। লাইফে কখনও সেকেন্ড হয়নি, থার্ড হয়নি। খুশি হয়ে প্রাইজ দিল, সেলাইয়ের যত ব্যবস্থা, ড্রয়িংয়ের জন্য রং-টং আর একটা রূপোর মতো, মেমের ঘরে রাখা আছে, মেডেল। দিয়ে যেন আমার মাথায় হাত রাখল। এই অনষ্ঠান হয়েছিল মেটেবু(জ হাইস্কুলে। আমি পড়তাম ঝাউতলা স্কুল বাড়িতে। প্রাইমারি, ফোর পর্যন্ত। তখন ফোর-এ পড়তাম। ওখান থেকে যখন পাশ করে বেরোলাম, তখন আমার বাবা বললো, ওকে বোর্ডিং-এ রেখে পড়ানো হবে। আমার সেজ চাচা একটু অন্যরকম ছিল, আল্লাওয়ালা ছিল, নামাজ-রোজা নিয়ে থাকত। ও বলে মেয়েছেলে বোর্ডিং-এ রাখবে। না বোর্ডিং-এ দেওয়া হবে না। এইখানেই য্যাতটা পড়ে পড়বে। ঘরে প্রাইভেট মাস্টার পড়াবে। বাবা অন্য টাইপের। উনি মেনে নিলেন। মেজ কাকা কখনও কলকাতার মুখ দেখেনি। বাবা মালপত্তর এনে দিতেন। উনি তৈরি করে দিতেন। আমি ক্লাস ফোর পাশ করায় বাড়িতে শাইউদ্দিন মাষ্টারের কাছে পড়তাম। আমার তখন বিয়ে হয়নি। আমার মেজ ভাই একটা চাকরির সন্ধান নিয়ে এল। মেজ কাকা না করে দিলেন। মেজ ভাই আমার থেকে ছোট। ও একটু দেশের কাজ-টাজ করতো। কংগ্রেস করত। একটু তোহাড় প্রকৃতির। ও একটা হিন্দু বাড়িতে ছেলেক মতো আসা যাওয়া করতো। যখন ওরা জানল যে ও আসলে মুসলিম ওরা অ্যাটাক করলো। ও দোতলা থেকে বালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কোমরে খুব আঘাত পেয়েছিল। সেই অবস্থায় বাইরে বেরিয়ে দেখল মিছিল বেরিয়েছে। একদিকে নারায়ে তকবীর অন্যদিকে বন্দেমাতরম। সেই অবস্থায় কখনও নারায়ে তকবীর আবার যখন

হিন্দুদের মুখোমুখি বন্দেমাতরম করতে করতে বিচালিঘাট আসে। ওখানে একদল আসছে বন্দেমাতরম করতে করতে। উনিও বন্দেমাতরম করতে করতে রাজাবাগানে আসল। এদিকে আমার বাবা তো মনে করছে ও তো মারাই গেছে। তিনি খেতেন না শুতেন না। সারাদিন নামাজে থাকতেন। ও যখন রাজাবাগানে পৌঁছেছে তখন অনেক রাত। ওটা হিন্দু বস্তি। তাদের সঙ্গে কোন রকমে লড়ে মেরে তছনছ করে কোনত্র(মে মুসলিম এলাকায় আসে। ওখানে এসে দেখে নারায়ে তকবীর। বাবা বললেন ঐ তো ছেলে ফিরেছে। এসেই বন্দুক চাইলো। বাবা বললো বন্দুক নিয়ে কি হবে। এই সামান্য টোটা। উনি নুরো মালির কাছে গিয়ে টোটার ব্যবস্থা করলো। তারপর ফায়ারিং শু(করে। তখন ওর ভীষণ চোট। ওটা ৫০-এর দাঙ্গায়। খুব ভালো লেকচার দিতে পারতো।

আমার বিয়ে হয় স্বাধীনতার আগে। আমার চোদ্দ বছর বয়েসে বিয়ে হয়। বিয়ের চোদ্দ বছর পরে আমার প্রথম বাচ্চা। সেই হিসাবে আমার জন্ম প্রায় ১৯২০ সালে।

লবণ আন্দোলনের সময় আমি খুব ছোট। ফুটিয়ে নুন তৈরি করা আমি দেখেছি। আমাদের বাড়িতে সম্পর্কে আমার এক বড় চাচী ছিলেন। ওনাকে ফোটাতে দেখেছি। নোনা মাটি নিয়ে ভিজিয়ে রাখত। আমার বয়স যখন তিন বছর তখন আমার বাবার দ্বিতীয় বিয়ে। আমার ভাইয়ের বয়স তখন আড়াই।

বাবা খুব ব্যয় করতেন। উনি প্রাইভেট কারে করে লালা মসজিদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তালপাতার একটা ছোট্ট স্কুলে একটা মেয়ে ডাক পড়াচ্ছিল। ওনার লেখাপড়ার প্রতি খুব আগ্রহ ছিল। শুনতে ওনার খুব ভালো লাগলো। আমার ছোট মা তখন খুব ছোট। ঘুরিয়ে কাপড় পরত। উনি পাশে বই ওনার এক সম্পর্কে পিশির(ফুপুর) কাছে নিয়ে নিতে গিয়ে দেখলেন ওটা ওনারই মেয়ে। উনি তাকে বিয়ে করে ছাড়লেন। ওযাছেল মোল্লাও দুটো বিয়ে। একটা মারা যাওয়ার পর আর একটা করেছিলেন।

তখন গ্রামের মুসলিমরাই ব্রিটিশদের গাওন বানাত। হিন্দুরা দর্জির কাজ করত না। গাওনের কাজ ওরা কোথায় শিখেছে তা ঠিক বলতো পারবো না। হিন্দুরা দর্জির কাজকে ছোট মনে করত। হিন্দুরা বেশিরভাগ চাকরি করতো। মুসলিমরা যারা যোগ্য তারাও চাকরি করতো। কিন্তু তার সঙ্গে সাইড বিজনেসও করতো। আমার বাবা দর্জির কাজ আমার নানার কাছে শিখেছে। আমার নানা(দাদু) চাকরিও করতো সঙ্গে ব্যবসাও করতো। যারা দর্জির(মেশিনে সেলাইয়ের কাজ) কাজ করতো তাদের কলওয়ালা বলা হত। যারা কাটত তাদের ম্যাট বলা হত। হাতের কাজ তখন কারাখানাতেই হত। এখনকার মতো এতো চাপ ছিলো না বলে বাড়ির মেয়েদের করার প্রয়োজন হতো না। এখন কম পড়তার জন্য বাড়িতে মেয়েদের দিয়ে করানো হয়।

গ্রামের বাড়ির লোকেরা যারা ব্যবসা করতো না তাদের অনেকেই পাঞ্জাব, সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন এসব জায়গায় যেত। আমার দাদার বাবা(ঠাকুরদার বাবা) চাষের কাজ করতেন। আকড়া ফটকের কাছে ৪ নম্বরে আমাদের জমি ছিল, ধান চাষই হতো। অনেক মাছ ধরতো। মেটিয়াব্রুজেও জেলেপাড়া আছে।

তখন বাজার বলতে ছিল বড়তলা বাজার, মেটিয়াব্রুজের বাজার। আর ছিল বড় সাহেবের হাট। হাট সপ্তাহে দুদিন হত। দৈনিক বাজার করতেন আমার মেজ কাকা। বাবা মাঝে মাঝে বাজার করতেন। আমাদের প্রায় দু-আড়াইশো লোক খেত। কাজ করতো আরো বেশি। সবাই খেত না। দর্জি,ম্যাট,মাষ্টার,মৌলানা, দারোয়ান ছিল। বিভিন্ন আশেপাশের গ্রাম থেকেই তারা আসত। যাদের বাড়ি যাবার সুবিধা ছিল না তারাই খেত। আমি ছোটবেলা থেকে দেখছি, এখনও খায়।

আমাদের দারোয়ান ছিল। তখন চোর ডাকাতের ভয় ছিল। ডাকাতরা বাইরে থেকে আসত। আমাদের ছাদের উপর ডাকাত রোখার ব্যবস্থা ছিল। দু-রকমের কুকুর ছিল।

বাবার গাড়ির বাসস্ট্যান্ড ছিল। দোতলা বাসও ছিল। বাসের নাম ছিল বিসমিল্লা, তুফান মেল ইত্যাদি। তখনকার বাসগুলো অনেক সুন্দর হত।

আমি ছোটবেলায় একবার বাড়িতে ডাকাত পড়তে দেখেছিলাম। বাবা একদিন গেছিল কোলকাতায় ঘোড়ায় করে। ওনার চড়ার ঘোড়া ছিল। টমটম ছিল। ঘোড়ার গাড়ি ছিল। একদিন অনেক টাকা আনার কথা বস্তা করে। সেদিন ডাকাত পড়েছিল। ওরা কুকুর থামাবার জন্য মাংস ফেলে যেত। তখন রাত। কারখানার সবাই চলে গেছে। দুটো বুড়ি এসছিল। তারা মাংস নিয়ে এসছিল। একজন বাড়ির ভিতর ঢুকেছে অন্যজন বাইরে ছিল। ওখানে তারা লুকিয়ে ছিল। একজন দেখে ফেলেছিল। সবাই পালাল। একজন ধরা পড়লো। ওকে থামে বেঁধে রাখল সবাই মিলে। বাবা আসল রাত্রি আটটা নাগাদ। বাবা রাত্রে কালো ঘোড়া ব্যবহার করতো। বাবা বুঝতে পেরে রাস্তা থেকে টাকা পয়সা বাড়িতে দিয়ে থানা থেকে পুলিশ নিয়ে আসল। তখন তো ফোন ছিল না।

তখন এখানকার পাকা রাস্তা ছিল না। গ্রামের কিছু মাটির বাড়িও ছিল। পাকা চাল। ইলেকট্রিকের কোন ব্যাপার ছিল না। হ্যারিকেন ছিল, গ্যাস ছিল, লাঠির গ্যাস ছিল, হ্যাচাক ছিল। রাস্তায় কাচের বাক্সে তেলের বাতি জ্বলতো। বাবা একদিন মিটিং-এ ইলেকট্রিকের মাইক আনার চেষ্টা করেছিল। শেষে পারেনি।

RECORDED INTERVIEW

সামসুন্নেহার বিবি

আকড়া মাগুরা ডাক্ত(ারপাড়ায় ৫.৩.২০০৫।

আমার নানার নাম মহরদ্দি মোল্লা। থাকতেন রাজারবাগানে পাঁচপাড়ার ভিতর। আমি ছোটোবেলা গেছি ও বাড়িতে। উনি ওস্তাগারি করতেন। নানা অ(ম হয়ে যাওয়ার পর আমার বাবা ওনার ব্যবসাটা নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে করেন। উনি কোট-প্যান্টের টেন্ডারের কাজ করতেন। কাদের টেন্ডার ছিল ঠিক জানিনা তবে বৃটিশদেরই ছিল। আমার মা ও মাসিরা বড় ছিল। মামারা সবাই ছোট ছিল। বাবা ব্যবসাটা হাতে নেওয়ার পর মামাদের কাজ-টাজ শিখিয়েছেন। ওদের চালিয়েছেন। কিন্তু মামারা তেমন কিছু করে উঠতে পারেনি।

আমার ঠাকুরদা জয়নুদ্দিন সরকার মারা যাওয়ার পর বাবা পড়াশোনাই করতেন। সরকারি কাজ করতেন বলে ওনার টাইটেল হয়েছিল সরকার। বাবা চারভাইয়ের মধ্যে বড় ছিল। পড়তে পড়তেই বাবা এদিক ওদিক করে সংসার চালিয়েছে। গাছপালা, জমিজায়গা ছিল। বাবা অনেক পরিশ্রম করে অন্যভাইদের মানুষ করেছে। পাড়ার ভিতর এমনকি উনি আমার তরি-তরকারীও বিত্রি(করেছেন। আমার বাবার এক মামা রাজারবাগান চটকলে খুব ভাল পোস্টে ছিলেন। তিনি বাবাকে অনেকভাবে সাহায্য করেছেন। পরে উনি বাবাকে চটকলে একটা ভাল পোস্টে চাকরি দিয়েছিলেন। এখানে চাকরি করাকালীন তিনি সন্তোষপুরে এক নামকরা বাড়িতে বিয়ে করেন। ওদের ওস্তাগারী ছাড়াও নানা রকমের ব্যবসা ছিল। সে স্ত্রী বেশিদিন বাঁচেননি। তিনি মারা যাওয়ার পর বাবা আমার মাকে বিয়ে করেন। মায়েরা তিন বোন, দু-ভাই ছিল।

বাবা বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের কাজ ধরেছিলেন। মেজো চাচা কেটে-কুটে মেহনত দিয়ে তৈরী করে দিতেন। সেজো চাচা ইয়াসিন এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে অল্প বয়েসে মারা যান। ছোটো চাচা আহসান মোল্লা কিছু করতেন না। আদরে মানুষ, মেজো চাচা কাসেম মোল্লা কখনও কলকাতা দেখেননি। বাবা এই কাজ করতে করতেই কলকাতায় দুটো দোকান চালাতেন। চাঁদনি চকে কাপড়ের দোকান ছিল। দোকানে আর একজন শেয়ার ছিল, হিন্দু। উনি একটু দাগাবাজি করেছিলেন। বাবা কখনও ফরিয়াদ করতেন না। উনি চুপচাপ দোকান ছেড়ে দেন। দোকান ছেড়ে দেওয়ার জন্য বাবার ব্যবসার কোন (তি হয়নি। ওনার এদিকে ব্যবসা ঠিক ছিল।

বাবা চিরকাল কংগ্রেস করতেন। উনি সাতগ্রামের মোল্লা ছিলেন। বিচার আচার করতেন। অয়েলক্লথের ব্যবসা করেছিলেন। আলমবাগানে কারখানা ছিল। অয়েলক্লথ তৈরি করে উনি দোকানে দোকানে সাপ-াই করতেন। বাবার কাজে মেয়েরা কখনও হাত লাগায়নি। পূর্ববঙ্গের অনেক বাঙালরা এই কারখানায় কাজ করত। এই কাজ করাকালীন তিনি জুরিতে ডাক পান। বাবা মারা যান স্বাধীনতার অনেক পরে।

জয়নুদ্দিন সরকার মোল্লা পাড়ার বাড়িটা জায়গা কিনে করেছিলেন। তার বাবা সেখ আহমেদ মোল্লা খালধারীরব ভিতর কোন জায়গায় ছিলেন। জয়নুদ্দিন মোল্লা সরকারি কাজ করতেন বলে সরকার টাইটেল পেয়েছিলেন।

বাবারাও চারভাই। হাসেম মোল্লা, কাসেম মোল্লা, ইয়াসিন মোল্লা ও আহসান মোল্লা। ইয়াসিন মোল্লার এক ছেলে বুবুল হক ও এক মেযে রহিমা বিবি। উনি মারা যাবার পর বাবা মেয়ের বিয়ে দেন। কাসেম মোল্লার চার মেয়ে—নাইমা, আয়েশা, সোরেরা ও হাজেরা বিবি। ইয়াসিন মোল্লা মারা যাওয়ার পর ওনার বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করেন কাসেম মোল্লা। কাসেম মোল্লার এ প(র চার ছেলে হল—ফজলে আজিম, সিরাজুলহক ও সাইফুল মোল্লা। চার পাঁচটা মেয়েও ছিল—জোহরা, সায়রা, রাবেয়া ইত্যাদি। আহসান মোল্লার দুই প(র ৬ ছেলে ৬ মেয়ে।

আমার বাবার প্রথম প(র কোন সন্তান ছিল না। উনি প্রসবকালে মারা যান। দ্বিতীয় প(২ ছেলে ৪ মেয়ে ও তৃতীয় প(র ৪ ছেলে ২ মেয়ে। বাবা মারা যাওযার পর তৃতীয় প(র বড় ও মেজো ছেলে মুজিবর রহমান ও আব্দুর রহমান বাবার ব্যবসা ধরে নিয়েছিল। একছেলে আতাউর রহমান জলে ডুবে মারা যান। অন্যজন মসিউর রহমান নিজে ব্যবসা করে আলাদা সংসার চালান। বাকিরা সব এক সংসারেই ছিল। দুই মেয়ে হল বড়বিবি ও ছোটবিবি। আমার মায়ের প(আমরা চার বোন ও দুই ভাই। আমরা চার বোন হলাম—নুরনেহার, সামসুন্নাহার, মেহে(ন্নেসা ও তওফাতুন্নেসা। দুই ভাই হাবিবুর রহমান ও সফিউর রহমান। সফিউর রহমানের দুই স্ত্রী। প্রথম প(র দুই ছেলে আকতাবুদ্দিন ও শামসুদ্দিন ও এক মেয়ে মাহতাব। দ্বিতীয় প(র প(র চার ছেলে চার মেয়ে। চার ছেলে হল—জিন্না, টনি, লালটু ও বুলেট। চার মেয়ে—সুরাইয়া, নুবাইয়া, (বাইয়া ও (কাইয়া। বাবার ব্যবসা ওখন আর কেউ ধরে রাখতে পারেনি। আফতাব এখন অন্য জায়গায় বাড়ি করেছে। সামসুদ্দিন পুরনো বাড়িতেই থাকে কিন্তু কাজ করে আফতাবের সঙ্গেই।

তখন একসঙ্গে এক কারবার ভালই ছিল। একটা উজ্জ্বলতা ছিল। বাবার ছোট ভাই আহসান মোল্লা কোন কাজ করতেন না। ওনার শখ ছিল ভাল জায়গায় বিয়ে করার। বাবা ওকে ধোবাপাড়ায় এক ভাল বাড়িতে বিয়ে দিয়েছিলেন। বাবার ১৪ খানা

বাস ছিল। বাসের কারবার ছিল ওনার। উনি ছোট চাচাকে বাসের কারবারটা দেখতে বললেন। কারবার দেখতে দেখতে উনি ওটাকে বাবাকে ফাঁকি দিয়ে আস্তে আস্তে নিজের নামে করে নিলেন। বাবা নিজের ভাইয়ের বদনামের ভয়ে কোন প্রতিবাদ করলেন না। বড়তলার জায়গাটাও উনি এইভাবে বাবার কাছ থেকে নিয়েছিলেন। ফা(করা এখন যে জায়গাটায় আছে উনি ওর দাদা (ঠাকুরদাকে) ঐ ভাবে বিত্রি(করেছিলেন। সেগুলো পরিশোধের জন্য বন্ধক দেবার নামে কয়েকটা জমি তিনি এভাবে বিত্রি(করে দিয়েছিলেন।

ডাঃ আবু মোতালেবরা চারভাই এক বোন। মোতালেব ডাক্ত(ার মেজো। উনি এখানে থাকাকালীন বড়তলার বাড়িটা করেছিলেন। ওনার সেজো ভাইয়ের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর আমার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। ওনার প্রথম প(র কোন সন্তান ছিল না।

মোতালেব ডাক্ত(ারের বাবা সিঙ্গাপুরে থাকতেন। ওখানে দর্জির ব্যবসা করতেন। উনি প্রথমে রেললাইনের ঐ পারে থাকতেন। পরে এখানে জায়গা কিনে বাড়ি করেন। চারভাইয়ের মধ্যে উনি বড় ছিলেন। জায়গাজমি বাড়ি সব ওনার পয়সাতেই করা কিন্তু উনি চারভাইয়ের নামেই করেছিলেন।

ওনার চার ছেলের মধ্যে বড়টা স্কুল মাস্টার। মেজ ডাক্ত(ার। সেজ কিছু করতনা। ভাইয়ের পয়সা বিভিন্ন ভাবে অপচয় করত। ছোটভাই চাকরিসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় বদলি হয়ে বাংলাদেশে চলে যান। শেষ জীবনে তিনি ওখানকার দৈনিক ইত্তেফাকে ভাল পোস্টে চাকরি করতেন। ওনার চার ছেলের সবাই শি(ত ও প্রতিষ্ঠিত। বড় জন অষ্ট্রেলিয়ার অ্যালবার্না ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। দ্বিতীয় জন ডাক্ত(ার। অন্য দুই জনের একজন ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যজন বাবার চাকুরিটা পেয়েছে।

RECORDED INTERVIEW

জাহাঙ্গির আহমেদ

কিলখানার কাছে ১৫.১১. ২০০৪।

শীতল সেখ থেকে শু(করে আজ পর্যন্ত আমাদের প্রায় ১৫০ বছরের পারিবারিক ইতিহাস পাওয়া যায়। আমাদের যৌথ পরিবারের ভাগ-বাঁটোয়ারা চলছে। তাই ফারায়েজ (ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী সম্পত্তির বন্টন) চলছে। তাই দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটেই আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে ১৫০ বছরের এই ছয় প্রজন্মের ইতিহাস।

আমাদের এই জায়গাকে এখন জেলেপাড়া বলা হয়। আগে বলা হত মুরগীটোলা। তারও আগে মুদিয়ালি নামটা দলিল দস্তাবেজে পাওয়া যায়। এই নামটা আমার বাবারাও ছোটবেলায় শুনেছে। আলি নামে কোন মুদী ছিল তারই নামে এরকম নাম বলে আমি শুনেছি। একই নামে আরও অমেক জায়গা অবশ্য আছে। ব্যপারটা আমি ঠিক জানিনা। পরগনা কিন্তু সবসময়ই মাগুরা।

সিক লেন ছাড়িয়ে কিছটা গেলে বাঁদিকে একটা রেললাইন পড়ে। সেই রেললাইন বরাবর গেলে একটা মসজিদ পড়ে। ওখানে একটা ঝিল আছে। আমার বাবার আগে অবসর সময়ে ওখানে মাছ ধরতে যেতেন। আরো অনেকে যেতেন। আরো অনেকে যেতেন। আমি ছোটবেলায় ঐ রেললাইন ধরে যেতাম বাবাদের খাবার পৌঁছাতে। দুপুরে গিয়ে সন্ধ্যায় সবার সঙ্গে বাড়ি ফিরতাম।

আমার মায়ের বাবারা ঐ জায়গায় থাকতেন। প্রায় ১০০ বছর আগে ওরা দুই ভাই এখানে চলে আসেন। এখানে কাঁঠালবেড়িয়ার অনেক ভিতরে এক জায়গায় অনেকটা জায়গা কেনেন। তখন ওখানে লোকজন খুব একটা ছিল না। এখন অনেক বসতি হয়ে গেছে। তখন ওখানে জমির দাম ছিল ২০ বা ২৫ টাকা কাঠা। এখন দাম প্রায় দু-লাখ।

আমার দাদুরা ঠিক কেন এসেছিলেন আমি জানিনা। বড়তলায় তখন দর্জি কাজের সামগ্রী ভাল পাওয়া যেত। এখনও খিদিরপুর, টালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ থেকে লোক সুতো টুতো এখানে কিনতে আসে। ছোটবেলায় দেখেছি বড়তলায় আমার দাদুদের মুদির দোকান ছিল। ওদের দর্জির কাজ করতে দেখিনি। ওনার ছেলেরা করেছেন।

আমার নানা (মায়ের বাবা)-র বিয়ে হয় এখানে সাতঘরায়। আমার নানী (মায়ের মা) এক বর্মির ঔরসজাত। তার মা ছিলেন বর্মি। তাই আমার মা ও মাসীর complexion খুব ফরসা। আমার নানার নাম আবু-ব(ক। নানির নাম আমি জানিনা। মাকে জিজ্ঞেস করে আপনাকে জানাব। আমার মায়ের নাম সকিনা বিবি। উনি এখানকার কালচারেই মানুষ।

আমার নানা দর্জির কাজ জানতেন। উনি বার্মায় গেছেন কাজের জন্য। মামারাও গেছেন। আমার নানা ওখান থেকে খুব দামী সেগুন কায়ের একটা তক্ত(পোষ এনেছেন জাহাজে করে। উনি লেডিস কাজ করতেন। গাওন, ম্যাকসি, স্কার্ট এসবের। ইংরেজরা রেডিমেড পরতেন না। ওরা অর্ডার দিয়েই বানাতেন। আমার মামারাও লেডিস কাজ করতেন। সে সময় কাঁঠালবেড়িয়া গার্ডেনের অনেক ভাল ভাল দর্জি ছিলেন। সেখ আবুহোর মোল্লা, সুলতান মোল্লা, জাফ(ল্লা মাস্টারের বাবা, মহম্মদ হোসেন ট্যাপা,

মোস্তাফা ট্যাঁপা, আজিম ট্যাঁপা এরা সব সে সময়কার গাওনের ভাল দর্জি ছিলেন। সবাই এখানে মারা গেছেন। আমার মামা অন্তত তিরিশ বছর বাইরে ছিলেন। মাত্র বিশ বছর আগে ওরা ফিরে এসেছে। বছরে একবার করে এসে কিছুদিন থেকে আবার চলে যেতেন। আমার দুই মামা বাইরে গেছেন। একজন সেখ মহম্মদ হোসেন অন্যজন গোলাম কিবরিয়া। ইনি এখনও বেঁচে আছেন। আপনার সঙ্গে পরে পরিচয় করে দেবো। বেশ intelectual person, অনেক history বলতে পারবেন।

মামা ওখানে কারো contact এ গেছেন কিন্তু ওখানে গিয়ে সেল্ফ সেটেলড হয়ে গেছেন। ওখানে ওদের নির্দ্দিষ্ট কলোনী বলে কিছু নেই তবে কোন আলাদা এলাকা বা বিল্ডিং আছে হয়ত। এখানকার কেউ মারা টারা গেলে ওরা সবাই ওখানে জড়ো হয়ে যেত। বছর পনেরো আগে আমার এক ভগ্নিপতির বাবা ওখানে (সিঙ্গাপুর বা রেঙ্গুন) -এ মারা যান। ওরা পেটের ধান্দায় ওখানে যেতেন জীবিকার সন্ধানে। ঝড়ু ওস্তাগার কিছুদিন আগেও ওখানে যেতেন। আমার নানার বাবা সর্ম্পকে আমার বাবা বলতে পারবে।

শীতল সেখরা কোথা থেকে এখানে এসেছে তা ঠিক বলতে পারবো না। সম্ভবত ল(ণ সেন বা বল্লাল সেনের সময় হিন্দুরা এখানে আসে। আমার কাছে একটা প্রাচীন মুদ্রা আছে। তার থেকেই আমার এরকম ধারণা। আমার কাছে অনেক প্রাচীন মুদ্রা আছে। তার মধ্যে অনেকগুলিই নকল। তবুও আমি সংগ্রহ করেছি শখে।

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য মুঘলদের ভয়ে পর্তুগীজদের দিয়ে কিছু ফোর্ট তৈরি করিয়েছিলেন। সে সময় যশোর, নদীয়া, ২৪ পরগণা সব একসঙ্গে ছিল। সম্ভবত এখানকার মাটির কেল্লাও ওদের তৈরি। এখানে অনেক খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছে কিন্তু কখনও কোন প্রত্নসামগ্রী পেতে শুনিনি। সম্ভবত এখানে জঙ্গল থাকাই এর কারণ। কিন্তু বারাইপুরে একটা কেল্লার কাছে খোঁনাখুঁড়ি করে সেখান থেকে হাতির দাঁত থেকে শু(করে পুরনো টাইলস, মুদ্রা, মূর্ত্তি, কষ্ঠিপাথর এসব পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন লোকেরা চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে। ডায়মন্ড হারবারের কাছে আমি এরকম একটা সুড়ঙ্গ দেখেছিলাম। আমরা ভয়ে বেশি কাছাকাছি যায়নি যদি ধ্বসে যায় বা কোন জন্তু জানোয়ার বেরিয়ে আসে। নজ(ল ইসলাম কাসেমীর সঙ্গে মেটিয়াব্রুজ সেবাসদনের জন্য ডাক্ত(ার খুঁজতে গিয়ে আমরা নিজের চোখে দেখেছি।

আমার বাবার জন্ম ১৯২৬ বা ২৭ হবে। ১৯৪২ এর মহাযুদ্ধে উনি এ.আর.পি তে ছিলেন। গভর্নমেন্ট সার্ভিস। উনি ছিলেন পোস্ট...। ওনার গ্রুপ ছিল। ওনার কাজ ছিল সাইরেন দিলেই বেরিয়ে পড়ার। ওনার গ্রুপে ৩০ জন ছিল। ওরা আগুন নেভানো, বোমা নিষ্ি(য় করা, ফাস্ট এড এসব করতেন। ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল ওদের। জাপানের একটি বোমা সেসময় খিদিরপুরে পড়েছিল। তার এক টুকরো আমাদের বাড়ির রোয়াকে পড়েছিল। মা ওটা প্রায় ৩০-৪০ বছর যত্ন করে রেখে দিয়েছিল। স্টিলের টুকরো। ১০-১২ কেজি ওজন হবে। এখন আর নেই। সে সময় সবাই ঘরে ঢুকে দরজা জানলা বন্ধ করে দিত। এমনকি বাতিও বন্ধ থাকতো। কেউ বাইরে বেরতা না। কেউ বেরলে জোর জবরদস্তি করে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। বাবারা সে সময়ে বাইরে বেরিয়ে রাস্তার লোকদের নিরাপদ সেলটারে পৌঁছে দিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এ. আর. পি. ভেঙে গেল। বাবা অন্য জীবিকার সন্ধানে থাকলেন। সে সময় ১৯৪৬ এ বাল্ব ফ্যাক্টরী তৈরী হয়েছে। তার আগে ওটা ফাঁকা জমি ছিল। সরকারের কাছে ভাড়া নিয়ে ইংরেজরা কারখানাটা করেছিল। বাবা ম্যাট্রিকুলেট ছিলেন। ভাল ইংরেজি জানতেন। দরখাস্ত করে চাকরিটা পেয়ে গেলেন। উনি ফোরম্যান ছিলেন। ৪৬ এর দাঙ্গার সময় উনি কারখানার গেট বন্ধ করে লোকজন নিয়ে কারখানার ভিতরেই ছিলেন। প্রোডাকশন হ্যাম্পার হতে দেননি। মিঃ ওয়ালস সাহেব দেখে খুশি হলেন। উনি বললেন আমি খুশি। তোমার কি চাই বল। উনি বললেন আমার কিছু লোককে নিতে হবে। বাবা ৭০ জনের কথা বলেছিলেন কিন্তু ৭ জনকেও জোগাড় করতে পারেননি। সবাই বলত পরের গোলামি করা যাবে না। অনেক কষ্টে যে ৪-৫ জনকে নিয়ে গিয়েছিলেন ফার্ণিশের গরমের ভয়ে তারাও পরে পালিয়ে আসে। বাবা অবশ্য এ গরমে অভ্যস্ত ছিলেন। পরে অবশ্য একটা একটা করে ৫-৬ জনকে ঢুকিয়েছিলেন কিন্তু সে ইংরেজরা চলে যাবার ১০-১৫ বছর পর।

হিন্দুদের দর্জির কাজে না যাওয়ার কারণ ধর্মীয় গোড়ামি কিনা জানিনা। মুসলিমরা অবশ্য ধর্মীয় অনুশাসন মেনে হিন্দু বা খ্রীষ্টান বাড়িতে মাংস খেত না। কারণ আল্লাহর নামে জবাই না হওয়া পশুর মাংসের ব্যাপারে ধর্মীয় নির্দেশিকা ছিল।

আমার ঠাকুরদার বাবা আই. টি. সি-র ম্যানেজারের পরিবারের কাজ করতেন। উনি গাউনের কাজ করতেন। এরকম এক দুটো পরিবার কাজ ধরা থাকলেই থখন সারা বছর চলে যেত। আমার ঠাকুরদার বাবা মোটামুটি অবস্থাপন্ন ছিলেন। না হলে এতটা জায়গাজমি নিশ্চয় করতে পারতেন না। আমার তিনতলা বাড়ির প্রথম তলা আমার ঠাকুরদার করা, দ্বিতীয় তলা আমার বাবার আর তৃতীয় তলা আমার করা। ঠাকুরদার বাবা খুব অবস্থাপন্ন ছিলেন না। কোনরকমে চার ছেলেকে চার কামরার ঘর করে দিয়েছেন। তখন হত ইঁটের গাথনি আর মাটির দেওয়াল। ইঁটভাটা তখন ছিল না। পুকুর কেটে নিজেরাই মিস্ত্রী ডেকে ইঁট তৈরি করে নিত।

আমার ঠাকুরদার বাবা জেলেও ছিলেন। দর্জি পেশার পাশাপাশি উনি মাছের ব্যবসা করতেন। পরে এটাই ওনার পেশা হয়ে যায়। উনি পুকুর লিজ নিয়ে জেলেপাড়ার জেলেদের দিয়ে মাছ ধরাতেন। জেলেপাড়ার জেলেদের সঙ্গে ওনার লেনদেন ছিল।

জেলেরা সব হিন্দু ছিল। সে সময় কোন মুসলিম জেলে ছিল না। আবার হিন্দু দর্জিও ছিল না। এখন অবশ্য হিন্দু দর্জি হয়েছে।

৪৭ এ দেশভাগের পর ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর কোর্ট, গাউনের অর্ডার কমে যায়। আমার ঠাকুরদার বাবার অন্য পেশায় চলে যাবার এটাই কারণ হতে পারে। সে সময় এখানকার হিন্দুদের সঙ্গে মুসলিমদের সম্পর্ক খুব ভাল ছিল। ওরা উৎসব পার্বণে একসঙ্গে কাটাত। একসঙ্গে তাড়ি, তাস চলত। সে সময় কোন জেলে হয়ত ঠাকুরদার বাবার কাছে মাছের ব্যবসার স্কিম দিয়েছিল। ওনার পছন্দ হয়েছে। কোন হয়ত পুকুর নিয়েছেন ইজারায় তারপর মাছ-টাছ ফেলে একটু লাভ করেছে। আমার বাবার এক জ্যাঠাইমা ছিলেন মুদিয়ালি লাইব্রেরীর কাছে। খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। আমার বাবা তো একদম জ্যাঠাইমা বলতে পাগল। জ্যাঠাইমা মারা যাবার পর ওরা সব জায়গা জমি বেচে চলে গেছেন। কোথায় গেছেন জানিনা। উনি হয়ত ৫০ টাকায় কোন পুকুর লিজ নিলেন। তারপর জেলে-টেলে সবাইকে দিয়ে হয়ত ৫০০-৭০০ টাকা থাকল। তখনকার দিনে ৫০০-৭০০ টাকা মাম বিরাট ব্যাপার। কোন কোন জেলের সঙ্গে হয়ত ৫০-৫০ শেয়ার ছিল। জেলেদের থেকে তার অবস্থা নিশ্চয় ভাল ছিল। তা নাহলে জেলেরা তো নিজেরাই লিজ নিতে পারতো। আমার বাবাও দু-চারদিন মাছের ব্যবসা করেছেন। বাদামতলা, পদিরহাটি এসব জায়গায় পুকুর লিজ নেওয়া ছিল। আমি ছোটবেলায় দেখতে যেতাম।

তখন মানুষ অল্পয় সন্তুষ্ট হত। সারাদিন চলার মতো রোজগার হলেই সন্তুষ্ট থাকত। তাই চাকরি বাকরি না করে এদিক ওদিক করেই চালিয়ে নিত। এর একটা ভাল দিকও আছে। এখন মানুষ আর তেমন নেই। আমি এক ডাক্ত(ারকে জানি যার ৩০ টা গাড়ি, সল্টলেকে দুটো বাড়ি। ৫০০ টাকা ফিস নিয়ে দিনে অন্তত ৫০ টা (গী দেখে। দৈনিক আয় প্রায় ২৫ হাজার টাকা। রাত ১০ টা অবধি সরকারি হসপিটালে বসে প্রাইভেট প্র্যাকটিস চালিয়ে যাচ্ছে। তবুও দেখলাম তাদের চাহিদার শেষ নেই। হাত পেতে বসে আছে। পারলে যেন মানুষের টাকা কেড়ে নেয়। এরা একরকমের চামার।

বাবা যখন বাল্ব কোম্পানীতে ছিলেন তখন কোম্পানীর নাম ছিল ELMI (Electrical Lamp Manufacturing India Ltd.) এখন নাম বদলে গেছে। ছোটও হয়ে গেছে। ফিলিপস কিনে নিয়েছে। তখন আসলে ই. এল . মি তে অনেক কোম্পানীর শেয়ার ছিল। Bengal, Osram, Philips সবার মাল তৈরী হত। শেয়ার অনুযায়ী তারা নিজেদের মাল তৈরি করাত। ই. এল. মি তে ঢোকার পর উনি মাছের ব্যবসা ছেড়ে দেন কিছু দিন পর। মাছে তেমন আর লাভ টাভ হত না। লোকেরা মাছ ধরে নিত। পুকুর টুকুরও কমে গেল। ভাইয়েরা আর কেউ এ কাজ করেননি।

৬৩ তে আমিও দরজির কাজ করেছি। রেডিমেড করতাম। ছোট ব্যবসা ছিল। পুঁজি বাবা দিয়েছিলেন। প্রথমে যখন ২৪ পাতের থান বিছিয়ে কাটতে গেলাম বাবা বললেন তুমি তো সর্বনাশ করে ফেলবে। ২৪ পাতের ওই থানের দাম ছিল প্রায় ৫০০০ টাকা। কাটা একটু গোলমালও হয়েছিল। কারিগররা সেলাই করতে গিয়ে একটু সমস্যায়ও পড়েছিল। পরে ঠিক হয়ে গেছিল। প্যাটার্ন বানিয়ে দিয়েছিল আমার এক মামা। পরে মামা আমাকে একটা খুব ভাল দর্জি দিয়েছিলেন। ৯টা রোজ দিতাম। সে সারাদিন বসে শুধু ডিজাইন করতো। কোনদিন একটা, কোনদিন দুটোর বেশি নয়। স্থানীয় লোক। ও স্যাম্পেল করে ৯টা সাইজ করে দিত। ১৪,১৬,১৮,২০, ২৪, ২৬,২৮আর ৩০। পরে ওগুলো বিছিয়ে কাপড় কাটা এমন কিছু কঠিন নয়। শুধু খেয়াল রাখতে হয় কাপড় নষ্ট না হয়। এখন আর ওই কাজ করতে (চি হয় না।

র মেটেরিয়াল প্রথম প্রথম আত্মীয়-স্বজনরা বড়বাজার থেকে কিনিয়ে দিতেন। কয়েকবার ক্যাশ পেমেন্ট করলে ওরা নিজেরাই ক্রে(ডিট চালু করে দিত। ওরা তো লোক চেনে। যদি বুঝতো ছেলেটা ভাল, ব্যবসা জানে, ক্রে(ডিট দিতে দ্বিধা করতো না। ব্যবসায় তো এটা চলেই। আমিও অনেককে ধার দিয়েছি। অনেকে মেরেও দিয়েছে। ব্যবসা বন্ধ হওয়ার এটাও একটা কারণ।

সুতো-টুতো লোকাল মার্কেটেই পাওয়া যেত। সবেতেই ক্রে(ডিট হয়। তবে আমি প্রথম প্রথম ক্রে(ডিট নিতাম না। ক্রে(ডিট নিলে একটা আলাদা হেডএক্ থাকে। তাগাদা করবে। হয়তো বলল আগের পয়সা না দিলে মাল দেব না। আর তখন হাতে ক্যাশ নেই। তারপর যখন কারবার একটু চালু হল তখন মাড়োয়ারিরা নিজেরাই ধার দিতে লাগল। বেশি বেশি করে কাপড় দিয়ে দিত। ওরাও তো সুযোগসন্ধানী।

রেডিমেড প্রথম দরকার আমার বুদ্ধি অনুযায়ী কয়েকজন বি(শ্বস্ত লোক। যেমন হয়ত ৫০০০ টাকার কাপড় কিনে বলল ৬০০০ টাকা বা ১০০০০ টাকার বিক্রি(করে বলল ৮০০০ টাকা। এরকম হলে চলবে না। তাই নিজেরা ভাই ভাই থেকে ব্যবসা করলে উন্নতি করা যায় সহজে। এতে যেমন বি(শ্বস্ততা থাকে, কাউকে ৫০০০ টাকা মাইনে দেওয়ারও ব্যাপার থাকে না। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হলেই গেল। কোন ভাই হয়ত ২০০০ টাকা করে সরিয়ে একটা বাইক কিনে ফেলল। সে পেল কোথায়? আমার চোখের সামনেই আমি কত কোটিপতি ওস্তাগরের ব্যবসা এভাবে ভেঙে যেতে দেখেছি। বিয়ে-থার পরেও ভাইয়ে ভাইয়ে এই বি(শ্বস্ততা থাকতে পারে। ১৯৭৪ সালে আমার ভাই সঙ্গে ছিল বটে, তবে তখন ও খুব ছোটো।

একটা হাদিস আছে হজরত মহম্মদ বলেছেন, যত (জি আছে তার ৯০ পার্সেন্ট ব্যবসায় আর ১০ পার্সেন্ট আছে চাকরিতে। সে যে ব্যবসাই হোক না কেন। মধ্যপ্রাচ্যে অনেক নবীসাহেবও কাপড়ের ব্যবসা করেছেন। তাই এই পেশাকে অনেকে ''পেশা হাবিবুল্লাহ'' বলেছেন। হাবিবুল্লাহ মানে আল্লার বন্ধু। আল্লার সঙ্গে বন্ধুত্বকারী পেশা।

এই ব্যবসার জন্য আর চাই পুঁজি। কোনও কাপড় ক্যাশে কিনলেই মিটারে অন্তত ৫০ পয়সা কম। ১০০০ মিটারে এখানে ৫০০ টাকা সেভ। আর চাই ব্যবসায়িক বুদ্ধি আর সততা। সততার এখন যথেষ্ট অভাব। অনেকে এখন মাড়োয়ারীদের পয়সা মেরে দেওয়ার ফন্দি-ফিকির ভাল জানে।

অনেক পুঁজি না লাগলেও পুঁজি লাগাতে হয়। বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে পুঁজি যোগাড় করে। অনেকে পারিবারিক সূত্রে যোগাড় করে। আমি এস.টি. আলির কথা জানি। এর বড়ো ভাই খেটে খেটে পয়সা জমিয়েছিল। তার পায়ে মেশিনের খ্যাঁটা আমাকে দেখিয়েছিল। পরে সে একটা লেস বিত্রি(করতো। বড়বাজার থেকে লেসের থান কিনে আনতো। ওগুলো ফেঁড়ে ফেঁড়ে গুটিয়ে রোল করে বিত্রি(করতো। খুব চলেছিল। সেই পয়সা জমিয়ে ব্যবসা করে। ভাই ভাই একসঙ্গে ছিল। ওরা ছয় ভাই। এখন আলাদা হয়ে গেছে।

RECORDED INTERVIEW

শেখ নুর হোসেন
নোয়াপাড়া, আকড়ায় ১৮.৩.২০০৫।

আমার নাম শেখ নুর হোসেন, বাড়ি নোয়াপাড়া। আমার বাবাও এখানে ছিলেন। ঠাকুরদা ছিলেন বাটায়। ঠাকুরদা চাকরি করতেন মেটিয়াব্রুজে, স্কুলের ধারে। সুতোকলে, বাবাও করতেন। বাবা ছোটবেলায় মারা গেছেন। তারপর ছোটোবেলায় মা.....বাটা কোম্পানি তো তুলে দিল তারপর আমরা চলে গেলাম....সিন্দীয়াপুর যেতে বল্লমপুর পড়ে না, সেখানে। বাটায় আমার বাবা কিছুদিন চাকরি.....বল্লমপুরে এক আত্মীয় ছিল সে নিয়ে এলো, আমার বাবার চাকরি করতে যেতে খুব অসুবিধা হতো। মেটিয়াব্রুজ অনেকটা। এখানে চলে এলাম। এখান থেকে বাবার চাকরিতে সুবিধা হলো। এখানে চাকরি করতে করতে ফটকের পোলেতে পড়ে গেল। রাত্রিরে ঠিক বুঝতে পারিনি, চাঁদনি রাত ছিল। পড়ে গিয়ে বোলটা হন্ধ হয়ে গেল, বোবা মতোন হয়ে গেল। তো চাকরিটা চলে গেল। তো আমার তখন বছর আষ্টেকের মতো বয়স, বাবা মারা যায়।

বাবা মারা যাওয়ার পর দর্জির কাজে বসলাম। ছোটবেলা থেকেই...লেখাপড়া আর হলো না। আমরা দুই ভাই। আমি ছোট, বড় ভাই মারা গেছেন। আমরা দুই ভাই কাজে বসে গেলাম। তখন হপ্তায় চারটাকা, পাঁচটাকা....হপ্তাভোর কাজ করে। তো আমরা কাজ শিখলাম। তারপর বছর কুড়ি পঁচিশ বছর....।

আমি এই পাড়াতেই কাজ শিখলাম। দর্জির কাজ, জামা। শার্টের কাজ করতাম। তার কাজ শিখে নিলাম পরপর। আলাদা কাজ করলাম। এখানে হাজি সাহেবের দলিজে কাজ করতাম, আমির হাজি....তখনও হজ করেননি, তারপরে হজ করেছে। আমির হাজি খাঁ। উনি হাটে বিজনেস করতেন, ল্যাথুরাম বড়বাজারে দোকান। মাড়োয়ারিদের র‍্যান্ডাম কাজ হতো। হাওড়া হাটে ন্যাশনাল সোসাইটিতেও বিজনেস ছিল।

এখন আমার ৭০/৭২ বছর বয়স। তো আমি আমির হাজির কাজ শু(করলাম। তখন দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। তারপরে হঠাৎ একদিন সব মালের দাম কমিয়ে দেয়। তখন কাজের সিস্টেম ছিল হাতওয়ালাকরন, হাতে দুজন, মেশিনে একজন। হাতে ডবল দাম, যেমন একটার দাম দেড় টাকা, আমরা পাবো ডবল ও পাবে সিঙ্গেল।

হাতে সব কাজ হবে কিভাবে। খিলে দিতে হয়। খিলে দিয়ে সব বেঁধে-বুঁধে....সেটা এখন উল্টে দিয়েছে। এখন সবই মেশিনে হয়। আগে শার্টের কাজও হাতে হতো। এখন তো সব...কুড়ি পঁচিশ বছর হবে তা উঠে গেছে। তখন হাজি সাহেব ছিলেন। তার নাম ছিল আমির আলি খাঁ।

তারপর ওখানে যখন দামটা কমিয়ে দিল তখন হাতওয়ালাদের তিন পয়সা, কলওয়ালাদের এক পয়সা। একটা কাজের দাম যদি দশ পয়সা হয়, আমরা হাতে দশ পয়সা পাই। তখন পুরনো দশ পয়সা, দশ পয়সা আর মেশিনম্যান পেত পাঁচ পয়সা। এবার মেশিনম্যানকে পাঁচ পয়সার জায়গায় চার পয়সা আর আমাদের দু আনা। এইভাবে হিসাব করে সব দর্জিদের দিত। কাউকে কিছু বলেনি, কমিয়ে দিল। কেউ কেউ হিসাব করেছে, এতো কাম করেছি, এই পয়সা কেন?। কয়েকজন গিয়ে ওস্তাগরকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে। জিজ্ঞেস করতে বলেছে সব দাম কমে গেছে, সব দুপয়সা একপয়সা করে দাম কমে গেছে। তা আমাদের জিজ্ঞাসা করলে না তুমি কমিয়ে দিলে। তা বলে, হ্যাঁ, ওরকম হবে। যার পোষাবে পোষাবে, না পোষাবে না পোষাবে। যুক্তি(টা হলো দুপয়সা একপয়সা কমলে অনেক পয়সা বাঁচবে।

করার পরে আমরা সব একতা হয়ে গেলাম। আমরা সব বল খেলার মাঠে বসে ঠিক করলাম কেউ আর কাজে যাবো না। আকড়া মাদ্রাসার মাঠে। এখানে বসে একটা মিটিং হলো। কেউ কাজ করবে না, আমাদের না শুনিয়ে কমালো কেন। এবার আমরা কি করলাম চলে গেলাম, স্ট্রাইক চলছে। গার্ডেনরীচে যারা দর্জি আছে, আমরা জয়েন্ট হয়ে গেলাম। তাদের কাছে আমরা

গেলাম মতলবটা নিতে। এসলামুদ্দিন লস্কর। এসলামুদ্দিন লস্কল থাকতেন ধোপাপাড়া, পানিরকল। উনি আগে দর্জি ছিলেন। অনেক আগে...। উনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ওনার বড় আর একটা ছিলো। উনি আনন্দবাজারে স্টেশন মাস্টার ছিলেন, মানে কাগজ চেক করলে বের হয়। উনি হাওড়ায় থাকতেন। এখানে যখন দর্জিদের নিয়ে আন্দোলন শু(হলো তখনই ওনার সঙ্গে যোগাযোগ হয়। না, এখানে কোন পার্টির ব্যাপার ছিলো না, সি. পি. এম তখন....আমরা নাম দিয়েছিলাম সাধারণতন্ত্র/দর্জিসমাজ।

ওদের যে ট্রেড ইউনিয়ন, সেটা ছিল আবুল বাশারের। ওস্তাগর-দর্জি মিলিতভাবে। এটা ছিল শুধু দর্জিদের। ওস্তাগারের বি(দ্ধে। ওদেরটা আমাগের আগে হয়েছিলো। ওদের পরে আমরা করলাম, এসেম্বলি অবধি ঘেরাও করেছি। মহেশতলা থানা, মেটিয়াব্রুজ থানা সব স্টাইক চললো। এমনকি আমরা চাঁদা তুলে যারা একেবারে গরীব, খাওয়া জুটছে না, তাদের খাইয়েছি। স্টাইক চলেছিল অনেকদিন....মাস ছয়/আটেক। এরা কাজে ডাকেনি তখন। ডেকেছে, কিন্তু তাদের ভয় দেখানো হয়েছিল। যে উঠবে তার ঠ্যাং ভেঙে দেওয়া হবে। সে একটা দিন গেছে বাপরে বাপ। কাজ পুরো বন্ধ ছিলো। বটতলা সব বন্ধ। মানে কোন কাজ হত না। ওদের ব্যবসা পুরো মার খেলো। তারপর ওরা লোক ধরলো। তিন-চার মাস পরে লোককে ধরে বিভিন্ন জায়গায় মিটিং করলো যে আমরা এই দাবিতে করেছি। পাঁচ পয়সা বাড়াতে পারি এরকম ধরনের মিটিং করলো। তো আমাদের লিডারকে বললো, না এরকম হবে না, আমাদের বোনাস সিস্টেম করতে হবে। বছরে মালের প্রতি কিছু বাড়াতে হবে। দাবি ছিলো একটা মালেতে এক টাকা। তারপর এলো আটআনা। তারপর দশ পয়সা, চার আনা এরকম করে....মীমাংসা করেছি। তারপর.....

আমরা প্রথমে চলে গেলাম কানখুলি। জানলাম স্টাইকটা কি রকম ভাবে হচ্ছে। ওরা তো আমাদের লুফে নিলো। আরো যারা কাজ করছে তাদের ডাক পড়লো। আমরা এখান থেকে চটা মোড় অবধি যত কারিগরকে তুললাম। আমাদের বোনাস দিতে হবে। সব একত হয়ে গেল। একদম বজবজ থেকে আকড়া অবধি সমস্ত জায়গায় স্ট্রাইক হয়ে গেল। হয়ে যাওয়ার পর সুশীল কুমার এলো, বড়ো বড়ো মিটিং করলো। সাহাবুদ্দিন এলো।

সুশীল মুখোপাধ্যায় দর্জিদের কিচু চেষ্টা করেছিলেন। এবার আমরা যখন স্ট্রাইকে নেমে গেলাম ওরা আমাদের সহযোগিতা করলো। মিছিল হলো, এখানে মারপিটও হয়ে গেল। ওস্তাগরদের ঘিরে ধরে মারলো। দর্জিরা মারলো। ওরা মেশিনপত্র রাস্তায় ফেলে একটা চুরির দাবি দিল। চুরি-চামারি করে ফেলে দিয়েছে। থানা থেকে পুলিস এলো। পুলিস আসার পর আমরা এসলামুদ্দিনকে খবর দিলাম। উনি বললেন মাইক খাটিয়ে মিটিং হবে। উনি মাইক নিয়ে মিটিং করার পর পুলিশ-টুলিশ সব চলে গেল। মিটিংটা হলো আমাদের এই রাস্তার উপর একটা মোড় আছে ওখানে, এখানে হয়েছে, ওখানে হয়েছে সব জায়গায়.....। সবচেয়ে জোর হয়েছিলো কানখুলিতে তারপর মিটিং-মিছিল করে বলল যে আমরা সব দল বেঁধে এসেম্বলিতে যাবো। সমস্ত দর্জিদের নিয়ে হেঁটে যাওয়া হলো, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আমাদের ঘিরে ফেললো। তারপর নেতা গেল, যে আমাদের এই দাবি। ওটা ৬০ সালে হয়েছে। ৬০ সালের আগেই। ৫৯ সালে ৬০ সালে দর্জিদের এই ইউনিয়ন হলো, একটা চাঁদা ধার্য করা হলো আর এই কার্ড হলো। সংগঠনটার নাম হলো সাধারণতন্ত্রী দর্জি সংঘ। ১৯৬০ সালে মানে কার্ড ছাপা হয়। ধর্মঘট হয়েছিলো উনষাটে। তারপর এসেম্বলি থেকে আমরা চলে এলাম। তখন বিধান রায় ছিলো কিনা আমার মনে নেই। এসেম্বলিতে যাবার পর ওস্তাগররা একটু ছটফটানি করলো। একে ওকে ধরলো। আহমেদ মুদ্দতি আমাদের এম. এল. এ. ছিলো, উনি এলেন। হোমরা-চোমরা সব এলেন। তারপর ওখানে একটা মিটিং বসলো। বসার পরে ওরা বললো, আমরা একটা সিদ্ধান্ত করে দিচ্ছি। তখন ঠিক করলো টাকায় চার আনা দেবে। মালের পিছু, আর ঈদের সময় একটা বোনাস ধার্য হলো। যে যেরকম কাজ করবে....। চার আনা মানে এক টাকা কাজ করলে চার আনা পয়সা বেশি দিতে হবে। দশ টাকা করলে দশ সিকি। একটা শার্ট যদি দুটাকা হয়, আমরা আট আনা পাবো। এটা আমাদের মজুরি। কাপড় তো ওস্তাগরের । আমাদের সেলাই দিচ্ছে দুটাকা। তার উপর টাকায় চার আনা। ৫০ টাকার কাজ করলে ৫০ সিকি দিতে হবে। ওটা অতিরিক্ত(। কিছু কিছু বোনাস পায় এখনও। কানখুলি, মেটিয়াব্রুজ....। চার আনা যে বাড়ানো হয়েছিল,পরে উঠে গেল। গদ্দারি করলো, মানে সংগঠনটা টিকলো না। আবুল বাশারের ট্রেড ইউনিয়নেরও কিছু হলো না। নেহাত পার্টির লোক। আমাদের এই টাকায় চার আনা ভাগ

দিয়েছিল বছর বারো। জিন্দা ছিল প্রায় ১৫/১৬ বছর। চাঁদা একটা ধার্য করা হয়েছিল। হপ্তায় এক টাকা করে দিতে হবে। এর অফিস ছিলো নোয়াপাড়ায়। সব জায়গায় জায়গায় অফিস ছিলো। এখানে একটা, চন্দননগরে একটা, কয়ালপাড়ায় একটা। ইসলামুদ্দিন শেষ পর্যন্ত লিডার ছিলো। তিনি মারা গেছেন মাস সাতেক আগে। ওনার ছেলে এসব কিছু করে না। তারপর ইসলামুদ্দিন সংগঠন করতে লাগলেন। ইসলামিক সংগঠন। সংগঠনটা মুসলিমদের। সহ সভাপতি ছিলেন। বক্তি(তা দিতেন ভাল। দর্জি সংগঠন হবার আগে উনি মুসলিম সংগঠনে ছিলেন। বাইরে থেকে দর্জিরা আসার পরই তো সংগঠনটা ভেঙে গেল। বাইরে থেকে দর্জি আসাটা শু(হলো ধর্মঘটের দু-এক বছর পর। ধর্মঘটের পরেই এলো এক্সপোর্ট। তার ফলেই বাইরে থেকে.....বাইরে যাবে চীন,জাপান....ব্রেসব্রীজের কাছে ছিল। ওখানে বিমল, রেমন্ড....কাজ তৈরি করে.....বাইরে যেত। তখন থেকেই বাইরে থেকে লোক আসতে শু(করলো।

এক্সপোর্টটাতে কাজের সিস্টেম আলাদা আছে। যে মনে কর বুক করবে, সে বুকই করবে। যে পকেট করবে, সে পকেটই

করবে। যে কলার করবে সে কলারই করবে। চেন সিস্টেমে কাজ শু(করলো। এবার ওদের লোকেদের কাজ করতে সুবিধা হয়ে গেল। আগে একটা শার্টের কাজ করতো তিনজন মিলে। দুটো হাতওয়ালা, একজন কলওয়ালা। কাজের ধরণটাই পাল্টে গেল। এবার মেশিনম্যান নিজেরাই ধরে ধরে কাজ করলো। হাতওয়ালা লাগতো না। পুরোই মেশিনে হতো। আলাদা আলাদা করে। হাতওয়ালা, কলওয়ালা সিস্টেমটা ৬২/৬৬ সাল নাগাদ উঠে গেল। হাতওয়ালারাই বোতাম লাগানো টাগানোর কাজ করতো। পাড়ার মেয়েরা হাতে বোতাম ঘর করতো। তখন ইন্টারলক ছিলো না। নুড়ি সেলাই হতো.....এটাকে বলে(কোন কিছু দেখিয়ে) , নুড়ি সেলাই মানে ভাঁজ করে। এটা এ করা...আপনার যেমন সেলাই রয়েছে। এটা হাতে হয়নি, মেশিনে হয়েছে, তবে ইন্টারলক নয়। দুপাশে সমান করে মেশিনম্যান টেনে দেবে, সেটাই ইন্টারলক হয়। নুড়ি সেলাইটা আগে মেশিনেই হতো। পরে এলো ইন্টারলক। আগে দুটো সেলাই হতো, নুড়ি। এখন ইন্টারলক হলো, একটা সেলাই। একটা করে সেলাই বেঁচে গেল। বাইরের দর্জিরা আসার পর এখানকার দর্জিরা পড়ে মার খাচ্ছে। ধরো আমরা পাঁচজন বসে কাজ করছি, এদের মধ্যে একজন ঢুকে গেল। তারা কাজ করলো। এবার তাদের যদি দুপয়সা কমও দেয় তারা কাজ করবে। ওরা ডিউটিটাও করছে ভাল...সকাল থেকে শু(করে খাচ্ছে-দাচ্ছে, থাকছে। ওদের এখানে কেউ নেই বলেই কম দাম দিতে পারলো। ওস্তাগাররাও তাদের ভালোবাসতে লাগলো। আমাদের কাজটাও কমে গেল। এই করে দর্জি সমাজটা একদম অধপতনে চলে গেল।

ছোট ছোট দর্জিরা ওস্তাগরে পরিণত হয়েছে। এই পরিবর্তনটা হবে না কেন? যেমন ধরো তার আগে জমানো টাকা আছে। এবার সে সব তো জানে। মাল তৈরি করলো, হাটে বিত্রি(হয়ে গেল। অল্প পুঁজিতে, এরকম টুকটাক। এই পুঁজিটা সে নিজে সংগ্রহ করেছে। কিছু ছিল। তারপর যেমন ধরো একটা গয়না ছিল বিত্রি(করলো বা বন্ধক দিল এইভাবে। জি. আই. টি. লোন নিয়ে....। দর্জিদের একটা লোন ।দিয়েছিল। নয় হাজার টাকা। আমিও নিয়েছিলাম। ১৯৬০ সালে....। প্রথমে দিলো সাড়ে তিন হাজার টাকা। প্রথমে দিল মেশিন কিনতে, টেবিল তৈরি করতে, আলমারি তৈরি করতে এইসবের জন্য। সেগুলো দেখাতে হবে, টেবিল করে, মেশিন করে দেখিয়েছিলাম....। দেখাতে ফের দিল আড়াই হাজার টাকা। এরপর দুহাজার টাকা। মানে খেপে খেপে দিচ্ছে। একেবারে দিচ্ছে না। এবারে ধারে মাল কিনলাম কিন্তু মাল চললো না, পুঁজিটা শেষ হয়ে গেল....। এই টাকাটা শোধ করতে হয়নি। কিন্তু এবার শোধ করতে হবে....মাসে মাসে ব্যাঙ্ক ডাক হয়। দর্জিরা টাকাটা শোধ করতে পারেনি, পারবেও না। এটা ব্যাঙ্ক থেকে দিয়েছিলো। সরকার অর্ডার দিয়েছিলো। শতকরা ১০ শতাংশ লোক লোনটা পেয়েছিল। একটা ইনকাম দেখাতে হবে। কি কর তোমরা। আমাদের দুটো মেশিন আর কিছু কাজ করি। কিছু টাকা পেলে একটা কারবার করতে পারি।

আমি শার্টের কাজ করলাম ছয় হাজার টাকার মতো। আমি যে কাজটা করতাম সেটা ধর্মতলায় ফুটে চলতো। তা সরকার ফুট তুলে দিল। তো মালটা আর বিত্রি(হয়নি। এবার আমাদের লস করে মালটা দিতে হলো, এবার আমাদের পুঁজি নেই। এরকম করে বহু লোকের কারবার মার খেয়ে গেছে। অল্প পয়সায় কারবার করা যাবে না।

এই নয় হাজার টাকা নিয়ে যখন ওস্তাগারি করলাম তখন পঞ্চায়েত ছিল। মিউনিসিপলটি হয়নি। এই লোন পঞ্চায়েত থেকেই দিয়েছিল। অফিস থেকে লেখালেখি হলো, ব্যাঙ্ক দিল। পৌরসভা থেকে ইনকোয়ারি হল। না, বি. ডি. ও. থেকে দেখে গেল তারপর পঞ্চায়েতে বলে দিল।

ব্যবসায় মার খেয়ে যাওয়ার পর দর্জির কাজই করছি। শার্টের কাজই করছি। এদিকে সব শার্টের কাজ। এখন ছোট করে ওস্তাগারি করলে এক লাখ টাকা দরকার। তার নিচে হবে না, একটা মাল তুলতে গেলেই আর একটা মাল জমে যাবে। ছোট ওস্তাগর আছে অনেক। একশোর মধ্যে ৮০ জন ছোট ওস্তাগার। বাকি ২০ জন বড় ওস্তাগর। অনেকে আছে, তাদের চার ছেলে কাজ করছে আবার লেবার আছে। চার ছেলের টাকা ঘরেই থাকছে। অনেকের আবার তা নয়। সবাই বাইরের। অল্প পয়সাতে হবে যদি সাইডে লোক থাকে। সংসার চালানোর মতো লোক থাকে। টাকা খেয়ে নিলে পুঁজি কমে গেল। একদম ছোট ওস্তাগর যে সে বেশিরভাগ কাজই পরিবারের লোক নিয়ে করছে। বাইরের লোক হয়তো একজন। ৪০ শতাংশ লোক বাইরের লোক না নিয়ে কাজ করে(৮০ জনের মধ্যে)। সকলকে খাটতে হয়। নিজেকে, বাড়ির মেয়েদের.....। আস্তে আস্তে কাজ করতে করতে বড় হয়ে যায়। তখন বাইরের লোক আসে। ব্যবসা বড় হয়ে গেলে মাল বেশি দিতে হচ্ছে। তখন আবার কাটিং মাস্টার রাখতে হচ্ছে। সেলাই করার জন্য, দেখাশোনা করার জন্য লোক রাখতে হচ্ছে। আস্তে আস্তে সবই বাড়ছে। আস্তে আস্তে নামও হয়ে যাচ্ছে।

এখন মেয়েরা মেশিনেও কাজ করছে। শার্টের কাজ করছে। পরিবারের মেয়েরাও মেশিনে বসে। আমার একটা মেয়ে মেশিনে বসে। ও বাড়িতে কাজ নিয়ে এসে কাজ করে। কাজ তৈরি করে দিয়ে আসে। শার্টের কাজই করে। পাঞ্জাবী, অনেকরকম কাজ। মেয়েদের আর ছেলেদের রেটের কোন তফাৎ নেই। একটা পাঞ্জাবীর রেট মেয়েরা করলে যা পাবে, ছেলেরা করলেও তা পাবে। তবে মেয়েরা সব কাজটা জানে না। তখন ছেলেরা কালারটা তুলে দিল....। আমি যে ওস্তাগরের কাজ করি বাড়িতে একসঙ্গে করি। ছেলে, মেয়ে। মেয়েকেতো শেখাতে হবে। আগে ওখানে বসে করতাম। তারপর যখন হাতওয়ালা কাজ উঠে গেল তখন কাজ নিয়ে এসে, ওস্তাগরের কাছ থেকে মেশিন নিয়ে এসে কাজ করে দিয়ে আসি। আমার কাছে ওস্তাগরের মেশিন দুটো আছে।

আমার একটা। না হলে তো কাজ হবে না। কাজ করতে হবে তো। অন্যের কাছে কাজ করলে মেশিন দেবে না। তাছাড়া অন্যের কাজ করার সময়ও হয় না। লোকাল দর্জিরা ওস্তাগারের বাড়িতে বসে কাজ করে। বাড়িতে নিয়ে এসে করে। বেশির ভাগ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কাজ করছে। এতে ওস্তাগরেরই বেশি লাভ। মাদুর লাগছে না, আলো-হাওয়া লাগছে না, কিছুই লাগছে না, তবে হওয়া উচিৎ। বাইরে থেকে লোক এসে সব গন্ডোগোল হয়ে গেছে। উস্তি থেকে, হাওড়া থেকে, মেদিনীপুর থেকে লোক আসছে। আমাদের এখানে বেশিরভাগ লোক আসে বিড়লাপুর, ডায়মন্ডহারবার এই সব দিক থেকে। গার্ডেনরীচের একচেটিয়া সব নন্দীগ্রাম এই সব দিক থেকে।

নন্দীগ্রামে অনেকে ওস্তাগরি করছে...নিজের কিছু পুঁজি করে মাল কাটছে...একটা ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে কারবার করছে।

আমি কাজ করেছি সাত-আট বছর বয়েসে, বাবা মারা যাবার আগেই কাজ শু(করেছিলাম। বাবাতো পড়ে গেলো তখন শু(করলাম।

দর্জিদের অবস্থা কোনরকমে খাচ্ছে(হাসতে হাসতে)। অবস্থার কোন হেরফের হয়নি। দর্জির কাজটাতো সব সময় হয় না। আগে একেবারেই হতো না, এখন তবু হয়। ওস্তাগরদের অবস্থা ভালো, একটা মালে ১৫ টাকা লাভ করছে। ৫০০০ পিস মাল বিত্রি(। কত লাভ! যারা কারবারটা ধরে রেখেছে তাদের ভালো হচ্ছেছে। দর্জিদের অবস্থা ভাল হয়নি। খাটনিটা বেশি হয়ে গেছে। আগে মনে কর হয়তো সন্ধ্যে অবধি কাজ করতো, এখন মনে কর দর্জিরা বাড়িতে কাজ এনে

রাতদিন কাজ করছে।

কাটিং-ফাটিং ওস্তাগররা করে দিত। তুমি শুধু কাজটা দাঁড় করিয়ে দাও। কাটিং করে দর্জিদের বসিয়ে দেবে। এর ২৫ টাকা, এর ৩০ টাকা.....। সেটা ওস্তাগরদের জায়গায় বসেই করতে হতো। হাতওয়ালা, কলওয়ালা উঠে যাবার পর যে যার বানিতেই নিয়ে যেত, সব পরিবর্তন হলো, এবার ধরো একটা বাচ্চা ছেলে তাকে ভাঁজা-ভুঁজি শেখাচ্ছে।

আমার একটা ছেলে আছে। দর্জি লাইনে বসেছে। ও আমাদের সঙ্গে কাজ করে। তিনজন করি। আটটা খানেবালা, দুটো মেয়ে, একটার বিয়ে হয়ে গেছে।

সারা বছরের মধ্যে মাঝে মাঝে কাজ কমে যায়। মাল যদি হাটে বিত্রি(না হয়....আগে মাসকে মাস কাজ থাকতো না, এখন সেগুলো পরিবর্তন হয়েছে। এখন কাজ রেগুলার হয়, মাঝে-মধ্যে কম বেশি হয়। এক সপ্তা ফাঁকাই গেল, তার পরের সপ্তা ফুল কাজ হলো। মানে হাটের বিত্রি(হিসাবে কাজ হয়। সেদিক থেকে কিছুটা রেগুলার হয়েছে। নানান রকমের কাজ উঠেছে। আগে তো এসব ছিল না।

RECORDED INTERVIEW

শওকত আলি মোল্লা
চটা,মহেশতলায় ৩১.১০.২০০৪।

আমাদের বংশবৃ(করা আছে প্রায় সাত পু(ষের। আমার পিতা পিতামহ যা করে গেছেন তা আমার চোখের সামনে। আমার অনেক কিছুই মনে আছে। সে সব শুনলে আপনার হাসি পাবে। অনেক বিরাট গল্প।

কামাগোটামা(এক জাহাজের নাম ছিল। তার স্মৃতিফলক আছে বজবজে। বৃটিশদের প্রতি পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটা বিদ্রোহ হয়েছিল এই জাহাজের ভিতর। গোলাগুলি হয়েছিল খুব। গোলাগুলি শেষ হয়ে যাবার পর এক পা চেপে অন্য পা টেনে ফাড়া হয়েছিল। সে ঘটনায় আমার ঠাকুরদা সাদের বক্স মোল্লা রাজদ্রোহী কেসে পড়ে গেছিলেন। তিনি এখানকার বাসিন্দা ছিলেন। তার বাবার নাম বেচু মোল্লা। তার বাবার নাম গোলাপ বক্স মোল্লা। এটা ১৯১৪ এর ঘটনা। এই বিদ্রোহের নাম কামাগোটামা(। নদীর ধারে তার স্মৃতিফলক রয়েছে। এই সময় একটা পাঞ্জাবীকে বাঁচাতে গিয়ে আমার ঠাকুরদা নিঃস্ব হয়ে গেছিল। ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছিল সে সময় যখন জমির বিঘা ছিল ১৮ টাকা। এসব গল্প হলেও সত্যি। কেসে ৫২ পাতার রায় বেরিয়েছিল। তার থেকেই পরিত্রাণ পেতে আমার ঠাকুরদা নিঃস্ব হয়ে গেছিলেন।

১৯১৪ এ প্রথম বি(্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ জমানা ছিল। পাঞ্জাব রেজিমেন্ট তখন অনেক শক্তি(শালি। ওদেরকে বলা হল কোলকাতা র(া করার জন্য তোমাদের কোলকাতায় যেতে হবে। এই এগ্রিমেন্ট ছিল। কিন্তু কোলকাতার খিদিরপুর ফোর্ট থেকে তাদের যখন বাইরে নিয়ে চলে যাচ্ছে তখন তারা বিদ্রোহ করল। ওরা বলল কোলকাতা র(া করার জন্য আমাদের আনা হয়েছে কিন্তু আমাদের বাইরে নিয়ে চলে যাওয়া হচ্ছে। আমাদের তো শেষ করে দেওয়া হবে। ওরা জাহাজের মধ্যেই বিদ্রোহ করল। ব্রিটিশদের মুরগীর মতো ফেড়ে ফেলল। চারিদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল। মিলিটারি এসে জড়ো হল। কেউ কেউ পালাতে পারল। যারা ধরা পড়ল তাদের শেষ করে দেওয়া হল।

আমার পিসির শ্বশুরের জায়গা ছিল চটা বাজারের ওখানে, হসপিটালের পেছনে। একদিন দেখল একটা লোক,পাঞ্জাবী, শুধু জাঙ্গীয়া পরে, খালি গা একটা উলুখেতের মধ্যে লুকিয়ে। সকালে উনি বনের মধ্যে তাকে দেখেন। জোঁকে তাকে ছেঁকে ফেলেছিল। রক্তারক্তি অবস্থা। সে পায়ে উপুড় হয়ে পড়ল। বলল আমাকে বাঁচাতে হবে। তখন চারিদিকে ঘোষণা হচ্ছে রাজদ্রোহী কেসে যারা পড়বে তাদের ছাড়া হবে না। তখন ছিল চৌকিদার, তফাদার আর লাল পাগড়ী। তিনি দেখলেন একে তো বাঁচানো মুশকিল। একে আশ্রয় দিলে আমাদেরও ধরবে। এসব আমার বাবার মুখে শোনা। আমার বাবার নাম এবাদ আলি মোল্লা। ওকে একটা ধানের গোলার মধ্যে লুকিয়ে রাখা হল। সেখানেই খাওয়া দাওয়া দেওয়া হত। তার বক্তব্য ছিল কোনরকমে তাকে হাওড়া পৌঁছে দিলে সে বাড়ি চলে যেতে পারবে। তখনকার দিনে যানবাহনের তেমন ব্যবস্থা ছিল না। গরুর গাড়ি করে যেতে হাওড়া হাটে। আমাদের ঘোড়ার গাড়িও ছিল। শুধু আমাদের নয় তখন অনেকেরই গরুর গাড়ি ছিল যারা ব্যবসা করত। ৮-১০ টা গরুর গাড়ি একসঙ্গে মাল লোড করে রাত ১০ টা নাগাদ ছড়লে পরদিন সকালে হাওড়ায় পৌঁছে যাওয়া যেত। আমার ঠাকুরদার বেয়াইমশাই এনায়েত মন্ডল বলল ঐ লোকের ব্যপারে। তিনি ঠাকুরদাকে বললেন আপনারাই পারবেন তাকে গরুর গাড়ি করে হাওড়ায় পার করে দিতে। তখন ওখানে কোটের কাজ হত। রেডিমেড, স্পোর্টিং কলার, বন্ধগলা ইত্যাদি। বিরাট বড় বড় মোট বা গাটরী হত। এক একটা মোট তিন চারজন তুলতে হত। তার মধ্যে একজন বসে থাকলেও বাইলে থেকে বোঝা যাবেনা। তাকে এখানে এনে এভাবেই একদিন মঙ্গলবার তাকে হাওড়া পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হল। এরমধ্যে ব্যপারটা জানাজানি হয়ে গেল। রাজদ্রোহীদের এভাবে পাচার করা হচ্ছে। একটা মোট হত প্রায় ৪ বাই ৪ ফুট। তার উপর ত্রিপল চাপা দেওয়া থাকলে বাইরে থেকে বোঝা যাবার কথা নয়। কিন্তু গোয়েন্দা(জানাজানি) হয়ে যাওয়ায় গাড়ি চেক হতে লাগল। জিনজিরা বাজারের কাছে আমাদের গাড়ি ধরা পড়ল। জানা গেল এটা সাদের বক্স মোল্লার গাড়ি। কেস হল—রাজদ্রোহী কেস। জায়গাজমি আমাদের অনেক ছিল। এ তল্লাটে এমনকি সুবিদ আলি মোল্লা আমার চাচা হলে কি হবে তাদেরও ওতটা ছিল না। কেসের রায় বার হল। বলা হল এরা বংশপরম্পরায় এ কাজ করে আসছে। এরা মূর্খ। যে যানবাহনে করে এরা মাল পাঠায় তা দ্রুতগামী নয়, মন্থর। রাতের অন্ধকারে কেউ ভিতরে ঢুকে থাকলে তা ওদের জানার কথা নয়। রেহাই পাওয়া গেল বটে কিন্তু অনেক টাকা খরচা হয়ে গেল। তখনকার দিনে প্রায় ৫০ হাজার টাকা। নিঃস্ব হয়ে গেলাম আমরা। আমাদের ব্যবসা চলতে লাগল বটে তবে অনেক দূর্বল হয়ে গেল।

আবহমান কাল বলতে কবে থেকে ঠিক এ ব্যবসা শুরু হয়েছিল তা বলতে পারব না। তবে আমার ঠাকুরদার সময় চৌপাট (কড়ি বা পাঁচিশে খেলার 'প্লাস' চিহ্নের মতো কাপড়ের ক্ষেত্র) তৈরি হত উইলসন মেশিনে। মেয়েরা হাতে তৈরি করত। মেশিনে ফিনিসিং হয়ে চেতলা হাটে বিক্রি হত। এ চৌপাটের পর আসল কোট। কোট থেকে পরে প্যান্ট, শার্ট ইত্যাদি। বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন জিনিস। সন্তোষপুরে হয় শার্ট। চৌপাট হত আমার বয়স হিসাবে প্রায় ১০০ বছর আগে থেকে। তখন কোটও হত কিছু কিছু। ছোট ব্যবসায়ীরা চৌপাট করত। তখন দুই বাংলা এক ছিল। এখানকার লোক বিশেষ কোট পরত না। কোট যেত কুষ্ঠিয়া, যশোর, রাজশাহী বাগের হাট এসব জায়গায়। আসামের তিনসুকিয়ায় যেত। সফিউল্লাহ, হাবিবুল্লাহ তখন ছিল নামকরা হোলসেলার। ওরা মাঝে মাঝে এসে প্রস্তুতকারকদের পুরো মাল একসঙ্গে কিনে নিত।

চাষবাস বলতে ৭৫ শতাংশ ভাগ জমিই চাষ হয়না। আগে আমাদের চাষ ছিল। এখানে চাষের জমি আমাদের সামান্য আছে কিন্তু চাষ করিনা। দশবছর আগেও আমাদের কিছু চাষবাস ছিল। আমাদের ভাগে চাষ ছিল। ফসল তুললে ওরা আমাদের খবর দিত। আমরা ঠাকুরদার সঙ্গে যেতাম। শিবহুগলী বলে মহিষগোড়ের কাছে এক জায়গায় আমাদের জমি ছিল। আমার ঠাকুরদারা নিজেরাই জানতেন না কোথায় কোথায় তাদের জমি ছিল। ভাগচাষীরা ফসল তুলে খবর দিলে আমরা যেতাম। ওরা পিঠে পুলি বানিয়ে খাইয়ে দাইয়ে বস্তাগুলো বিরাট বিরাট শালতিতে চাপিয়ে আমাদের পার করে দিত। ওগুলো আমাদের যৌথ পরিবারের ছিল। পুরো জমি চাষ হলে আমাদের বিরাট পরিবারের সারা বছর চলে যেতে পারত কিন্তু আমাদের সমস্ত জমি ভাগে দেওয়া ছিল না। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের সময় আমাদের আর জমিজমা রইল না। আমরা কমপেনসেশন পেয়ে ছিলাম।

এখান থেকে ১/৪ কিমি দূরে গেলে চাষের জমি পাওয়া যাবে বটে কিন্তু পুরো চাষী পরিবার পাওয়া যাবেনা। আগে দরজিরাই চাষ করত লোকজন দিয়ে। পুরোদস্তুর চাষী পাবেন এখান থেকে অনেক দূরে। এখানে সবাই এখন দর্জি হয়ে গেছে। চাষ করে আর পোষায় না। আগে মুগ কড়াই হত। বছরে একবারই। চাষী থেকে দর্জিদের উৎপত্তি ঠিক একথা বলা যাবেনা। দর্জিদের মধ্যেই কেউ কেউ নিজেরা বা ভাগে দিয়ে চাষ করত।

আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা প্রায় ৩০০ বছর আগেও দর্জি ছিলেন। তিনি কোট বানাতেন। শোনা যায় ওরা হিন্দু থেকেই মুসলিম হয়েছে। কিছু মতভেদ থাকলেও পাঁচমসজিদ সম্ভবত হিন্দুদের ছিল। সত্যপীরের মাজারও তাই। আমরা আসলে শুনে মুসলমান। পাঁচমসজিদে এখন নামাজ হয়না। প্রতি বৃহস্পতিবার জলপড়া টলপড়া হয়। সেবায়েত আছে তবে স্থায়ী নয়। অনেক অন্তর্কলহ আছে। হিন্দুরাও যায়া এখানে। এখান থেকে পাঁচ মিনিটের রাস্তা।

এখানকার নাম চটা কালিকাপুর কেন হল তা বলতে পারবনা। তবে আমার ঠাকুরদা সাদের বক্স মোল্লা তার নামের আগে

শ্রী ব্যবহার করতেন। যদিও এটা এখনও অনেকে লেখেন। সাদের বক্স মোল্লার ডাঙা ও ধানজমি মিলে ছিল প্রায় ২০০ বিঘা। তার আরও দুই ভাই ছিল। সুবিদ আলি মোল্লার অতটা না থাকলেও প্রায় কাছাকাছি ছিল। পরে ওগের অনেক বেড়েছে। তখন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিল খান বাহাদুর জসিমুদ্দিন। আর খান বাহাদুর সুবিদ আলি মোল্লা ছিল member of legislative council. এদের দুজনের যৌথ প্রচেষ্টায় সেসময় অনেক জনহিতকর কাজ হয়েছে। এখন যেমন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মাধ্যমে কাজ হয় তখন ওদের মাধ্যমে হত। wakf state-এর প্রায় ২৫ পাতার deed আমার কাছে আছে। তাতে প্রায় ২০০০ বিঘা জমি আছে ওদের নামে। তার সবটাই বৈধ নয়। বিভিন্নভাবে পাওয়া। মহিষগোড়, মোল্লার হাট এদের জায়গা। সুবিদ আলি স্কুলের জায়গা এদের পরে দান করেছে। এতে অবশ্য অন্য দাতাও আছে।

আমাদের বংশবৃ(র প্রায় সকলেই এখানেই আছে। মেয়েরা বিয়ের সূত্রে অন্যন্য জায়গায় গেছে। বাইরের মেয়েরাও এসেছে। মেয়ে লেনদেনের পরিবারগুলোও বিভিন্ন পেশার। মাণিকপুরের নামকরা ওস্তাগার কুদ্দুস ওস্তাগার। ঐ পরিবারে আমাদের মেয়ে গেছে। শীবপুরের জায়ালুদ্দিন ওস্তাগার নামকরা।

আমি ৪৬ এ স্কুল ছেড়ে প্রায় ১৪ বছর বয়েসেই একাজে যুক্ত(হয়ে পড়ি। আমাদের বিশেষভাবে একাজ শিখতে হয়নি। 'লন্টং বিধায় ষষ্ঠং জোড়' অর্থাৎ লেগে থাকলে পাওয়া যায়। আমরা লেগে থেকেই শিখে গেছি। প্রথমে কোটের কাজই করতাম। ৪৭ এ দেশভাগের পর দুই বাংলা আলাদা হলে কোটের কাজ কম হতে শু(করে। তারপর প্যান্টের কাজ শু(হয়। তখন সুতীর হত। টেরিকটন অনেক পরে এসেছে। জীন্স এসেছে ফিলহাল। আমরা তখন জামাইকে শান্তিপুরী চওড়া মুগোপাড় ধুতী আর উড়নি দিতাম। বড়তলায় দেওয়া হত পোচো লুঙ্গী। আমিও আগে ধুতি পরতাম বিশেষ করে বাইরে গেলে। এখন পরা হয়না। আমি বড়তলায় প্রায় ৩৫ বছর কাটিয়েছি। কিন্তু ওদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা, চালচলনে অনেক অমিল রয়েছে।

যুক্ত(ফ্রন্টের আমলে দর্জি ইউনিয়ন হলে আমি ওস্তাগার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রে(টারি ছিলাম। আমাকে সাধারণতন্ত্রী দর্জি ইউনিয়নের রেজিস্টারে সই করতে বলা হল। তাতে টাকায় চার আনা বোনাসের কথা ছিল। আমি তাদের কাছে মাথা নত না করে সপরিবারে ব্যবসা ছেড়ে ওখানে চলে গেলাম ৬৮ এ। আমার অনেক টাকার লোকসান হয়েছিল। এ বাড়িতে আমার বাবা-মা থাকতেন। ৮৭ এ বড় ছেলের বিয়ে দিই। আমি চলে যাবার পর ওস্তাগারদের ইউনিয়ন ভেঙ্গে গেল। তারা অনেকে বিভিন্ন পেশায় চলে গেল। দর্জিরা তখন সংঘবদ্ধ হয়েছিল। তারা বিভিন্নভাবে চাপ দিত। কালী ভান্ডারীর বাবা সুধীর ভান্ডারী তখন এম. এল. এ ছিল। তার পেস্তড়ে ছিল আবুল বাসার। তিনি হিন্দু না মুসলিম তা নিয়ে সংশয় ছিল। ইসলামুদ্দিন কলওয়ালা ছিল মুসলিম লীগের। বাদামতলার ইয়ার মহম্মদও ছিল দর্জি ইউনিয়নে। আমি তিনমাস যাবৎ বাদামতলার একবিচারসভায় ছিলাম। আমি তখনও অল্পবয়স ও অনেক ফিটফাট ছিলাম। ওদের সঙ্গে আমি ঠিক ম্যাচ করতাম না। আমার মতের সঙ্গে ওদের মতেরও মিল হতনা। আবার অনেক মত ওগের মতকে ভেস্তে দিত। ইয়ার মহঃ একদিন আমাকে কটা(করে প্র(করলেন, মোল্লাজী আপনার চটা থেকে এখানে আসার হেতু কি? আমি বল্লাম ভাই সেসব অনেক দুঃখের কাহিনী শুনলে আপনি দুঃখ পাবেন আমিও পাবো। বল্লাম, সাধারণতন্ত্রী দর্জি সংঘের যত শালা পান্ডা ছিল তাদের অত্যাচারই চটা থেকে বড়তলা আসার হেতু। তিনি বিচ(ণ তো বুঝলেন। ওস্তাগাররা নিজেদের পরিবারের লোকজন নিয়েই ব্যবসা চালাতে লাগল। কলকাতার সুবিদ আলি মোল্লার ফার্মের নাম ছিল 'সুবিদ আলি ব্রাদার্স'। নিউ সিনেমার কাছে ছিল সুবিদ আলি ম্যানসন। এটা ভেঙ্গে 'একিন বক্স মোল্লা এন্ড সন্স' হল। ১৮২ ধরমতলা স্ট্রিট (লেনিন সরণী) এ এল. মল্লিকের পাশে। ওটা ছোট দেকান ছিল। সুবিদ আলি মোল্লা এন্ড ব্রাদার্স এ ৭২ জন কর্মচারী ছিল। ওখান থেকে ওদের মাল ডিস্ট্রিবিউট হত। ওদের বাসে সুবিদ আলি এন্ড ব্রাদার্স লেখা ছিল। সাপ-ায়াররা বিভিন্ন জায়গায় ছিল। দর্জি সংঘের কোপ সব জায়গায় পড়েনি। কানখুলিতে কিছু হয়েছে। সফিউদ্দিন মোল্লা(হাসেম মোল্লার ছেলের) র কাছে গেছিলাম সাহায্যের আশায়। যথেষ্ট উৎপীড়ন করেছে ওরা। ৭২ এ সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় এলে আমরা কিছু স্বস্তি পেলাম। আমরাও পরে কম কিছু করিনি। ভয়ে ওরা কখন কবরে কখন গাছে লুকিয়ে থেকেছে।

৪৬-এর অনেক আগেই আগুনসে, ন্যড়াবেড়ে, খ্যাংড়াবেড়ে ইত্যাদি জায়গা থেকে কারিগররা কাজে আসত। আশুতি থেকে অনেক হিন্দু কারিগরও আসত। হিন্দু-মুসলিম কারিগর প্রায় হাফ-হাফ। পরিবারের লোকজন আনুষঙ্গিক কাজ করত। বাইরের কারিগররা কাটিং, সেলাই ইত্যাদি কাজগুলো করত। মেয়েরা তখন কোন কাজ করত না। পরে বোতামঘর, তুরপাই এসব কাজ করত। এখন মেয়েরা এসব কাজ করে ভাল টাকা পয়সাও কামিয়ে নিতে পারে। বছর পনেরো আগে থেকে এগুলো শু(হয়েছে। ফাডিং এর কাজে মেয়েরা এসেছে। ফাডিং মেশিনে হয় আবার হাতেও হয়। হাতে আট-দশ টাকা পিস। এই হিসাবে একটা মেয়ে একদিনে ৮০০ টাকারও কাজ করে নিতে পারে। সোডা, অ্যাসিডের কাজ। যথেষ্ঠ কঠিন। এরা স্থানীয় মেয়ে। পরিবারের মেয়েরা করে তবে খুব কম।

আমি পরে ইউনিয়নগুলোর আর কোন খোঁজখবর রাখিনি। তাদের দাপটও তেমন ছিলনা। পরে তারাই অনেকে ওস্তাগার হয়ে গেল। ছেলেরা সাবালক হয়ে গেল। আমি এখানে চলে এলাম। ছেলেদের ব্যবসার কাটিং, প্যাকিং এখানে হয়। সেলাই ও অন্যান্য কাজ মেটিয়াব্রুজ, সন্তোষপুর, করিমবেড়ে এসব জায়গায় হয়। আমি সায়া, ব্লাউজ এসব ছাড়া সমস্ত লেডিস আইটেমগুলো

করতাম। আমার কাজ নিউ মার্কেটে ভাল ভাল শো(মে থাকত। আমি ডাইরেক্ট করতাম না। মাড়োয়াড়ীরা করাত। তারাই ডিস্ট্রিবিউট করত। আমাদের ডাইরেক্ট করা সম্ভব হত না। তার জন্য অনেক মূলধন লাগত। আমরা রিজেন্ট, সাহা এসব কোম্পানীর কাজ করতাম। এরা কেউ বড়বাজারের, কেউ শ্যামবাজারের। কিছু বাঙালী কোম্পানীও ছিল। যাদের পুঁজি কম তারাই কোম্পানীর কাজ করত। ওরা র্ মেটারিয়াল হিসাবে শুধু কাপড়টা দিত। বড়বাজারে পাওয়া যেত কাপড়। আমরা অনেকগুলো স্যাম্পল করে দিতাম। ওরা কয়েকটা পছন্দ করে দিত। আমরা শুধু মেকিং চার্জ পেতাম। তাতে আমাদের প্রফিট কম থাকত। ৫ টাকা মজুরি পেলে কারিগরকে দিতাম ২ টাকা এরকম। ডাইরেক্ট হলে লাভ বেশি থাকত।

তখন হাট বলতে হাওড়ার মঙ্গলাহাট। এখনকার মতো এত জমজমাট ছিল না। তখন হাটের ভিতর দিয়ে বাস চলে যেত। বাংলা ভাগের পর ওপার বাংলার অনেকে এসে এ কাজে লেগে গেল। সায়া, ব্লাউজ এসব নিম্নমানের কাজই তারা করত। এখন তো মূল মঙ্গ-লাহাটেই পৌঁছানো যায়না। পুরো হাওড়া স্টেশন এখন মঙ্গলাহাট। হাওড়া ব্রীজও তখন ছিল না। বড়তলা তখন ফাঁকা ছিল। জব্বার হাট হয়েছে ৮০ এর পর। আমি যখন বড়তলায় গেলাম তখন এখানে হাফ-প্যান্ট, ফুল-প্যান্ট হত। বাংলাদেশ হয়ে স্ট্যানজিলং কাপড় আসত। সে সব কাপড় দিয়ে প্যান্ট হত(রেডিমেড পুরাতন প্যান্ট, তা কেটে বাচ্চাদের হাফ বা ফুল-প্যান্ট হত)। জীন্স আসে ৮৪ এর পর। এখন জীন্সই বেশি। আমাদের প্রোডাকশন হয় যখন যেটির চাহিদা।

ভি. আই. পি. তে আমাদের দোকান আছে। লীজে। হাওড়ায় আগে যেতাম। এখন আর যাইনা। এখান থেকে জিন্স বিভিন্ন জায়গায় যায়। শুধু এখান থেকে মহিষগোড়ের কাছে নহাজারি থেকেও মাল যায়। রবিবার, সোমবার দুদিনই ভ্যানে মাল যায়। আগে এখানে যারা কাজ করত তারা অনেকে এখন মালিক হয়ে গেছে। এখানকার অনেকে এখন তাদের কাছে কাজ করে। হাওড়া হাটে মাল যায়, হরিষা হাটেও যায়। আগে হাট শুধু মঙ্গলবারে হত। এখন সোমবারেও হয়। মাল যায় কেরালা, চেন্নাই এসব জায়গায়। খদ্দেররা নিজেরা এসে ট্রান্সপোর্টে মাল নিয়ে যায়। অনেক সময় ওস্তাগররা নিজেরাই পাঠিয়ে দেয়। কেনবেচা খদ্দেরদের সঙ্গে ডাইরেক্ট হয় কোন মিডলম্যান নেই। মহেশতলার খদ্দেরও ওস্তাগরের কোন কন্টাক পয়েন্ট নেই। সবকিছুই বড়তলায়। অনেক সময় খদ্দেররা ডাইরেক্ট ওস্তাগরের বাড়ি চলে আসে।

ওয়াজেদ আলি শাহ আসার পর মেটিয়াব্রুজ নামকরণ হয়। এই জায়গার নাম মহেশতলা আগে থেকেই ছিল। এটা মাগুরা পরগণা ছিল। ২৪ পরগণা উত্তর ও দ(ি ণ পরে ভাগ হয়।

খান বাহাদুর জসীমুদ্দিন ও খান বাহাদুর সুবিদ আল (মতায় থাকাকালীন ২৪ পরগণা অবিভক্ত(ছিল। সুদূর নামখানা, গঙ্গ াসাগর থেকে বারাসাত, বসিরহাট পর্যন্ত তাদের (মতা ছিল। তাদের সমবেত প্রচেষ্টায় অনেক কাজও হয়েছে। ১০ আনায় ৬ আনা কাজ হযেছে ৪ আনা নিজের কাজ করেছে।

ওয়াজেদ মোল্লার বিল্ডিং ছিল মোতি ঝিল স্ট্রীট এ। একটা বিল্ডিংই সুবিদ আলি মোল্লার তিনটি বিল্ডিং এর সমান। সুবিদ আলি ইনস্টিটিউট ১৯৪২ এ তৈরি। এ. কে. ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দিন, হাসান শাহ শারওয়ার্দিরা আসতেন স্কুলে প্রতিবছর খুব রাজকীয়ভাবে।

এখানে মূলতঃ জিন্সই হয়। অন্য জিনিসও হয় তবে খুব কম। আমার ছেলেরা এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত। ভবিষ্যত প্রজন্ম হয়ত এই শিল্পের সঙ্গে থাকবে। আমার ছোট চাচা আবদুল ওয়াহিদ মোল্লা তখনকার সময়ে এ এলাকার সবথেকে শি(ি ত ব্যক্তি(ছিলেনে। ম্যাট্রিক পাশ। শি(ক ছিলেন। ২০ টাকা মাইনে। পরে মিলিটারিতে নাম লেখান। দেশভাগের পর টাউন হলে চাকরি নিলেন। ওনার এক ছেলে এখান থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বাংলাদেশে চাকরি করে। অন্যান্য আত্মীয় স্বজনরা সবাই দর্জি পেশাতেই আছে। জামাইদের কয়েকজন চাকরি বাকরি করে তবে বেশিরভাগই দর্জি ওস্তাগর।

এখানকার কারিগররা কেউ নোদাখালি থেকে কেউ বিড়লাপুর থেকে আসে। মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদের কারিগর এদিকে তেমন নেই। কেউ হয়ত আছে ঘর-টর ভাড়া নিয়ে। নিজেরাই ব্যবসা করে। বন্ধ জুটমিলের শ্রমিকরা যাদের আমরা 'কোলো' বলতাম, তারা দর্জি পেশায় আসছে। তারা সবাই বাঙালি। উর্দূভাষী নেই। বিহারী কিছু আছে তারা কেউ ইস্ত্রী করে, কেউ কাটিং করে। কেউ কেউ এখানকার বাসিন্দা হয়ে গেছে। তবে তারা খুবই কম। সেলাইয়ের কাজে উর্দূভাষীরা এখনও তেমন নেই। বিয়ে টিয়েও বাঙলাভাষীদের সঙ্গেই হয়। কিছু ব্যতিত্র(ম আছে হয়ত।

RECORDED INTERVIEW

শওকত আলি মোল্লা

চটা, মহেশতলায় ২৬.১২.২০০৪।

চটা সুবিদ আলি স্কুলের শি(ক মওলানা আরশাদ আলি সাহেব সুবিদ আলি সম্পর্কে একটা পত্রিকায় চার পাঁচ ইংরাজিতে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। তবে তার সব তথ্য সঠিক নয়।

সুবিদ আলি সাহেব প্রথম জীবনে অবস্থাপন্ন ছিলেন না। তার (শ্বশুর বাড়ি ছিল চালকি পাড়ায়। (শ্বশুরের নাম রহমান মন্ডল। ওখানে তিনি মেশিনে সেলাইয়ের কাজ করতেন। ওর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে রহমান সাহেব তার মেয়ে আসিয়ার সঙ্গে ওনার বিয়ে দেন। বিয়ের পর থেকেই তার ভাগ্য ফেরে ও উন্নতি শু(হয়। কলকাতার দোকান ও বাড়ি হয় বিয়ের পরেই।

মোহিত মোল্লা প্রথম জীবনে প্রাইমারী স্কুলের টিচার ছিলেন। চটা সুবিদ আলি স্কুল তখন হয়নি। মাইনে ছিল ২০ টাকা মাত্র। চলত না। তাই মিলিটারিতে যোগ দেন। পরে মিলিটারি ভেঙ্গে যাওয়ার পর ইনকাম ট্যাক্স অফিসার হয়ে যান।

সুবিদ আলির বাবা চৌপাট ও কোট বানাত। তার বাবা হৈদর মোল্লা চাষ আবাদই করতেন। দর্জির কাজও করতেন অল্প স্বল্প। তখন দর্জির কাজ এত ব্যাপক ভাবে ছিল না। পূজো-পার্বণেই একটু কাজ হত। ১৯১৪ এর আগেও ব্যবসা এত ব্যাপক ছিল না। বাকি লোকজন চাষ-আবাদই করত। মুটে মজুরি করে খেত। তখন লোকজনও এত ছিল না।

দুই বাংলা তখন এক ছিল। মাল বগুড়া, রাজশাহী, তিন সুকিয়া এসব জায়গায় যেত। হবিবুল্লাহ, সফিউল্লাহ ছিল তখনকার বড় ব্যবসায়ী। আসামের তিন সুকিয়ায় ওদের ব্যবসা ছিল। ঝাঁটার কাঠি থেকে চামড়া অবধি বিভিন্ন জিনিসের ব্যবসা ছিল ওদের। ওদের পারচেস ম্যানেজার ছিল ওদের ভগ্নিপতি মোঃ হোসেন। উনি কলকাতায় আসলে সুবিদ আলি মোল্লার সব গোডাউন খালি হয়ে যেত। সুবিদ আলি ম্যানসনের নীচে ছিল সুবিদ আলি এন্ড ব্রাদার্স। পাশেই ছিল আবদুল গনি, জয়নাল অবেদিন। মোঃ হোসেন কলকাতায় একটা চার পাঁচ তলা বাড়ি করেন হাবিবুল্লাদের না জানিয়েই। এতে ওরা খুব আহত হন। পরে উনি আত্মহত্যা করেন।

বোলপুরের জসিমুদ্দিন সাহেব ছিলেন তখন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডর চেয়ারম্যান। সুবিদ আলি মোল্লার ধরম ভাই হিসাবে তিনি এদের সঙ্গে যুক্ত(হন। তখন অবিভক্ত(২৪ পরগণা ছিল নামখান-কাকদ্বীপ থেকে নিয়ে বসিরহাট-হাসনাবাদ অবধি। জসিমুদ্দিন সাহেব সুবিদ আলির ভাই হিসাবে কলকাতায় আসা যাওয়া করতেন। থাকতেনও। ওনার পরামর্শেই আলিগড় বি(বিদ্যালয়ের অনুকরণে সুবিদ আলি ইনস্টিটিউট হয়। ওনাকে আমরা কংগ্রেসী হিসাবেই জানতাম। বসিরহাট, বারাসাত থেকে ছেলেরা এসে এখানে পড়াশোনা করত। এখানকার ছেলে তেমন পাওয়া যেত না। এখন তো ঠাঁই দেওয়া যায় না।

আমার পিসির (শ্বশুর চাষ আবাদই করতেন। জমি নিজের ছিল। লোকজন দিয়ে চাষ আবাদ করাতেন। গোলাপ বক্স মোল্লার আমলে জমির মালিকানা ছিল জমিদারের। রাণী হর্ষমুখী, আনন্দবালা দাসী, মহাদেব চন্দ্র রায় তখন ছিল এখানকার জমিদার। ফাইনাল পর্চায় তাদের নাম ছিল। গোলপ বক্স মোল্লা প্রজা হিসাবে চাষ করতেন।

সুবিদ আলি ইনস্টিটিউট-এর জায়গা খালি জমি ছিল না। জলা জমি ছিল। ঝিল কেটে মাটি উঁচু করা হয়েছিল। এতে পাশের মল্লিক পাড়ার হলব্বি মল্লিক, এলাহি বক্স মল্লিক প্রমুখদের দান করা জমিও আছে। জমিদাতা হিসাবে স্মৃতিফলকে তাদের নামও আছে। হিন্দু জমিদারদের থেকে মুসলমানদের হাতে জমি হস্তান্তরের কারণ আমার জানা নেই।

পিসেমশাই অষ্ট্রেলিয়ায় কাজ করতেন। ব্রিটিশ পিরিওড অষ্ট্রেলিয়া থেকে তখন কোট ও প্যান্ট কাটিং হয়ে আসত। বড় বাজারের আর. কে. দত্ত, বিজয়কুমার এরা ছিল মিডিয়াম। এখানকার দর্জিরা তা সেলাই করে পারিশ্রমিক পেত। তখন হিন্দু কারিগর ছিল মুষ্টিমেয়। তারা সাধারণতঃ চাষ আবাদ, মাছধরা এসব করত।

সে সময় সিঙ্গার এর মতো ডি-১২ ও উইলসন মেশিন চলত। ওগুলো ছিল আমেরিকান। ওর কভারে 'ওয়েলার এন্ড উইলসন, আমেরিকা' লেখা থাকত।

কামাগোতামা(বিদ্রোহের সময় ১৯১৪ নাগাদ গ(র গাড়িতে মাল যেত হাওড়া হাটে। তখন বাস ছিল ২৪ সীটের ছোট ছোট বাস। ট্রেনও চালু ছিল। অনেকে এখান থেকে কাঁধে মাল নিয়ে আকড়া যেত। ওখান থেকে ট্রেনে হাওড়া বা চেতলা হাটে যেত। পিচের রাস্তা হয়েছে আমাদের সামনে দ্বিতীয় বি(যুদ্ধের আগে। বাস চালু হওয়ার পরও সবাই আকড়া হয়ে ট্রেনেই হাটে যেত। বাসে বিশেষ যেত না।

৭৭-এ যেটা সোজা ব্রেস ব্রীজ হয়ে যেত ব্রিটিশ পিরিওডে। তার (ট ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওটা তখন বেহালা হয়ে যেত। ঐ সময় ব্রেস ব্রীজের কাছে পেয়ারাতলায় হেলিপ্যাড তৈরি ওখানে হেলিকপ্টার ওঠানামা করতে দেখেছি।

কাস্টমাররা মূলত আসত বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, আসামের তিনসুকিয়া, কাছড়ি, শিলচর এসব জায়গা থেকে। স্টিমার, ট্রেনে করে তারা আসত। এখানে এসে তারা থাকত। সুবিদ আলি ও অন্যান্য বড় ওস্তাগারদের কাছ থেকে তারা কেনা কাটা

সারত। হাওড়া হাটে একটা চালা আছে যার নাম আসাম চালা। আসামের কাস্টমাররা সাধারণত এখানে তাদের কেনাকাটা করত। এখানে তাদের দরকার অনুযায়ী মাল তৈরি হত। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, কানপুর, নাগপুর, জৈনপুর, দিল্লি, বোম্বে, মাদ্রাজ— ভারতবর্ষের সব প্রান্ত থেকেই এখানে কাস্টমার আসে। প্রথম থেকেই হাওড়া হাট অল ইন্ডিয়া মার্কেট।

জলপথে কাপড়ের ব্যবসা কিছু হত। আগে মানিকতলা খাল বহুদূর পর্যন্ত ছিল। বড় সাহেবের হাট কাপড়ের হাট নয় ওটা সাধারণ হাট। ওটা কাপড়ের হাট বানানোর অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিন্তু সফল হয়নি। কারণ ওটা একমুখো রাস্তা ছিল। যাতায়াতের তেমন সুবিধা নেই। এখন ট্রাক বা ট্রেনে মাল যায়।

হাওড়া হাট ছাড়াও রয়েছে চেতলা হাট, হরিশাহার হাট। হরিশাহার হাট চালু ৫৭-৫৮ নাগাদ। প্রথমে ওটা বাউন্ডারি দেওয়া কোয়ার্টার ছিল। ওটা চালু হওয়ার সময় লোক টানার জন্য ওস্তাগরদের চা-বিস্কুট খাওয়ানো হত। এখন সেসব আর নেই। ওটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গেছে। জব্বারেও কিছুদিন এভাবে প্রচার করা হয়েছিল। রিক্সাওয়ালা কোন কাস্টমার নিয়ে গেলে পেত পাঁচ টাকা। ওস্তাগরদের থামস্ আপ দেওয়া হত। ২৫-৩০ বছর আগে কারবালা হাটে যাওয়ার কথা বললে লোকে বলত জ্যান্ত মানুষ কারবালা কেন যাবেন? ওখানে তো মরা মানুষ যায়। ওখানে দুটো বড় কবরস্থান আছে। পরে কারবালা এত উন্নত হয়ে গেল যে এক টাকার জমি এক-দেড় লাখেও পাওয়া যায় না। ওখানে যারা গরীব খেটে খাওয়া মানুষ ছিল তারা পড়ে থাকা জমি বিক্রি(বা মার্কেট করে পয়সাওয়ালা হয়ে গেছে। প্রথমদিকে ওখানে চিন্দির কাপড় বিক্রি(হত। ছোট ছোট ফালি কাপড়কে চিন্দি বলে। ওগুলো টাঙিয়ে রেখে বিক্রি(হত। ওর থেকে বাচ্চাদের ছোট ছোট জামা বা পেনি তৈরি হত। ১০-১২ বছরের মেয়েদের জামাকে বলে ফ্রক আর তার থেকে ছোট বাচ্চাদের জামাকে বলে পেনি। ৭৪-৭৫ সাল নাগাদ কারবালা চালু হতে থাকে। পরে ব্যাপক প্রচার পেয়ে গেল। বাইরে বাইরে থেকে কাস্টমার আসতে লাগল। জব্বার তখনও চালু হয়নি। পরে জব্বার ও সামনের হাটগুলো চালু হলে কারবালা কানা হয়ে গেল। কাস্টমার কম আসতে লাগল।

তখন মাল তৈরির জন্য কাপড়, সুতো এসব কাঁচামাল লোকাল মার্কেটেই পাওয়া যেত। মানুষ চাষবাসের উদ্বৃত্ত পয়সা দিয়েই ব্যবসা করত। দাদন বা ধার এসব ছিল না। তখন কাপড়ের দামও সস্তা ছিল। এখন যেমন ৫০/৬০ টাকা কাপড়ের মিটার তখন ৫০/৬০ টাকায় একটা থান হয়ে যেত। এক টাকা পাঁচ শিকে কাপড়ের মিটার ছিল। সব দেশী কাপড়। কাপড়ের তখনও মাড়োয়ারিদের হতে ছিল। কাপড়ের লোকাল দোকান কম ছিল। বড় বাজারের মনোহর দাস কাটরা, পাঞ্জাবী কাটরা থেকে লোকে কাপড় আনত। সুতো-টুতো কাপড়ের রঙ অনুযায়ী এখানেই পাওয়া যেত। যে কোন সাধারণ মানুষ সুতোর ব্যবসা করতে পারত। এর জন্য এমন কিছু পুঁজির দরকার হয়না। স্টলে বসার জন্যও খুব বেশি টাকা লাগত না। এক-দেড়শো টাকায় হাওড়া হাটে স্টল পাওয়া যেত। বছরে সালামী হিসাবে দিতে হত ১৬ টাকা। এটা হাট মালিককে দিতে হত। তখন স্টলের এত চাহিদা ছিল না। জায়গা ফাঁকা পড়ে থাকত। আমার জ্যাঠামশাইয়ের হাটে যাওয়ার জন্য বাস ছিল। বাস হাটের মধ্যে চলে যেত।

হাওড়া ছিল সব জায়গার সেন্টার। এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক আসত। হাওড়া থেকে আসত জামালুদ্দিন ওস্তাগার, কানখুলি থেকে হাফিজুদ্দিন ওস্তাগার এসব। তখন এক একটা রো এক একটা ওস্তাগারদের নামে হয়ে যেত। যেমন সুবিদ আলি লাইন, হাফিজুদ্দিন লাইন এরকম। এক এক রোতে তাদরে চার-পাঁচটা করে দোকান থাকত। তারপর দুই বাংলা ভাগ হয়ে যাওয়ার পর ওপার বাংলার অনেকে এখানে থেকে গেল। তারা এই ব্যবসায় লিপ্ত হয়ে পড়ল। স্টলের চাহিদা বেড়ে গেল। এখন তো লাখ টাকাতেও স্টল পাওয়া যায় না।

তখন গামছা আসত বসিরহাট থেকে। চটা থেকে আসত প্যান্ট, সন্তোষপুর থেকে শার্ট, মেটিয়াব্রুজ থেকে ফ্রক, মেয়েদের জামা ইত্যাদি। বাঁকড়া, ডোমজুড়, শিবপুর, হুগলী থেকেও অনেকে আসত। উত্তর কলকাতায় এখন যেমন গেঞ্জি, সায়া, ব্লাউজ এসব ব্যাপকভাবে হয় তখন এরকম ছিল না। বাংলা ভাগের পর থেকে পূর্ববঙ্গের যারা এখানে থেকে গেল তারা সায়া, ব্লাউজ, ইজের প্যান্ট বেশি তৈরি করতে লাগল। এদেশীয় স্থানীয়রা সায়া, ব্লাউজে তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না। তারা খুব কম মজুরিতে এসব বানাত। পাইকপাড়া, শ্যামবাজার এসব জায়গায় এগুলো বেশি তৈরি হয়।

হরিশাহার হাটে এখানকার ওস্তাগররা এখন যায়। ওখানে একটু দামি মাল পাওয়া যায়। শ্যামবাজার, হাতিবাগান, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের শহুরে লোকাল কাস্টমাররা এখানে বেশি আসে। গ্রামের কাস্টমাররা কম আসে। লোকাল ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য ও হাটটা ভাল। ওখানকার মালগুলো শহর এলাকায় উপযোগী। মেটিয়াব্রুজ-মহেশতলার ওস্তাগররা বেশি যায় হাওড়া হাটে। এখন বেশি যায় লোকাল হাটে।

চাষী ও দর্জি দুটো আলাদা সম্প্রদায় নয়। দর্জিরা সবাই একসময় চাষের উপর নির্ভর করত। চাষ বাসের মধ্যেই কেউ কেউ দর্জির কাজ করত।

এই ব্যবসায় যারা উন্নতি করেছে তারা যৌথ পরিবারের মধ্যে থেকেই উন্নতি করেছে। একা একা সেভাবে সম্ভব নয়। সুবিদ আলি, ওয়াজেদ মোল্লা সবাই যৌথ পরিবারকে কাজে লাগিয়ে উন্নতি করেছে। ব্যবসায় মেয়েরা সেভাবে হাত লাগত না। ৬৪-৬৫ এর পর থেকে দেখছি মেয়েরাও কাজঘর, বোতাম টাকা এসব চুকুইয়ের কাজ করেছে। তবে মেটিয়াব্রুজের দিকে হেলি,

স্মোকিং, ফোক্সা এসব কাজ মেয়েরা করত। এগুলো বাড়ির মেয়েরাই করত। বাইরের মেয়েরা নয়। কারিগরদের রান্নাবান্নার কাজ মেয়েরা করত। তবে সেসময় সব কারিগর ওস্তাগরদের বাড়িতে খেত না। বেশিরভাগ নিজের বাড়িতে খেত।

যখন কোটের কাজ হত তখন ওস্তাগররা ছিল এখানকার। তারা কাটাএ-ছাটাই করত। কিছু কারিগর আসত আশেপাশের গ্রাম থেকে। একটা কারিগরের সঙ্গে তিনচারজন হাতওয়ালা থাকত। তারা সাইজ-টাইজ করে দিত। এখন সেসব তেমন আর নেই। এখকারিগর প্রায় সবটাই নিজের হাতে করে নেয়।

আমি ৪০ সাল নাগাদ কোটের কাজ করেছি। কোট হত দুরকম—কেপ কলার ও স্পোর্টিং কলার। এর ডিজাইন ওস্তাগররা নিজেরাই করে নিত। ডিজাইন বলতে ফর্মা থাকত। একই ফর্মা ২৫-৩০ বছর চলে যেত। মেয়েদের জামার মতো তার নিত্য নতুন ডিজাইন দরকার হয় না। কাটিং করত যারা তারা হল ম্যাটজি। সেলাই করত কারিগর। তার সঙ্গে থাকত তিন চারজন হাতওয়ালা। সবার সমবেত চেষ্টায় এক একটা মাল খাড়া হত। প্রথমদিকে হাতওয়ালারাই কাজঘর টাজঘর করে দিত। পরে বাড়ির মেয়েরা করে নিত। এতে খরচ বাঁচত।

একটা ম্যাটজি সারাদিন ৬.৩০-৭.০০ পর্যন্ত কাজ করে শতখানেক কোট কেটে ফেলত। থান বিছিয়ে লেয়ার করে কাটা হত। সারাদিন কাজ করে মজুর পেত একটাকা/ পাঁচশিকে। খাবার খেত নিজের বাড়িতে।

যে মেশিনে কাজ করে তাকে বলে কলওয়ালা। এরা নির্দিষ্ট কোন অঞ্চল থেকে আসত না। বিভিন্ন জায়গায় যারা কাজ জানত তারা কাজে আসত। একটা কলওয়ালার সঙ্গে যারা হাতে যোগান দেয় তাদের বলে হাতওয়ালা। আমার সময়ে একটা প্যান্ট কমপি-ট হয়ে যেত তিন আনায়। অকটা কলওয়ালা সারা সপ্তাহ কাজ করে হপ্তা পেত তিন টাকা/তেরো শিকে। হাতওয়ালা পেত একটু কম। তখন হপ্তা হত রবিবার। সব সময় কাজ হত না। পুজোর তিন-চার মাস একটু কাজ হত। বাকি সময় নিজের বাড়ি বা গ্রামে কাটাত। কেউ জন খাটত। কেউ মাটি কোপত। এই তিনটাকা/তেরো শিকে পেয়েই আমরা দেখেছি অনেকে চলে যেত তাড়ির ফোঁড়ে। ওখান থেকে দু-চার গ্-াস খেয়ে সন্ধ্যায় গান গাইতে গাইতে টলতে টলতে বাড়ি ফিরত। যখন প্যান্ট এল তখন প্যান্ট সেলাই করে পেত তিন আনা, চোদ্দ পয়সা, চার আনা এরকম। হাতওয়ালা পেত চার পয়সা/পাঁচ পয়সা প্রতি প্যান্ট। এগুলো স্বাধীনতার আগে। আমাদের এলাকায় কোর্টের দর্জি বেশি ছিল। চালকি পাড়ায় ছিল প্যান্ট। ওরা কাপড় দিয়ে যেত। আমরা চার আনা/সাড়ে চার আনা মজুরিতে সেলাই করে দিতাম।

এগুলোর জন্য পুঁজিপাটা বেশি লাগত না। যারা দোকানের কাজ করত তারা দোকান থেকে কাপড় নিয়ে আসত। কারিগরদের দিয়ে সেলাই করাত। সপ্তাবের শেষে কাজ জমা দিয়ে দোকানদারদের কাছে পয়সা নিয়ে কারিগরদের পেমেন্ট করে দিত। পুঁজি লাগত যারা হাটের কাজ করত তাদের। তাও খুব বেশি নয়। কেউ হয়ত ২০০ টাকা নিয়ে নামল। মহাজনরা তার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বেশি করে ধারে কাপড় দিয়ে দিল। এই মহাজনেরা ছিল মাড়োয়ারী। প্রথম থেকেই এরা মাড়োয়ারী সম্প্রদায়। কাপড়ের ব্যবসায় গুজরাটি, বিহারী, উত্তরপ্রদেশের লোক ছিল কম। বাঙালী ছিল আরো কম ১-২ শতাংশ।

এখন ওস্তাগারদের হাতে কিছু পয়সা এসেছে। এখন বড়তলাই বড়বাজার হয়ে গেছে। কম পুঁজির লোকেরা বড়তলার থেকে কাপড় নিয়ে, বড়তলাতেই সেলাই করে আবার বড়তলাতেই বিত্রি(করছে। যারা সাধারণ লেবার ছিল তারা অল্প পয়সা জমিয়ে, কেউ গয়নাগাটি বিত্রি(করে ব্যবসা শু(করেছে।

ক্যাশ ও ত্রে(ডিট পারচেসের শতকারা হিসাব হবে প্রায় ২৫-৭৫ শতাংশ। যাদের পয়সা আছে তারা ক্যাশে কেনে। ক্যাশে কিনলে দাম একটু কম পড়ে। যাদের পয়সা নেই তারা ধারে একটু বেশি পয়সা দিয়ে মাল কেনে। এতে তো তাদের (তি নেই। তাদের তো কিছুই নেই অথচ কাজ পাচ্ছে। শোধ করতে না পারলে কেস কাছারী হয়। তবে সবাই ধরেই কেশ -কাছারী টেতে চায় না। এতে তাদেরও গুডউইল নষ্ট হয়। আস্তে আস্তে মাসে বা সপ্তায় সপ্ত্যা ইনস্টলমেন্টে আদায় করে দেয়। নেতৃস্থানীয় লোকেদের ধরে আপোষ মিমাংসা করে নেওয়া হয়। তবে কেস কাছা যে একদম হয়নি তা নয়, কিছু হয়েছে।

দর্জি ও মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের এই ব্যবসায়িক লেনদেনে দর্জি সম্প্রায়ও অনেক লাভবান হয়েছে। যাদের কিছুই ছিল না তারা ধারে মাল পেয়ে অনেকে ব্যবসায় উন্নতি করেছে। অনেক সুযোগ সুবিধা তারা দিয়েছে। তবে এখন মাড়োয়ারীদের মেরে দেবার প্রবণতা বাড়ছে। কোন ওস্তাগার হয়ত বলল আমি ধারে যাদের মাল দিয়েছি তারা দিচ্ছে না। তাই আমি মহাজনকে দিতে পারছি না। মহাজন দেখল এর সঙ্গে ঝামেলায় গিয়ে লাভ নেই। টাকাও যাবে, খদেরও যাবে। তার ব্যবসা চালু করার জন্য হয়ত আরো কিছু ধার দিল। অনেক বড় বড় ওস্তাগার আছে যাদের মহাজনের সব দেনা মেটাতে গেলে ঘর-বাড়ি বেচে দিতে হবে। ল(ল(টাকা মেরে বসে আছে। যারা ল(ল(টাকা ধার নেয় তাদেরও তো কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে।

যৌথ পরিবার এখন প্রায় নেই। আছে ২৫ শতাংশ। যৌথ পরিবারে ব্যবসার উন্নতি হয় ঠিকই। কিন্তু এখনকার যুগে যৌথ পরিবারে এ ওর উপর ভরসা করে তো ও এর উপর। ফলে কাজে গাফিলতি বাড়ে। যখন যৌথ পরিবার ভেঙ্গে গেল তখন দায়িত্ব নিজের কাঁধে চলে আসল। তখন একে অন্যের থেকে বেশি উন্নতির কথা ভাবে। এই দিক দিয়ে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাওয়ায় ভালোও হয়েছে।

টেরিকটন এসেছে বেশিদিন নয়। তখন বিয়েতে সিল্ক দেওয়া হত। মেটিয়াব্রুজে দেওয়া হত পোচো। এখানে দেওয়া হত মুগা পেড়ে ধুতি। আমি আগে ধুতি-পাঞ্জাবী পরেছি। পাঞ্জাবীতে সালমার কাজ করা থাকত।ন

UNRECORDE INTERVIEW

সুলতান আহমেদ

মুদিয়ালী জেলেপাড়ার বাড়িতে ১৩.১.২০০৫।

নবাবের মেটিয়াব্রুজ আর তার ইতিহাস যে এত তাড়াতাড়ি মুছে গেল,কারোর এদিকে নজর ছিল না, আগ্রহ ছিল না। যে সংর(ণ করা। কিছু লেখা।

—এতো তাড়াতাড়ি ইতিহাসটা.....

—ওর ডেডবডিটা নিয়ে যাবার কথা ছিল, কারবালাতে, আরবে, ইরাকে। সেটাও তো নিয়ে গেল না। এখানেই আছে ইমামবাড়ির মধ্যে। চৌবাচ্চার মধ্যে ...মধুতে ডোবানো।

—এখনও সে অবস্থাতেই আছে?

—এখনও সে ভাবেই আছে। .....কারবালাতে সমাধিস্থ করার কথা ছিল। উনি বলে গিয়েছিলেন। ছেলেরা চেষ্টা করলো না।

—ওনার মূল পান্ডুলিপি কিছু সংস্কার করা হয়েছে?

—কিছুই করা হয়নি। আমি এটা লেখার সময়, যারা যারা ছিল তাদের কাছে গিয়েছি মেটারিয়াল সংগ্রহের জন্য। কেউ দিতে পারেনি। এখানে যে লোক আছে ইমামবাড়ির মধ্যে। আরো কিছু ইমামবাড়ি আছে সেখান থেকে.....সাল। তারিখ পর্যন্ত লেখা নেই।

—ইমামবাড়ির উপরে একটা লাইব্রেরি আছে না?

—ছিল। এখন কি অবস্থায় আছে তা জানি না.....ওখানে ওর একটা পে-ট আছে ইমামবাড়ির গেটে। ওখানে সাল তারিখ আছে। ওখানে কোন সালে এটা প্রতিষ্ঠা হয়েছে ওখান থেকে আমি বের করেছি।

—এখানে স্কুলে, মুদিয়ালি স্কুলে আপনি কতদিন পড়িয়েছেন?

—৩০ বছর হল।

—আপনারা এখানে কবে এসেছেন? মানে আপনার পূর্বপু(ষ!

—আমাদের বাড়ি ছিল আগে ফোর্ট উইলিয়ামে। ফোর্ট উইলিয়াম তৈরির সময় আমাদের ভেকেন্ট করে দিল। তারপর এলো সোনাই অঞ্চলে। হাইডরোড ইনস্টিটিউট.....যেখানে আমার পূর্বপু(ষ ছিল।

—তার আগে?

—ফোর্ট উইলিয়াম। গোবিন্দপুর। ওখান থেকে আমার পূর্বপু(ষ এলো সোনাই।

—এখনো নাকি মসজিদ আছে। ডাকঘর আছে।

—হ্যাঁ।

—ছোট একটা মসজিদ আছে। কোথায় মসজিদটা?

—আশে পাশে। ছোট একটা মসজিদ আছে। এখন কি অবস্থায় আছে জানি না। যাইনি অনেক দিন ওদিকটায়। এসবই আমার জন্মের পূর্বের অবস্থা।

—ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সোনাই-এ কোন অবস্থায় আসেন?

—যখন ফোর্ট উইলিয়াম তৈরি হয়?

—আগে তো ফোর্ট উইলিয়াম ওখানে ছিল না, রাইটার্সের কাছে কোথায় ছিল। তারপর ফোর্টটাকে নিয়ে এলো এখানে.....

—তারপর ওখান থেকে এখানে মেটিয়াব্রুজ হাইস্কুলের যে ফুটবল গ্রাউন্ডটা আছে ওর যে পাঁচিলটা আছে, ওর ছিক উত্তরদিকটায়। এখন কিছু জমি ওদিকটায় আছে। ঠাকুরদা এখানে এসে ন'বিঘা জমি কিনে বাড়ি টাড়ি করলেন।

—তখন তো এসব জমি ফাঁকা। এই জমিটা আপনারা কার কাছ থেকে কিনেছিলেন?

—স্থানীয় লোকের কাছ থেকে।

—হিন্দু না মুসলমান?

— মুসলমান।

—আগে এসবদিকে সব ঘোষেদের জমি ছিল?

—হ্যাঁ, ওই কপিবাগান বলে না, ওইসব জমি ঘোষেদের ছিল।

—কপিবাগানে কি কপি চাষ হত?

—হ্যাঁ, সব মালিরা থাকতো। ছোটবেলায় খেলা করতাম তখন দেখতাম.....

—এই জায়গাটার কি নাম ছিল?

—একই নাম, ঠুটোর খোল বলতো। সবাই তো জানে না।

—খোল! এখানে তো সবাই কল বলে!

—এক ফকির ছিল, কুষ্ঠরোগি। তার কবর আছে। তাকে বলতো ঠুটোসার।

—খোল মানে কি?

—তা জানি না

—যেমন গড়িয়ার দিকে একটা জায়গা আছে বাঘের খোল।

—তাই নাকি!

—তাছাড়া বেহালার দিকে আছে খোলসাপুর। .....সোনাই থেকে আপনারা কবে এসেছেন? মনে আছে সেটা?

—অনেক আগে।

—অনেক আগে মানে কি বাবার সময়ে?

—ঠাকুরদার সময়ে।

—ফোর্ট উইলিয়ামের আগে ডিস্ট্রিক ২৪ পরগণার গেজেট দেখেছি যে এ অঞ্চল একসময় সুন্দরবনের অংশ ছিল, এবং জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য বাইরে—না।

—বংশতালিকা বা কিছু?

—না, কিছু পাইনি।

—ঠাকুরদার নাম কি ছিল?

—উনি ছিলেন হেলালুদ্দিন সওদাগর, দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতো। আমার ঠাকুরদাও তাই করতো। বাড়িতে খুব কম সময় থাকতেন।

—ব্যবসা করতেন?

—হ্যাঁ, ময়ারের পালকের ব্যবসা। বকের পালকের ব্যবসা।

—একটা সওদাগর ফ্যামিলি আমি পেয়েছি বটতলায়, তারা কিন্তু উর্দূভাষী। পরে তাদের ছেলের সঙ্গে বাঙালি মেয়ের বিয়ে হয়েছে, মানে মিক্সড হয়ে গেছে। ওদের খুব বড় দোকান আছে। বটতলা মসজিদের গায়ে। ওরা সওদাগর ছিল। এখন আর ওই পদবি ব্যবহার করছে না।

—আমরা হলাম হেলালুদ্দিন সওদাগর।

—ওদের দোকানের নাম হাকিম টাইলস, বাড়ি ঘরের জিনিস পাওয়া যায়।.....বাবা ব্যবহার করেছিলেন ওই টাইটেল!

—না, উনি তো আধ্যাত্মিক লাইনে ছিলেন।

—বাবার নাম কি ছিল?

—মৌলনা হাকিম মহম্মদ কাশিম।

—উনার গু(কে ছিলেন?

—মৌলনা মুসাবরউদ্দিন আহমেদ। সামনে বড় সমাধি.....বড় সমাধিটা।

—বাবা ওই আধ্যাত্মিক পথে গেলেন কিভাবে?

—গু(র সংস্পর্শে এসে।

—গু(মানে, একটা মিশন তো ছিল। উনি কি চাইতেন?

—আধ্যাত্মিক মানে, ঈশ্বর, মানুষ সেবা এইসব আর কি।

—সেটা কি এই অঞ্চলে করতেন, নাকি অন্যত্র?

—না, না, এখানেই। হোল লাইফটাই করে গেলেন বিনামূল্যে শি(াদান।

—কি ভাবে করতেন?

—আমি তো রাগ করতাম। রাত ১টা/২টো হয়ে যাচ্ছে.....মৌলনা তৈরি করা। আমাদের ধর্মগু(মৌলনা। তারা সব পড়তে আসতো.....

—ইমাম!

—ইমাম আরো উচ্চস্তরে। কোরানের ব্যাখ্যা শেখানো।

—এখানকার মানুষদের করতেন নাকি অন্য জায়গা থেকে লোক আসতো?

—এখানকার। সেসব টেন্ডেসি নেই আমাদের.....ওসব পড়া, বোঝার.....

—এর জন্য কি কোন মাদ্রাসা বা ইন্সটিটিউট তৈরি করেছিলেন?

—না।

—তারা এখানেই থাকতেন?

—সকালে দুপুরে রাতে আসতো। তারপর চলে যেত। রাত ১টা/২টো হয়ে যেত। আমি রাগ করতাম, শরীর ভালো নয়, আর এসব করছেন।.....বিনা পারিশ্রমিকে, আমরা তো টিউশনি করে পয়সা নি।

—যারা আসতেন তারা তো বাঙালি নয়?

—হ্যাঁ, বাঙালি। বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে।

—তখন তো একটাই দেশ!

—যশোর, খুলনা, ময়মনসিংহ, ঢাকা থেকে, চট্টগ্রাম থেকে.....তাদের শেখাতেন।

—আপনার বাবার যে গু(দেব ছিলেন, তিনি কি বাইরের লোক ছিলেন?

—না, এখানকার লোক ছিলেন। ....বাবা পড়েছেন বেরেলিতে। কংগ্রেসের কেন্দ্র।

—রায় বেরেলি?

—হ্যাঁ, ওখানে মুসলমানদের বড় মাদ্রাসা ছিল। উচ্চমাধ্যমিক এবং কলেজ।

—সেখানে পড়েছেন!

—হুঁ

—ওনার গু(র নাম কি আপনি বললেন?

—হ্যাঁ, মৌলনা মুসাবরউদ্দিন আহমেদ।

—উনি কি বাঙালি ছিলেন?

—উনার বাড়ি ছিল আকবরপুর, ফরিদাবাদ। ....পাঁচ ছয় জনকে নিয়ে বসার মানসিকতা আজ আর নেই।

—আপনি বললেন যে নবাবের আগেই এখানে দর্জিরা ছিল। তারপর নবাবের সঙ্গে কিছু দর্জি এলো....

—দর্জি আসেনি।

—কারিগর তো এসেছে!

—তারা ওই চুড়িদার, পাঞ্জাবী, পাজামা এসবগুলো করতো.....

—ফলে পোশাকের রূপটা কি পরিবর্তন হলো?

থেকে অনেক লোক এসেছিল, তারা এসেছিল যশোর, নদীয়া এরকম কয়েকটি জায়গা থেকে, তারপর তারাই সেটাকে বাসযোগ্য করে তোলে। ফোর্ট উইলিয়ামের আগের ব্যাপারটা আপনি জানেন?

—না।

—ওটা লেখাও নেই?—পরিবর্তন হলো।

—পরিবর্তনের ফলে কোনটা বেশি প্রভাবিত হলো? আগেরটা নাকি পরেরটা?

—মিক্সড হলো। আগে দর্জিরা মেমসাহেবের গাউন তৈরি করতো। তারপর লখ্নৌ-এর পাঞ্জাবী/পায়জামা এসব আমদানি হলো।

—এখানকার আদি যারা দর্জি তারা শিখে গেল?

—হ্যাঁ দেখে শিখে নিল। শেরোয়ানি, আলিগড়ী পাঞ্জাবী.....

—আপনার যখন ছোটবেলায় এখানে আসেন তখন তো দর্জি শিল্পটা এতো ব্যাপক হয়নি, এখন যেমন দেখি ঘরে ঘরে!

—না, মার্কেট তো ছিল না, এখন বাইরে থেকে খরিদ্দাররা আসছে বলে জিনিসটা ব্যাপক হয়ে যাচ্ছে। ফ্রক, ব্লাউজ।

—তখন কি রকম ছিল, ধ(ন ১০০ টার মধ্যে কতঘর কাজে নিযুক্ত(ছিল?....একদম আপনাদের ছোটবেলায়।

—অধিকাংশই। অন্য কোন বৃত্তি তখন ছিল না।

—চাষবাস!

—মালিটালি ছিল, বাগান দেখাশোনা করত। এই সব চাষবাস তেমন কিছু নয়।

—আমি শুনেছি লালাবাগানের দিকে.....

—হ্যাঁ, ওই সব দিকে হতো, সন্তোষপুর, বাদামতলা, পদিরহাটি।

—যারা সাধারণ মানুষ, তাদের প্রধান পেশা কি ছিল? আপনি ছোটবেলা থেকে দেখছেন।

—আমিতো ছোটবেলা থেকে দর্জি ব্যবসাই দেখছি। ...আর বিশেষ কিছু চাষবাস যেখানে জমি জায়গা কিছু ছিল সেখানে দেখেছি। যেমন-কপিবাগান, ঘোষেদের জমি এসব আর কি। মাছের ব্যবসা.....

—মাছের ব্যবসা কারা করতো?

—হিন্দু-মুসলমান উভয়ই করতো।

—হিন্দুরা মূলত কলকারখানায় চলে গিয়েছিল!

—বেশির ভাগ। ব্যবসাও করতো, যেমন-ঘোষেরা। ওরা নবাবের বাড়িতে তেল সরবরাহ করতো। বাদাম তেল, যেসব আগুনগুলো জ্বলতো। তখনতো ইলেকট্রিক আসেনি এখানে।

—কোন ঘোষ?

—পঞ্চানন্দতলায় যে ঘোষেরা আছে?

—আপনার ঠাকুরদার পেশা কি ছিল?

—বাইরে বাইরে পালক সরবরাহ করতো। ময়ূরের, বকের।

—কোন কোন দেশে যেতেন?

—সোমালিয়া, জাভা, তিব্বত, আফ্রিকা পর্যন্ত। অনেক ভাষা জানতেন। বোঝা মুশকিল ছিল লোকটার মাতৃভাষা কি ছিল?

—তার বাবার কথা তো জানা নেই?

—তারও ওই ব্যবসাই ছিল। দেশান্তরে যাওয়া।

—আপনার বাবা ওই ব্যবসা গ্রহণ করলেন না কেন?

—না। কাকা পড়তেন প্রেসিডেন্সিতে, বাবা পড়লেন রায় বেরিলিতে। তারপর মৌলনা তৈরি করতে লাগলেন। পেশা ছিল হেকিমি চিকিৎসা। সেটা ভেষজ চিকিৎসা, গাছ-গাছালি থেকে। ....বই পুস্তক আছে। লাইব্রেরি ছিল। নষ্ট হয়ে গেছে। কিছু সংর(ণ করেছি।

—লাইব্রেরি কোথায় ছিল?

—বাড়িতে। শখ ছিল বই পড়া, পড়ানো। সে শখ কিছুটা আমারও আছে, বই সংগ্রহ করা। এনার্জি নেই পড়তে পারিনা।

—কাকা প্রেসিডেন্সি থেকে বেরিয়ে কি করতেন?

—চাকরি করতেন। ফুড ডিপার্টমেন্টে। তারপর পার্টিশান হলে চলে গেলেন পাকিস্থানে।

—পূর্ব পাকিস্থানে?

—মুজিববাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। টিক্কাখালের খাদ্য মিনিষ্টার ছিলেন। ফুড কন্ট্রোলার...খাদ্য বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

—কি নাম?

—মহম্মদ হাসিম। পেপারে নাম বেরিয়েছিল।

—তারপর কি বাংলাদেশে সেটেল করলেন?

—হুঁ

—তার ছেলেপুলে সব বাংলাদেশে আছে?

—একছেলে এখানে আছে, দু মেয়ে ওখানে আছে, একছেলে ওখানে আছে।

—সোনাই-এর গল্প আপনি কি শুনেছেন?

—বিশেষ কিছু শুনিনি।

—অনেক দর্জিদের কাছে শুনেছি তাদের পূর্বপু(ষেরা সোনাই থেকে এখানে এসেছে?

—হুঁ।

—ওটা কি একটা বাঙালি কলোনি মতো ছিল?

—আমার মনে হচ্ছে, আন্দাজ।

. —ফ্যাক্টরিগুলি হওয়ার জন্য কি লোকে চলে এসেছিল?

—আসলে অ্যাডজাস্ট হতো না বাইরে থেকে আসা লোকগুলোর সঙ্গে। যেমন আমরা এসেছি মেটিয়াব্রুজ হাইস্কুল থেকে। অ্যাডজাস্ট হয়নি। এমনকি মামলা মোকদ্দমা পর্যন্ত হয়েছে।—কাদের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা হয়েছে তারা তো বিহারি মুসলমান। তারা কি কলকারখানার জন্য এসেছিল?

—হ্যাঁ। কলকারখানার জন্য। তাছাড়া ব্যবসা করতো....বিভিন্ন রকম ব্যবসা। যেসব ব্যবসার নাম আমরা জানি না।

—এখানে একটা শুনেছি যে এখানকার মুসলমান, তাদের পূর্বপু(ষ হিন্দু ছিল পরে তারা মুসলমান হয়। এ ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন কি?

—না, এরকম আমি শুনিনি। পাশাপশি একসঙ্গে বাস করেছে আপনজনের মতো। এখনও রাজাবাগান, ওই দিকটায় এমনভাবে হিন্দু মুসলিম বাস করছে চেনার উপায় নেই। পরস্পরের মধ্যে ভাব সম্পৃতি এতো বেশি ছিল।

—হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছে।

—আমার জানা নেই।

—আমি সাত-আট পু(ষ আগের কথা বলছি। যেমন-কোন কোন পদবি, বি(াস, চৌধুরি, মল্লিক.....

—এখানে হিন্দু নাম ছিল। যেমন-গর্বোধন, কানাই, এরকম এখানে আছে।

—হাজি রতন, রতন হিন্দু নাম হয়। তারসঙ্গে হাজি, ফলে মনে হচ্ছে তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সেটা কিভাবে হয়েছিল, শুনেছেন কিছু?

—না বলা কঠিন। স্থানীয় কারণ আছে

—আপনার বাবা কি.....এই অঞ্চলে অনেক পীড় আছে। যেমন-পীড় ডাঙা, বদর পীড়, সত্য পীড়, মালিক পীড়....এদের সঙ্গে কাজ করেছেন?

—যোগাযোগ ছিল। একসঙ্গে বসতেন তারা। ভাব বিনিময় করতেন। জালালি পীড় ওর সঙ্গে আমার বাবার খুব আঁতাত ছিল।...ওনার গু(তাদের সঙ্গে যারা ফুরফুরা পিড় যোগাযোগ ছিল, এধরণের। ফুরফুরা শরীফের পীড় সাহেব আবু বকর....এরকম যোগাযোগ ছিল।

—বদর পীড়ে ছিলেন ফকির, মারা গেলেন। খলিলাউদ্দিন ফকির। ফকির পাড়া আছে। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে?

—হ্যাঁ, প্রথমদিকে। এখন আর সে কালচারের লোক নেই।

—তিনি কোন প্রতিষ্ঠানে তৈরি করেননি, ছাত্ররা নেই!

—ছাত্ররা আছে ওরা সব ছড়িয়ে পড়েছে।

—এখানে ওনার মৃত্যু দিবস বা কিছু পালন করা হয় কি?

—হ্যাঁ, আমি করি, লোকজন আসে। ওনার ভক্ত(রা আসে।

—তাদের কি চিঠি দিয়ে জানানো হয়?

—চিঠি দিয়ে।

—স্থানীয় লোকেরা কি অংশ নেয়?

—কিছু কিছু।

—মুদিয়ালি স্কুল যারা তৈরি করেছিল.....

—তারিণী পাল, পালেদের।

—নবাবের সঙ্গে যে সব হিন্দুরা মিলেছিল সব ব্যবসায়ী সূত্রে?

—হ্যাঁ, ব্যবসায়ী সূত্রে।

—আর র(তরা?

—ওরাও অনেকদিনের। ট্রাডিশনাল।

—আর মিস্ত্রী যারা।

—নুটবিহারী দাস, নুটবিহারী মিস্ত্রী, কৈলাস মিস্ত্রী। এরা সব পয়সাওয়ালা লোক ছিল।

—মিস্ত্রী কেন?

—ব্যবসা-ট্যাবসা করে,কি করে আর!

—এরা কি কারিগর ছিল?

—হ্যাঁ, তাইজন্য মিস্ত্রী টাইটেলটা হয়েছে।

—এত টাকা পয়সা এরা কিভাবে করেছে?

—ব্যবসা করে আর কি। বন্ধকী ব্যবসা, সোনার ব্যবসা।

—ঠিক আছে।

UNRECORDED INTERVIEW

প্রদীপ জানার ছোট ঘরটিতে বসেই কথা হচ্ছিল তপন দেবের সঙ্গে। বৃহস্পতিবার (৩০/১২/০৪) সকাল এগারোটা নাগাদ। তপন দেব একজন ওস্তাগর। তবে নিতান্তই ছোট ওস্তাগর।

প্রথম প্র(ো ছিল আপনি এ পেশায় এলেন কেন।

—নিতান্তই বাধ্য হয়ে, (জি রোজগারের জন্য। একদিন সন্ধ্যাবেলা মাঠে বসে বন্ধুরা আড্ডা দিচ্ছিলাম। একবন্ধু এসে বলল, কুলিং টাওয়ারে লোক নিচ্ছে। এই অবধি শুনে আমি চলে এলাম। আমি চলে আসার পর ওরা ঠিক করেছিল, পরের দিন কলিং টাওয়ারে যোগাযোগ করবে। আমি চলে আসার জন্য সে খবর জানতাম না। পরের দিন ওরা যোগাযোগ করেছিল এবং সরাসরি চাকরি হয়ে গিয়েছিল। আমার হলো না।

—আপনার পরিবারের আর কি কেউ এ কাজের সঙ্গে যুক্ত(?

—না। আমি একাই একাজ করি। কা(রই একাজে আগ্রহ নেই।

—আপনি কি কোন ওস্তাগরের কাছ থেকে কাজ এনে কাজ করেন?

—আমি নিজেই একজন ওস্তাগর। তবে খুবই ছোট।

—আর কজন হিন্দু ওস্তাগর আছে?

—কেউ নেই। আমি একাই এখানে এ ব্যবসাতে আছি। দু একজন আগে থাকলেও তারা সবাই অন্যদিকে চলে গেছে।

—তারা চলে গেল কেন?

—এ ব্যবসাতে আর আগের মতো লাভ নেই। একটা সময় ব্যবসা করে আনন্দ ছিল। আজ আর তা নেই।

—আপনি কবে থেকে ব্যবসা করছেন?

—৮৫ থেকে হবে।

—আপনার লাইসেন্স আছে?

—না।

—কেন?

—আমরা একেবারেই ছোট ব্যবসায়ী। লাইসেন্স নিয়ে কি করবো!

—আপনি কি তৈরি করেন?

—বাচ্চাদের ছোট প্যান্ট।

—এর আগে সরকার থেকে কোন ঋণ বা সুবিধা পেয়েছেন।

—অনেক আগে পঞ্চায়েত থেকে মেশিন আর পাঁচ হাজার টাকা করে দিয়েছিল।

—তা কি শোধ করেছেন?

—না। তা শোধ হয়নি। মুকুব হয়ে গেছে।

—আপনি কি মেটিয়াব্রুজ হাটে ব্যবসা করেন?

—না, আমি হাওড়া সমবায়িকা হাটে ব্যবসা করি।

—মেটিয়ব্রুজ হাটে একেবারেই করেন না?

—খুব কম। দু একজন চেনা কাষ্টমার আছে। সমবায়িকা হাটেই তাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তারা আসলে তবেই এখানে মাল দিই।

—এখানে ব্যবসা করেন না কেন?

—এখানে যে হারে 'ব্যাজ' কাটে তাতে আমার মতো ছোট ওস্তাগারের পারা মুশকিল।

—আপনি তো ছোটদের প্যান্ট করেন তার কাপড়টি কোথা থেকে আসে?

—এ কাপড়গুলো বিদেশী কাপড়। আমেরিকা ও ইউরোপের পূর্ণ বয়স্ক মানুষের প্যান্ট। ওরা কিছুদিন ব্যবহার করার পর তা ফেলে দেয়। কেননা ওখানে আয়রন করার খরচ প্রচুর। তারপর ওই প্যান্টগুলো জাহাজে বোম্বে আসে। সেখান থেকে আসে কলকাতা। আমরা সেই প্যান্ট নিয়ে এসে কাটিং করি। এবং বাচ্চাদের প্যান্ট তৈরি করি।

—পদ্ধতিটা কি রকম?

—প্রথমে প্যান্টগুলো কাটিং হয়। তারপর পিন্টিং। পরে সেলাই। তারপর ত।

—ত টা কি জিনিস?

—ত মানে প্যাকিং আরকি।

—এবার খরচের ব্যাপারটা বলুন।

---কাটিং করতে খরচ হয় ৪ টাকা ডজন। প্রিন্টিং ৫ টাকা ডজন এবং সেলাই ৮ টাকা ডজন। তবে দরজিরা যদি ওস্তাগরের বাড়িতে বসে সেলাই করে তবে ৫ টাকা ডজন। কারণ সেসময় দরজিদের তিনবেলা খেতে দিতে হয়।

---প্রিন্টিং কোথায় হয়?

—সন্তোষপুর, পদিরহাটি বিভিন্ন জায়গায় প্রিন্টিং হয়।

—সেলাইতে সুতোর দাম কি রকম?

—সেটা আমরা ওস্তাগাররা খুব ভাল বলতে পারবো না। ওটা দর্জিরা কেনে, ওরাই বলতে পারবে।

—'ত' টা কিভাবে হয়?

—ছয় পিস্ একসঙ্গে। সেটা দর্জিরাই করে দেয়। যে যার বাড়িতে বসে কাজ করে সেরকম। এরজন্য আলাদ লোকের দরকার হয় না।

—আপনার বাড়িতে এই কাজে আপনাকে কেউ সাহায্য করে?

—না, আমি নিজেই যা করার করি। ছোট ভাই মাঝে মধ্যে গুছিয়ে দেয়—এপর্যন্ত।

—তারা কেউ একাজে আগ্রহী নয়?

—না। কেউ করতে চায় না।

—আপনার কি হাটে স্টল আছে?

—না আমাক কোন স্টল নেই। সমবায়িকা হাটে যাই। খরিদ্দাররা মাল পছন্দ হলে সঙ্গে সঙ্গে তা কিনে নেয়। হলে আধ ঘন্টার মধ্যেই সেল না হলেই বসে থাকো।

—সমবায়িকা হাটে কি রকম রেট মালগুলোর?

—১০ ইঞ্চি— ৩৬ টাকা, ১১ ইঞ্চি—৪৮ টাকা, ১২ ইঞ্চি—৬০ টাকা, ১৩ ইঞ্চি—৭২ টাকা, ১৪ ইঞ্চি— ৮৪ টাকা, ১৫ ইঞ্চি— ৯৬ টাকা, ১৬ ইঞ্চি—১০৮ টাকা, ১৭ ইঞ্চি— ১২০ টাকা সবই এক ডজন।

—ত্রে(তারা সবই কি এখানকার?

—না, সমি(পুর,পাটনা, হাজিপুর, গয়া, বিহার, আসাম, মাদ্রাজ, নাগপুর, দিল্লি

—কিছু(ণ আগে আপনি 'ব্যাজ' কাটার কথা বলছিলেন সেটা কিরকম?

—'ব্যাজ' মানে মাল যে টাকার হবে তার ১০ পারসেন্ট কেটে নেবে ত্রে(তা। ধরো যদি ১০০ টাকা মালের দাম হয়, তবে আমাকে দেব ৯০ টাকা, ১০ পারসেন্ট টাকা অর্থাৎ ১০ টাকা কেটে নেবে। .....এখানে 'ব্যাজ' কাটার পরিমাণটা বেশি। মঙ্গ লাহাটে পরিমাণটা কম, ৬-৭ পারসেন্ট।

—এটা কি আগে থেকেই চলছে না কি সম্প্রতি?

—আগে থেকেই চলছে। তখন ১-২ পারসেন্ট ছিল। এখন বাড়তে বাড়তে এই অবস্থায় পৌঁছেছে।

—আপনারা সরকারকে জানাননি অথবা আন্দোলন করা?

—সরকারকে কিছু বলা হয়নি। আন্দোলন করেও কোন লাভ নেই। তুমি বলবে, তোমার মাল নেবে না। অন্য জনের কাছ থেকে মাল নেবে। অন্যজন দশের জায়গায় বারো শতাংশ ব্যাজ দিচ্ছে ত্রে(তাকে। এই ব্যবসায় ওস্তাগারদের মধ্যে কোন মিলমিশ নেই। তবে মুসলিম ওস্তাগাররা অনেক সময় ব্যাজ দিয়েও ভাল ব্যবসা করতে পারে কেননা ওদের একটি পরিবারের অনেকেই ব্যবসায় জড়িত। কাটিং সেলাই একই পরিবারের ছেলেরা করছে। ফলে ১২ শতাংশ দিয়েও ওরা ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে।

—দর্জি শিল্পটা তো অধিকাংশই মেটেবু(জে সীমাবদ্ধ। অন্যান্য জায়গায় তো ততটা সীমাবদ্ধ নয়।

—একথা পুরোপুরি ঠিক নয়। বর্তমানে বোনগাঁ লাইনে হাবড়া, অশোকনগরে এই শিল্প ভীষণ প্রসার লাভ করেছে। তাদের কাজের মানও খারাপ নয়। তার ফলে মেটেবু(জের ব্যবসা মার খাচ্ছে।

—আপনি যে প্যান্ট তৈরি করেন তার মূল ডিজাইন কি ভাবে হয়?

—এখানে যে রকম প্যান্ট বেশি চলে আমি তা দেখেই ডিজাইন করি। তবে বড় ব্যবসায়ীদের খতা আলাধ তারা বোম্বেতে তাদের লোক রেখে দিয়েছে। তারা সেভাবে লেটেস্ট ক্যাটালগ বানায়। আমরা যেটা এখানে চলে সেরকম বানাই। না চললে তখন বদলাই।

—মুসলিমরা যে ভাবে একাজে এসেছে হিন্দুরা সে ভাবে এলো না কেন? আপনি কি মনে করেন?

—হিন্দুরা এ কাজটাকে ছোট মনে করে। তারা সবাই অফিসবাবু হতে চায়। কিন্তু একাজে কিছু পয়সাতো আছেই। এই প্রদীপ তো একাজ করেই সংসার চালাচ্ছে।

—এই দর্জি ব্যবসায়ের অবস্থা খারাপ বলছেন কিন্তু কিছু কিছু ওস্তাগারের অবস্থা তো যথেষ্ট ভাল। যেমন—আলমগীর ফকির।

—আলমগীর ফকিরদের ব্যাপারটা আলাদা। এক সময় ওদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। খুব সাধারণ অবস্থা ছিল ওদের। তবে ওদের বাপ ঠাকুরদার প্রচুর জমি ছিল। সেই জমি পরে ওরা বেচে তাছাড়া সি. এম. ডি. এ. টাও ওদের। সরকার ওটা নেবার সময় ওদের ভাল টাকা দেয়। তাছাড়া ওদের ব্যবসা ছড়িছেছে ইরাক, কুয়েত প্রভৃতি দেশে। তার জন্যই আজ ওরা কোটি পতি। কিন্তু অন্যরা তো তা নয়। তবে আলমগীরদের অন্য ব্যবসা থাকলেও থাকতে পারে। তা আমি জানি না।

—ওরা কি অন্য জায়গা থেকে এখানে এসেছে?

—না, ওরা বোধ হয় এখানকার আদি লোক।

—আপনার প্যান্টের চাহিদা কি রকম?

—চাহিদা আগের থেকে পড়ে গেছে। কেননা এই প্যান্টগুলি তৈরি হয় যে কাপড় দিয়ে সেগুলি বিদেশী। এবং তা আগেই একবার পরা হয়ে যায় তা আগেই বলেছি। তারফলে ত্রে(তারা ভাবে এর মধ্যে কোন জীবানু থাকলেও থাকতে পারে।

—একথা ত্রে(তারা কিভাবে জানলো?

—দর্জিরাই তো ত্রে(তাদের জানিয়ে দিয়েছে। এমনকি দর্জিরা সরাসরি ত্রে(তাদের বলেছে তারা ত্রে(তাদের কাছে বসে কাজ করে দিয়ে আসবে এর চাইতে কম দামে। ওই সব ত্রে(তাদের প্রচুর পয়সা। তারা এখান থেকে দর্জিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের খেতে দিচ্ছে। দর্জিও পয়সা পাচ্ছে। ত্রে(তারাও কম পয়সায় মাল পাচ্ছে। মধ্যে থেকে ওস্তাগার ও দর্জি শিল্পটা মার খাচ্ছে। ....তাছাড়া ত্রে(তার চাহিদা বদলে যাচ্ছে। নতুন কাপড়ের প্যান্ট এই দামে তারা পেয়ে যাচ্ছে। কেন তারা এই প্যান্ট নেবে। একে তো কাপড়ের প্যান্টটা পুরনো। তবে একটা সময় এ ব্যবসা আমি ভালো পয়সা আয় করেছিলাম।